সন্তপ্রসঙ্গ

স্বামী রামানন্দ

নিউ সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সী
৮।১ চিন্তামণি দাস লেন : কলিকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ : জুন, ১৯৬৪

প্রকাশক :

জে. কে. সেন

নিউ সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সী

৮।১ চিন্তামণি দাস লেন : কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :

দেবেশ দত্ত

অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

৮১ সিমলা ষ্ট্রীট : কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

সন্তপ্রসঙ্গ ১৩-৫২

নববর্ষ। শ্রীগুরু সত্তা। মহাপ্রস্থানের পথে। নির্জনবাস। শূন্যতা। প্রত্যাখ্যান। একাদশী। সিদ্ধ ও অবতার। প্রেমাভক্তি। পুরুষকার-শরণাগতি। সিদ্ধি। নিত্যলীলা। তারাপীঠ শ্মশান। সংযত জীবন। অভাব বোধ। জ্ঞানদাস। দিব্য চিহ্ন। গুরু-ইষ্ট। গুরু-শিষ্য। সততা। আড়বার। নিষ্কাম কর্ম। প্রাণশক্তি। অভীপ্সা। জপে সংঘাত। ঈশ্বর দর্শন। গুরু পূর্ণিমা। ভাবগত পরমাণু। শংকরী মা। মত পথের তুঙ্গতা। মনের ওঠাপড়া। জাপানী গল্প। তিথি। রাসপূর্ণিমা।

দেব প্রসঙ্গ ৫৫-১১২

বাঁশি। বিশ্বকর্মা। চণ্ডী। প্রাণপ্রতিষ্ঠা। মন্ত্রমালা। অবতার-মিলনভূমি। সতীপীঠ। হিন্দু দেবদেবী। প্রতীক প্রাণী। মুণ্ডমালা। মাকালী। হর-পার্বতী। শিবজী। মা দুর্গা। কার্তিক। অসুর বধ। শিবের উপাসনা। সদ্যজাত। শিব-শক্তি। অন্নপূর্ণা। কামাখ্যাধাম। অকালবোধন। রামনবমী। দোল। বেদ-পুরাণ। জন্মাষ্টমী। শুভ-তিথি। শ্রীকৃষ্ণ। নীলাচল ধাম। রাধারানী। রাধারানী। শক্তি মতে রাস। বলিদান। নর্মদা। ফুলদোল। মা কালী। হিন্দু দেবদেবী। মহালক্ষ্মী। বিজয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ১১৫-১৬৪

অবতরণ তত্ত্ব। ঠাকুরের ভাবধারা। ওঁঙ্কারানন্দ মহারাজ। নিত্যানন্দের খোলে শ্রীচৈতন্য। সারবস্তু। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা দিবস। অষ্টসখী। নরেনের দেহে ঠাকুর। মায়ের মাতৃত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন। কাম। ফলহারিনী কালী পুজো। জগদ্ধাত্রী। নটরাজেশ্বর শ্রীশ্রীঠাকুর। শ্রীরামকৃষ্ণ। সারদা মা। রাই ঋণ। কল্পতরু। আনন্দরূপ। শক্তি। স্বামীজী। স্বামীজী। পরমহংস। কর্মে অধিকার। যোগমায়া। স্বামীজী। বাউলের দল। দেববাণী। দেববাণী রূপকথা। মহাশক্তির অবতরণ। হাতের ওজন দ্যাখা। ঠাকুর দেবতা। অসতের মা। স্বামীজী। ভগবানের পথে। স্বামীজী-প্রেমের অবতার। শরীর থেকে তামসী শক্তির নিষ্ক্রমণ। স্বামীজী। সারদা মা। চেতন সমাধি। নরলীলা। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তলীলা।

অরূপ কথা ১৬৭-২২৮

শ্রদ্ধা। রূপ-অরূপ। ঈশ্বর-মনস্কতা। আত্মমর্যাদা। মহাপুরুষের জীবনী। অবলম্বন। তপস্যা। বাবা-মা। অন্তর্জীবনে বিরোধ। একাগ্রতা অন্তর্মুখীনতা। পুণ্যতিথি। দুর্বাসা। একত্ব। দিক-ভাবনা। ভাবের জগত। প্রাণ। সামঞ্জস্য। চিৎশক্তি বিলাস। মহাপুরুষের ব্যক্তিত্ব। রাজা-সাধু। চাওয়া-পাওয়া। আস্বাদন। হিমালয়। যা নিশা। রামকৃষ্ণ-রবীন্দ্রনাথ। বুদ্ধদেবের লোক ভাবনা। বুদ্ধদেবের রূপ প্রসঙ্গে। চৈতন্য চরিতামৃত। মানসিকতা। মন্ত্র জপ। প্রাণশক্তি। উপাদান। ধর্ম। মীরার ভজন। জীবনধারা। সাধনা। সুন্দরের সাধনা। সর্বব্যাপ্ততা। রূপান্তর। স্তরভেদ। চাঁদ-তারা। প্রতিভা। মন। সামলে চলা। অকূলের ত্রাণকর্ত্রী। জীবন-মরণ। বিচার। স্বাতন্ত্রবাদী। সৃষ্টির স্তর। জীবন। প্রাণ। প্রণাম। রবীন্দ্রনাথ। প্রবণতা। শিবজ্ঞান-আত্মমোক্ষ। কুণ্ডলিনী। আশীর্বাদ। হিমালয়। কারণ স্তর। অবাধিত সাধনা। সাথী। প্রণাম। সমর্পণ।

সন্তপ্রসঙ্গ

নববর্ষ

আমরা হলাম ভারি আশ্চর্য জাত। বছরের প্রথম মাস করেছি বৈশাখ। এর বর্ণনা দিতে গিয়ে মনে পড়ে শরৎচন্দ্রের একটা বর্ণনা। বৈশাখ মাসের আকাশ দেখে উনি বলেছেন, 'এই আকাশে যে কোনদিন আবার নবীন মেঘের সঞ্চার হইতে পারে, আজিকার আকাশ দেখিলে তাহা কিছুতেই মনে হইবে না'। সেই গফুর মিঞার গল্প। - 'কোন দিন মনে হইবে না বৃষ্টি ধারা আবার মাটিকে সিক্ত করিতে পারে'। এমনই পোড়া জ্বলন্ত প্রকৃতি। আকাশ থেকে মাটি, সর্বত্রই ভারী দহন জ্বালা।

বিশ্ব-প্রকৃতি ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ে। কেন? না, এমনিতেই তো আমরা গরমের দেশে বাস করি, তারও আবার গরম, গরমের উপর গরম, সমস্ত মানুষ, গাছপালা, পশু-পাখী অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিয়ে প্রাণ রক্ষার তাগিদের অবস্থায় থাকে। এমন দেশে আমরা বছরের প্রথম মাস করেছি বৈশাখ। এমন পোড়া মাস তো আর পাওয়া যায় না, তাই তাকেই আমরা বছরের প্রথম মাস করলাম।

কেননা, আমাদের জীবন-দর্শন আলাদা। আমরা গভীরের প্রয়াসী। আর সেই গভীরকে কঠোরতম তপস্যার মধ্যে দিয়েই বরণ করতে হয়। আমাদের সমস্ত জীবনের উদ্দেশ্য, আমাদের বেঁচে থাকার যদি কিছু মানে, আমাদের সফলতার যদি কিছু মানে থাকে, তবে তা সেই গভীরতার। গুহাহিতং যিনি আছেন, এই জীবনের সমস্ত আনন্দের আড়ালে গাঢ় দুঃখের প্রান্তিক সংবদ্ধতার মধ্যে, ঔদাসীন্যের ব্যাপ্তিতে যিনি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন, জানতে চাই তার সত্য পরিচয়, তবে গভীর তপস্যার, কৃচ্ছ্রতার মধ্যেই তাঁকে বরণ করতে হয়, যা পাওয়া গেলে আর হারায় না। যাঁকে দাম দিয়েও পাওয়া যায় না। অথচ তাঁর জন্য লোকে দাম দেয় জীবনের সমস্ত সুখ, আহ্লাদ। জীবনের সমস্ত স্বপ্ন বিসর্জন দিতে রাজি আছে। তার জন্য আমাদের গোটা জাতটা, গোটা সভ্যতাটা উন্মুখ হয়ে আছে। যাঁর জন্য জীবনের সমস্ত মূল্য দিতে মানুষ কুণ্ঠিত হয় না। তাঁকে তপস্যার মধ্যে দিয়েই জীবনে বরণ করে নিতে হয়। সেই কবে জানিনা আমাদের গোটা জাতটা এমনই একটা সংকল্প করে বসে আছে। কাজেই আমাদের এই জীবনধারা, আমাদের সভ্যতার স্বকীয়তায় আমরা বৈশাখ মাসকে বছরের প্রথম মাস করেছি। গোটা বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে যে গভীর কঠিন-কঠোর তপস্যর প্রবণতা দেখা যায়, এই কঠিন বৈশাখের পথ বেয়েই একদিন আকাশে নবীন মেঘের সঞ্চার হয়, নতুন বৃষ্টির জল ঝরে ঝরে পড়ে, মাটি সিক্ত হয়, সুগন্ধে বাতাস ভরে ওঠে, নতুন করে নদী বেগবতী হয়, গোটা বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে নবীন প্রাণের সঞ্চার। কিন্তু সেটা বৈশাখের পরে। বৈশাখ বিশ্ব কবির ভাষায়- 'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ

ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিশান ভয়াল
কারে দাও ডাক—'

কবি বলেছেন, শিব যেন তাঁর মহান তপস্যায় মগ্ন হয়ে আছেন। আর, এই রুক্ষ প্রান্তর বুঝি তাঁর 'ধূলায় ধূসর রূক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল'। তাঁর তপঃক্লিষ্ট জটাভার বৈশাখের পৃথিবীতে প্রসারিত হয়েছে। দীর্ঘ তপস্যার সমস্ত শীর্ণতা, তপস্যার দহন যেন প্রকাশিত, মূর্তিমন্ত হয়েছে বিশ্ব-প্রকৃতির বৈশাখ মাসের প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। আর অন্তর আকাশে তার আবেদন অমোঘ হয়েছে। তাই আমরা বৈশাখ মাসকে বছরের প্রথম মাস করেছি।

যারা পাঁজি-পুঁথির চর্চা করেন, তারা এর একটা হিসেব দিয়েছেন যে, মহাবিষুব সংক্রান্তির পরের দিন পয়লা বৈশাখ বছরের প্রথম মাস হিসাবে গণ্য করার। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সম্ভবত এই দিন প্রথম সিংহাসনে আরোহন করেন। পরবর্তী কালে রাজা শশাঙ্ক তাঁর সিংহাসনে আরোহণের দিন থেকে, অর্থাৎ ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গাব্দের প্রচলন করেন। যদিও শশাঙ্ক তার রাজত্বকালে এটা প্রচলন করেন। কিন্তু তিনি পূর্ববর্তী সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের যে পয়লা বৈশাখের হিসেব, সেটা নষ্ট করেন নি। কেন করেন নি? না, গুপ্ত রাজারা যে শুধু বাংলার রাজা ছিল, তা নয়। শশাঙ্ক গৌড়ীয় রাজা, বিহারের কিছু অংশ, এবং উত্তরবাংলায় তার রাজত্ব প্রসারিত ছিল। কিন্তু গুপ্ত রাজারা তাদের রাজত্ব বহুদূর - সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত প্রসারিত করেছিল। এই বিস্তৃত অঞ্চলে যে বৎসরের সারণি অনুসরণ করা হ'ত, তা শশাঙ্কের পক্ষে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। এটা আমি আগে বলিনি, প্রথম বললাম, কেননা, এটা 'এহ বাহ্য'। যারা পাঁজি-পুঁথি চর্চা করে, তাদের জন্য এই হিসেব। অনেক জায়গায় এই হিসেবটা বড় করে দেখান হয়েছে। বস্তুতপক্ষে জীবনের ভাবনা, আদর্শ থেকে একটা জাতির গতি-প্রকৃতি পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়। শুধু মাত্র ঐতিহাসিক কার্যকারণ অনেক তুচ্ছ, কাজেই, আমাদের যে ভাবধারা—আদর্শের দিক দিয়ে আমরা সমস্ত রকম মূল্য দিয়ে সেই পরম মূল্যবান বস্তুকে জীবনে বরণ করে নিতে চাই, তার জন্য আমরা বৈশাখ মাসকে বছরের প্রথম মাস করেছি। এটাই সবচেয়ে বড় কথা।

এ ছাড়াও ছোট-খাট নানারকম মত আছে। যেমন, একটা মত হচ্ছে তিব্বতি রাজা সন্‌গায়েম্পা, তার থেকেই নাকি আমরা সন ব্যবহার করি। ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতান্তর আছে। সুতরাং সেদিক দিয়েও ভাবাদর্শটাই বড় করে ধরা উচিত।

এরপর, আমি যখন বৈশাখ মাস নিয়ে বলছি, এই বৈশাখ মাস আমাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে একজন মহাপুরুষের জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে। বলতে গেলে বৈশাখ মাস আর সেই মহাপুরুষের জীবন একাকার হয়ে গেছে, ওতপ্রোত হয়ে গেছে। কাজেই তাঁর জীবন, বিশেষ করে আজকের এই ধর্মীয় সভায় উল্লেখ না করলে যেন অঙ্গহীন হয়ে যাবে। তার জন্যই বলি, তাঁর নাম আপনারা সকলেই জানেন—আর, তাঁকে দেখতেও পাচ্ছেন—ঐ যিনি আছেন ওখানে বসে (বুদ্ধদেবের মূর্তি দেখিয়ে বললেন) -তাঁর নাম হচ্ছে বুদ্ধদেব।

অনেককাল আগে, প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে, তখনও বৈশাখ মাস ছিল ভরা-নিদাঘ, তপ্ত বৈশাখ মাস। কাজেই আমরা ভাবতে পারি, সেদিনও এই পৃথিবীর হাজার পদ্মের বনে কোটি কোটি পদ্ম ফুটে উঠেছিল আলোর বন্দনা গানে। সমস্ত পৃথিবীর বাতাসে এই প্রার্থনায় পদ্মগন্ধ মিশ্রিত হয়েছিল বন্দনায়, আলোর জয় ঘোষণা করেছিল। জ্ঞানত না কেউ সেদিনের আলোর জয়গান বাতাসকে যেন আরো বেশী সুবাসিত করে তুলেছিল একটি বিশেষ কারণে। সে হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের অবতরণ।

সেদিন লুম্বিনি কাননে হাজার-হাজার পদ্ম ফুটে বাতাসকে আরো সুগন্ধিত করে রেখেছে, সেই আলোর যিনি রাজা, তিনি পৃথিবীতে আসছেন, তাঁকে স্বাগত জানাতে। মহাজনরা বলছেন, তাঁরা দেখছেন আকাশ থেকে পৃথিবীর মাটিতে সাতটি সোনার পদ্ম ফুটে উঠেছিল, আর তার মধ্যে এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের আকুলতা সফল করে, অত্যন্ত লঘু পায়ে সেই শিশু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন। সেদিন তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ।

মায়াদেবীর কোল আলো করে সেই পদ্ম ফুটে উঠেছিল— যে পদ্ম কোনদিন কেউ দেখেনি।

এদিকে- হিমালয়ের শিখরে শিখরে সারা বছর ধরে যত বরফ জমেছিল, বৈশাখের রুদ্রতাপে তা গলতে শুরু করেছিল। শুরু হ'ল হিমানি সম্প্রপাত-বিশাল বিশাল বরফের স্তর ধ্বসে ধ্বসে ছড়িয়ে-গড়িয়ে-গলে পড়তে লাগল চারিদিকে। তার চাপে চলার পথের অজস্র পাথর গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেল। তারপর সৃষ্টি হ'ল নদী। অজস্র ঝর্ণা নদী হয়ে এই পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসতে লাগল, এই পৃথিবীকে সবুজ-সজীব করে দিল।

আর একজনও নেমে এলেন হিমালয়ের বরফ-আচ্ছাদিত গুহামণ্ডল থেকে। এক অতি প্রাচীন ঋষি। সেই ঋষি যখন এসে দাঁড়ালেন লুম্বিনি কাননে—গোটা দেশে সাড়া পড়ে গেল, রাজপুরীতে হৈ-চৈ। কেননা মহান প্রাচীন তপস্বী বড় একটা নেমে আসেন না সমতলে—তিনি এসেছেন। দেখতে চাইলেন সেই শিশুকে। দেখান হ'ল। সেই শিশুকে পরম স্নেহভরে নিজের ক্রোড়ে নিয়ে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন শিশু-রবির মুখপানে। বৃদ্ধ ঋষির চোখ দিয়ে যুগপত আনন্দ ও জলের ধারা অবিরল ধারে প্রবাহিত। সবাই বলল—প্রভু, আপনি কি কোন অমঙ্গল দেখছেন? তিনি বললেন, 'না, আমি হাসছি, কাঁদছি দুটো কারণে।

'একটা কারণ এই, বৈশাখ-তপ্ত ধরণীকে সফল করে এক মহান পুরুষ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি জগৎ মঙ্গলের কারণ হবেন। আর দ্বিতীয় কারণ-আমি কাঁদছি এইজন্য যে, যেদিন তাঁর করুণার ধারা এই ধরায় প্রবাহিত হয়ে পৃথিবীর সন্তপ্ত জীবকে শান্তি দেবে, সেদিন আর আমি থাকব না'। —এই হ'ল এক বৈশাখের কথা। ঋষির নাম অসিত মুনি।

এরপর বহু বছর চলে গেছে। সেই সিদ্ধার্থ এখন যুবক হয়ে গেছেন। তাঁর উন্মনা ভাব দেখে বাড়ীর লোক ভালো সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়েছে। অজস্র সুন্দরী

মেয়ে তাঁকে সবসময় চারিদিক থেকে ঘিরে থাকে। নৃত্য-গীতে তাঁর মনোরঞ্জনের আয়োজনে রত্, নিত্যদিন তাঁকে নিয়ে পরম আনন্দের উচ্ছ্বাস। কিন্তু রাজকুমার ভাবেন—এটাই কি জীবনের সব? না, এটা তো জীবনের সব নয়। এটা যদি জীবনের সব হোত, তাহলে মানুষের মধ্যে এত ভ্রান্তি, এত পাপ, এত দুঃখ-কষ্ট অবাধিতভাবে নেমে আসে কেন? আর, এর উত্তরণের পথ কি? এই চিন্তা তাঁকে আকুল করে তুলল। তাই, দিনে শান্তি নেই, রাত্রে ঘুম নেই। সেদিনও গ্রীষ্মকাল। তিনি ধীরে ধীরে পদচারণা করছেন নিশীথ রাতে। দেখছেন যে, অর্ধেক রাত পর্যন্ত নৃত্য-গীত করে যে সমস্ত নারী তাঁর মনোরঞ্জনে ব্যস্ত ছিল, তারা এখন ক্লান্তিতে এবং গ্রীষ্মের দাবদাহে অবসন্ন হয়ে বিস্রস্ত বসনে এদিক-ওদিক ঘুমিয়ে পড়ে আছে। তাদের সযত্ন সজ্জিত কবরী-বৃন্তচ্যুত ফুলের মতই ম্লান। গত রাতের সযত্ন অঙ্কিত পত্র লেখা এখন তার স্মৃতি মাত্র বহন করছে। ওনার মনে হ'ল—এই কী জীবন। এই নিয়ে মুগ্ধ হয়ে থাকা।

তিনি ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন একটা জাম গাছের তলায়। তখনও গরমকাল, বৈশাখ মাস। জাম গাছের ডালে ডালে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল এসেছে। সেই ফল দেখে উনি ভাবছেন—এই ফল তো একদিন চ্যুত হবে। তেমনি, এই জীবনও ক্ষণস্থায়ী, দু-দিনের। কিন্তু কি মূল্য নিয়ে যাবে এই দু-দিনের হাটে?

এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে, আর একটা কাব্যময় জাম গাছের কথা—যখন শ্রীরামচন্দ্র প্রহর্ষণ পর্বতে উপবেশন করছেন। আজকে সেদিকে যাব না। সেই জাম গাছের তলায় পদচারণা করতে করতে উনি ঠিক করে ফেললেন—আর এখানে নয়। উনি বেরিয়ে পড়লেন ধীরে ধীরে। তারপর তো আপনারা জানেন, তিনি গৃহত্যাগী হলেন। তার পর তাঁর দীর্ঘ কঠোর তপস্যা, ক্লেশের কথা তিনি বর্ণনা করেছেন—'তপস্যার ক্লেশে আমার গায়ের লোম সব খসে গিয়েছিল, চোখ দুটো এত গভীরে ঢুকে গিয়েছিল যে, কোন শুষ্ক কূপের সঙ্গেই তার তুলনা করা চলে।'

এমনই একদিন নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান করে তিনি আর উঠতে পারছেন না। শরীর এত অবসন্ন। তখন আকাশে দেখা গেল দেবদুতদের। তাঁরা তাঁকে মধ্য পথ নিতে বললেন। মধ্য পথ নিয়ে তিনি পরিমিত আহার-বিহারে রত হয়ে তপঃমগ্ন হলেন। যখন একদিন উনি অশ্বত্থ গাছের তলায় তপস্যায় বসলেন, তখন এই সঙ্কল্প করলেন যে, আজ এই আসনে আমার জীবন যায় যাবে, কিন্তু সেই পরম ধন, পরম সত্য প্রাপ্ত না হয়ে আর এই আসন ত্যাগ করছি না।

দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত-কখন তিনি গভীর সমাধির মধ্যে ডুবে গিয়েছেন কেউ জানে না। যখন তিনি সেই দিব্য জ্ঞান লাভ করে এই পৃথিবীর মাটিতে জেগে উঠলেন, পরমানন্দের প্রবাহ সমগ্র সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত হ'ল। দেব-দেবীরা বন্দনা গানে রত হলেন। দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখলেন-পূর্ণ চন্দ্রের আলোয় অশ্বত্থ গাছের নবীন পাতাগুলো ঝলমল করছে। বুঝি বা সেই পরমানন্দের প্রতিফলন। সেদিনও ছিল বৈশাখ মাস, বৈশাখী পূর্ণিমা। বৈশাখী পূর্ণিমা আরো একবার নতুন মূল্য পেয়ে গরবীতা হ'ল।

সেই রাত্রে তাঁর ঘুম হ'ল না। সমস্ত জীবনের কঠোর পরিশ্রমের ফলশ্রুতি নির্বাণ তিনি পেয়েছেন। পরিশ্রম শুধু নয়, জগতের মানুষের দুঃখ-কষ্টের জন্য যে বেদনা, তা আজ বোধি জ্ঞানের সফলতায় মহাকরুণায় উথলিত হচ্ছে। সেই অশ্বত্থ গাছের নীচে, বৈশাখী পূর্ণিমার আলো-ছায়া ভরা প্রান্তরে বুদ্ধদেব আনন্দের আবেশে সারা রাত পদচারণা করলেন। জেগে উঠল জগত মঙ্গল কারণে তাঁর সাতটি নীতি বা সপ্ত সুত্রের কথা। আপনারা বৌদ্ধগয়ায় গেলে দেখবেন মন্দিরের পাশে বেলে পাথরের প্রাচীরের উপর যে সাতটি পদ্ম ফুল আঁকা আছে, সেটি ওনার চংক্রমণের স্থান।

তারপর আর একটা পূর্ণিমা। তাঁর কল্যাণবাণী সুদীর্ঘকাল প্রচার করে তিনি অতি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। আশীতি-বর্ষ বয়স হয়ে গেছে। সারাজীবন ধরে মানুষকে সেই পরম কল্যাণের বাণী, শান্তির বাণী শুনিয়েছেন, ছড়িয়ে দিয়ে গেছে সমস্ত মানুষের কাছে। তারপর একদিন চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন। প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বললেন, 'দেখ, জীর্ণ শকট দেখছ তো, চতুর্দিক বেঁধে-ছেঁধে অতি কষ্টে চালাতে হয়? যেন চলতে পারে না। তখন তো আর পেরেক স্ক্রু ছিল না, তাই বলছেন, 'জীর্ণ সকট যেমন চতুর্দিক বেঁধে-ছেঁদে কষ্টে চালাতে হয়, আমারও সেই অবস্থা। কিন্তু শিষ্যরা অবুঝ, তারা বলছেন, 'প্রভু, এই কল্যাণের বাণী, এ কি বহন করা সহজ আর কারো পক্ষে?' এমন অবস্থায় উনি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন এখন যাকে বলে কুশীনগর, সেইদিকে। এগিয়ে যেতে যেতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চারিদিকে শালের ঘন বন। একটা শাল গাছের নীচে শুয়ে পড়তে যাচ্ছেন। আনন্দ বলল, 'প্রভু, একটু দাঁড়াও, আমি আমার চাদরটা অন্তত মেলে দিই'। তাড়াতাড়ি করে চাদরটা মেলে দিয়েছে, বুদ্ধদেব শুয়ে পড়েছেন। চোখগুলো তখনও প্রসন্নতায়, শান্তির আনন্দে উদ্‌ভাসিত। বিকেল পড়ে এসেছে। ওখানকার মাটি আরও রুক্ষ, লাল, পাথুরে, ঘাস পর্যন্ত নেই বিশেষ। সারা দিনের সূর্যের দারুণ তাপে প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তার পরে বিকেলবেলা ঠাণ্ডা হাওয়া যখন সেই মাটির উপর দিয়ে বইছে, একবার সেই গরম হাওয়া, আবার পরক্ষণেই ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে পৃথিবী যেন দীর্ঘ উত্তাপের মধ্যে দগ্ধ হয়ে এখন বিকেলের হাওয়ায় বুঝি নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে, গোটা মাটি যেন স্পন্দিত হচ্ছে। কিন্তু কিসের জন্য স্পন্দিত হচ্ছে? আনন্দ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, আর বুকে অজানা আশঙ্কা জেগে উঠছে। আজ মাটি যেন কিসের জন্য এত উতলা। যেন তারা তপ্ত নিশ্বাস ত্যাগ করছে। আনন্দ ভাবে-না, এ হয়ত মনের ভুল। মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফিরিয়ে নিয়ে দেখে, এ কি। আকাশ থেকে যেন অজস্র সাদা সাদা ফুল ছড়িয়ে পড়ছে তথাগতের শরীরে। শরীরের চার পাশে। কিন্তু কিসের কারণে? বার বার মনের দরজা আশঙ্কার করাঘাতে কেঁপে ওঠে। আবার মনে হয়, এখন তো শাল ফুল ফোটার সময়। শাল গাছে যে অজস্র ফুল ফুটেছে, তাই বুঝি ঝরে পড়ছে। তথাগতের শরীরে, মুখে, চোখে অপূর্ব দিব্য আনন্দের জ্যোতি উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে বিশ্বকল্যাণ মূর্তি বুদ্ধদেব গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হলেন।..... সেদিনও ছিল বৈশাখ মাস।

কাজেই বৈশাখ মাস এমন একজন মহাপুরুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে, যা আমরা আলাদা করতে পারি নে, বৈশাখ মাসের পাতায়, পাতায় আমাদের অন্তরে

অনুরণিত হয়ে ওঠে। আমরা যেন দেখতে পাই সেই মহাপুরুষের করুণায় উদ্ভাসিত মুখখানি। আর, সামগ্রিক ভাবে আমাদের জীবনের আদর্শ বুঝি বৈশাখ মাসের মধ্যে যেমন, তেমনি তাঁর দিব্য জীবনের মধ্যে দিয়েও রূপায়িত, বাস্তবায়িত হয়েছে।

শ্রীগুরু সত্তা

শিষ্য ভাবে, যারা শ্রীগুরুর উপর সর্বান্তঃকরণে নির্ভর করে আছে, স্বাভাবিক ভাবেই গুরুদেবেরও তাদের প্রতি খানিকটা মনোযোগ আছে। সৎগুরুর একটা গুরুসত্তা, সৃষ্টি হয়, সেটা একটা দিব্য সত্তা। যেমন, ঘটের মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব আছে, কিন্তু ঘটটি ভগবান নয়। তেমনি দেহ নিরপেক্ষ একটা গুরু সত্তা আছে, সেই গুরুসত্তাই সর্বক্ষণ, সর্বতোভাবেই প্রতিটি নির্ভরশীল আত্মার মুক্তির জন্য কাজ করে যায়। —এ একটা।

আর একটা হচ্ছে, সেই সত্তাই দেহগত বা দেহনিষ্ঠ ভাবে প্রতিটি সাধকের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, সেই মত আপন কার্যকারণ, চিন্তা-ভাবনা করেন। একটা দেহ-বিমুক্ত ভাবে, আর একটা দেহগত ভাবে বা দেহনিষ্ঠ ভাবে। একই সত্তা দুটো ভাবে কাজ করে যায়। দেহাতীত যে গুরুসত্তা, শ্রীগুরু বিগ্রহেরই মত দেখতে, শুনতে, তাঁর হাবভাব সবই দেহীর মত, কিন্তু দেহ নিরপেক্ষ। এই দেহ থাকুক চাই যাক, চেতন সত্তা থাকে সর্বদা, সেই সত্তাই নিরন্তর ব্যাপ্তভাবে কাজ করে যায়। আর ব্যক্তিগত ভাবে সেই সত্তাই কখনও দেহনিষ্ঠভাবে শিষ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, চিন্তা-চেষ্টা করেন। ভাগবৎ সত্তা বলতে গেলে সেই সত্তা অনেকটা ভাগবৎ সত্তা। কিন্তু দেহনিষ্ঠ ভাবে ঐ সত্তাই যখন কাজ করছে, তখন ভাগবত্তার ভাবনার সঙ্গে খানিকটা মানুষী কোমলতা। বলতে পারেন শিষ্যের অন্তর্নিহিত দেবসত্তা আর দেহ ব্যতিরিক্ত, দেহ নিরপেক্ষ যে গুরুসত্তা, তার মধ্যবর্তী গুরুসত্তা হচ্ছে দেহনিষ্ঠ গুরুসত্তা। এটা একটা সংযোগী সত্তা হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে।

যেমন উদাহরণ দিচ্ছি। আমি তখন তীর্থে তীর্থে নেহাত আকাশবৃত্তি করে পড়ে থাকতাম, মাঝে কিছুদিনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে থাকতাম। আবার যখন চলে যেতাম কোন তীর্থে, গুরুদেবকে প্রণাম করতে যেতাম। গুরুদেবের চক্ষু ছলছল। গায়ে মাথায় হাত বুলোতেন আর বলতেন, 'বাবা, আবার যাবি? কোথায় যাবি, কত কষ্ট করবি? বেশ তো আছিস, ওখানেই তোর মত তুই থাক না'। —এসব কথাবার্তা। বলতাম, গুরুদেব, আমার বড় ইচ্ছে চলে যাই। ওখানে গিয়ে গুরুদেবকেই দেখছি, বলছেন—'বেশ করেছিস, ঠিক করেছিস। এই তো জীবন। আরও কর। খুব কর'। এটা স্বপ্ন নয়, আসনে বসে, বলা যায় অনেকটা সাক্ষাৎ ভাবে যেটা বলেছেন। আবার ওনার চিঠি যখন এসেছে, তখন ঠিক ঐ কথাই লিখেছেন—ওনার দেহাতীত সত্তা যা বলেছেন, তাই বলেছেন। তাঁর দেহনিষ্ঠ সত্তা আর দেহাতীত যে গুরু সত্তা। এটা যেন কিছুটা মায়িক সম্বন্ধ। যেন একটা ভালোবাসা— 'আহা, তোর কষ্ট হবে। ছেলেমানুষ, তাই কি হবে বাবা; এই করেই হোক না'। আর দেহমুক্ত যে সত্তা, এইটুকু ভালোবাসার সত্তাও না, একমাত্র আত্মার অনুসন্ধান ব্রতে সাহায্য করাই তাঁর কার্য, সেখানে সেই সাহায্য তিনি করে যাচ্ছেন।

সাধনার কোন একটা অবস্থায় আমার আসনে বসলেই কোন বিশেষ স্থানে খুব কষ্ট হত। দেহাতীত গুরু সত্তাকে দেখতাম, যখন কষ্টটা খুব হ'ত। তিনি বলতেন, 'বেশ বেশ, ভালো, আরো হোক, আরো হোক'। আর যখন গুরুদেবের কাছে গিয়ে বলতাম, তখন বলতেন, 'আহা বাবা, কষ্ট হচ্ছে? তাই তো বাবা, একটু চেষ্টা কর বাবা, একটু চেষ্টা করে সহ্য কর বাবা'। সেখানে কিন্তু ঐরকম ভাবে নয়, ভাষাটা আলাদা। দেহনিষ্ঠ গুরু সত্তা অনেকটা জাগতিক হয়েই শিষ্যের পাশাপাশি চলছে। হাতে হাত রেখে। সে হাত শুধু পারমার্থিক কর্তব্যে দৃঢ় নয়, সেই সাথে ভালোবাসায় বুঝি কিছুটা নমনীয়।

আমি একদিন বলে ফেলেছি, গুরুদেব, আর পারছি না, খুব কষ্ট হচ্ছে। তিনি গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলছেন, 'তাই তো বাবা'। তার পরদিন থেকে আর সেই কষ্টটা নেই। আসনে বসে আস্তে আস্তে সেই জায়গাটা ঠাণ্ডা হয়ে আরাম হয়ে গেল। যে গুরু সত্তা উপদেশ দিত—বেশ কর, ঐ কর, তাঁর আর কয়েকদিন দেখা নেই। দেখা নেই মানে, একটা শাস্তি। তার পরদিন গুরুদেবের কাছে এসে দেখি গুরুদেব সোজা হয়ে চলতে পারছেন না, যন্ত্রণায় বেঁকে যাচ্ছেন। ভালোবাসা তখন অনুতাপের পথে শ্রীগুরুর মহিমা উপলব্ধি করল। ধ্যানলোকে আবার তিনি সস্মিত আননে আবির্ভূত হলেন। ব্যথার স্থান পার করে দিলেন, তাঁর অমিত সামর্থে।

এসব বলার নয়, তবু বললাম বিষয়টা পরিষ্কার করার জন্য। একই গুরু সত্তা যেন তিনটি ভাবে সাধকের মুক্তির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এক শিষ্য ভাবে, দুই গুরু ভাবে, তিন নিত্য স্থিত গুরু ভাবে।

মহাপ্রস্থানের পথে

পঞ্চপাণ্ডব রাজত্ব করছিলেন, রাজসুখে ছিলেন। দীর্ঘকাল কৃষ্ণচন্দ্র ছায়ার মত তাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকেছেন—সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, সর্বক্ষণ। তাদের বনপথের জীবন থেকে রাজপথের পথিক করেছেন। সেই কৃষ্ণচন্দ্র যখন চলে গেলেন, কোনরকম আভাস ইঙ্গিত দিলেন না- আমি চলে যাচ্ছি। এঁরা তখন রাজসুখে আছে। প্রথম জানতে পারলেন অর্জুন-শ্রীকৃষ্ণ নেই। রাজ সিংহাসনে বসে আছেন যুধিষ্ঠির। অর্জুন তীরবিদ্ধ পাখীর মত কাঁদতে কাঁদতে আছড়ে পড়লেন যুধিষ্ঠিরের পায়ের কাছে। শুধু একটা শব্দ—শ্রীকৃষ্ণ নেই। শুধু এই কথাটা বলে ভেঙে পড়ল। আর কোন কথা বলতে পারলেন না। তাঁর দেহ-মন ব্যথায় জর্জরিত, নির্জীব-এর মত মাটিতে পড়ে রইল। দেখতে দেখতে যুধিষ্ঠিরের শরীর স্থির, শিথিল হয়ে গেল, তাঁর হাত থেকে রাজদণ্ড খসে মাটিতে পড়ে গেল—খসে পড়ল রাজমুকুট। বহুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে কাটার পর যুধিষ্ঠির কিছুটা সামলে নিয়ে বললেন—আজ রাজদণ্ড খসে পড়ল, আর এটা হাতে নেব না। তিনি আমাদের জীবনে সর্বস্ব ছিলেন, মরণের সময়ও সর্বস্ব। তিনি যখন চলে গেলেন, তখন আর আমাদের এই জীবন, এই জগত, এই রাজদণ্ড, সমস্তই মূল্যহীন। পরীক্ষিতকে ডেকে রাজ সিংহাসনের ভার দিয়ে আর চার পাণ্ডবকে নিয়ে যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করলেন।

কৃষ্ণ বিনা এই জগত মূল্যহীন, সুতরাং এই জগত থেকে তাঁরা বিদায় নিতে চান।

কিন্তু ভগবানের এমনি বিচার, এমনি মায়া যে, যখন তাঁরা ধীরে ধীরে উঠছেন, এক এক করে খসে পড়ছেন—কেউ ধনের গরবে, কেউ মানের গরবে, কেউ শক্তির গরবে একে একে মৃত্যুর মুখে লুটিয়ে পড়ছেন। মহাপ্রস্থানের পথে স্বর্গে আর কেউ আরোহণ করতে পারলেন না একমাত্র যুধিষ্ঠির ছাড়া। একমাত্র যুধিষ্ঠির সশীরের স্বর্গে গেলেন।

দেখ, কি আশ্চর্য, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নেই, এই জগত আমাদের কাছে মূল্যহীন বলে যারা যাত্রা করল, তাদেরই আবার চার জন এই জগতজাত আসক্তির কারণে মৃত হয়ে রইল। কি মায়া দ্যাখ। তাঁরা বলছেন, তিনি যখন চলে গেলেন তখন এই জগত মূল্যহীন। কিন্তু এই জগতের বন্ধনেই তারা বদ্ধ আছে। মূল্যহীন বলছে, কিন্তু মূল্য আছে—সেটাই প্রমাণ হ'ল মহাপ্রস্থানের পথে।

ভগবানকে বাইরে খুঁজছে, ভগবান শুধু বাইরে নয়, তিনি ভেতরেও আছেন। তিনি ভেতর-বাহির ব্যাপ্ত করে আছেন। যদিও এরা বলছে জগত মূল্যহীন, কিন্তু এই জগতের প্রতি নানা সূত্রে এঁরা বদ্ধ আছেন। তার জন্যই তো পড়ে গেল এক এক করে, যেতে পারলেন না। সত্যিকারের তিনি ছাড়া মূল্যহীন এই কথা মুখে বললেও মহাপ্রস্থানের পথ প্রমাণ করল একমাত্র যুধিষ্ঠিরের এই কথা বলার অধিকার আছে, আর কারো নেই। মনে রাখতে হবে পঞ্চপাণ্ডব শ্রীকৃষ্ণ-সখা, সাক্ষাৎ স্নেহধন্য। তবুও তারা অন্তরে বদ্ধ। বাইরে বিরহ আংশিক। বিরহ যদি ভিতর-বাহির একাকার করে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তিনিও একাত্ম হয়ে ধরা দেবেন সন্দেহ নেই। সবাই পড়ে যাবে। একমাত্র যুধিষ্ঠির-যিনি যুদ্ধে স্থির-তিনিই সাফল্যের চূড়ায় অধিষ্ঠিত হবেন।

আমরা মুখে বলতে পারি, আমরা ভগবান ছাড়া কিছু চাই না। কিন্তু কোন না কোন সূত্রে আমরা নিদারুণ ভাবে বদ্ধ হয়ে আছি। যিনি পৌঁছতে পারবেন, তিনিই যুধিষ্ঠির। তার কাছেই সত্যিকারের জগত মূল্যহীন। তিনি ছাড়া আর সব কিছুই অর্থহীন।

নির্জন বাস

কেউ যদি দরজায় টোকা মারে, বলবে সাধুদের দরজায় কেউ টোকা দ্যায়? ধমক দিয়ে দেবে। জীবনের সময় সুযোগের সদ্ব্যবহার করছ। মানুষ যতই মনে করুক আমার কোন মায়া নেই, আকর্ষণ নেই, কিন্তু যখন একান্ত জীবনযাপন করে, তখন সেইগুলো স্পষ্ট ফুঠে ওঠে যখনই সে একান্ত জীবনের মধ্যে একান্ত ভাবে সাধন-ভজন করতে চায়, তখনই সে বুঝতে পারে মনের কোথায় কি আছে, না আছে, কতখানি আছে এই আকর্ষণ। অনেক লাভ আছে এতে। ঠাকুর হাজার বার বলেছেন নির্জন বাস, একান্ত বাস।

যখন মানুষ ঈশ্বরমনস্ক হয়, তখন বুঝতে পারে জীবনের আকর্ষণ এবং অভ্যাসগুলো ক্রমেই একটু একটু করে সরছে। মানুষ যদি ঠাঁই নাড়া হয়ে একান্তে কোন তীর্থে চাষ-বাস করে, তখন এই সরার ব্যাপারটা পরিষ্কার ভাবে এবং খুব সহজেই হয়ে যাবে। কারণ পূর্বের পরিবেশ-পরিস্থিতি থেকে সরে আসছে তো। তার অভ্যাসগুলো যে সরছে, এটা খুব সহজেই হয়ে যাবে। পূর্ব জীবন-পূর্ব অভ্যাসের প্রতি মানুষের একটা দায় থাকে তো? পরিবেশ পরিবর্তন করে দিলে মানুষের দায়, যা তার পরিবর্তিত মানসিকতায় বাড়তি, সহজেই বের করা যায়। এটা একান্ত বাস থেকে ফিরে আসার ক্ষেত্রেও সমভাবে সত্য।

(একান্ত জীবনের সচেতনতা থাকতে হবে—দেখতে হবে জীবনটা যেন অলস না হয়ে যায়। জাগতিক ভাবে অতটা নয়, কারণ সাধকের তো জাগতিক ব্যাস্ততা অতটা নেই। মানসিক দিক দিয়ে যেন জীবনটা অলস, ক্রমে জড় না হয়ে যায়। একান্ত জীবনে সাধারণত পাহাড়ে, জঙ্গলে বা নির্জন কুঠিয়ায় সাধুরা থাকে। দীর্ঘকাল সেই নির্জন পরিবেশ পরিস্থিতিতে এই মনের যে চরম সচেতনতা, ঈশ্বরমনস্কতা, সেটা সংস্কারের তেমন জোর না থাকলে অনেকটা অবশ হয়ে আসে আস্তে আস্তে। হয়ত নেশাগ্রস্ত নয়ত গজালিগ্রস্ত হয়ে যায়—যেগুলো আমি দেখেছি। একান্ত জীবনে চব্বিশ ঘণ্টা একটা নিয়মের মধ্যে থাকতে পারলে আর অসুবিধা নেই। এতক্ষণ জপ-ধ্যান করব এতক্ষণ পুজো-পাঠ করব, এতক্ষণ হোম, শাস্ত্রপাঠ করব, এই নিয়ম যদি করে থাকতে পার, তাহলে আর অসুবিধা নেই।)

শূন্যতা

মাতৃবাণী'তে পড়লাম পণ্ডীচেরীর মা বলছেন, 'শূন্যতা অনুভব করাই হচ্ছে গ্রহণ সামর্থ্য যে বৃদ্ধি হয়েছে, তার লক্ষণ'।

একটা মানুষ যেমন এই স্থূল জগতে, পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে আছে, তেমনি প্রত্যেক মানুষের যে মানস দেহ, তা কতগুলো মূল্যবোধের উপর, ভাবনার উপর দাঁড়িয়ে আছে। যখন মানুষ সত্যিকারের আধ্যাত্মিক পথে এগোয়, তখন পুরাতন মূল্যবোধ নষ্ট হতে থাকে, নতুন মূল্যবোধ জাগতে থাকে। এটা একটা পদ্ধতি যা সব সময় তার মধ্যে প্রবহমান হয়, তার মধ্যে সক্রিয় থাকে। যে গতানুগতিক ভাবে ধর্ম অনুসরণ করে আছে, তার কথা নয়, যার মধ্যে যথার্থ আধ্যাত্মিকতা জাগ্রত হচ্ছে, তার মধ্যে এই পদ্ধতিটা সবসময় চলে। তার ভাবনার পুরনো জগত ভেঙে নতুন জগত নিরন্তর গড়ে ওঠে, তার খণ্ড, ক্ষুদ্র মধ্যবর্তী সময়ে মাঝে মাঝেই শূন্যতা আসে, সেটা অনুভব করে। -যে বাঁচার মানেটা গোলমাল হয়ে যায়। সাধনা বজায় থাকলে নিত্য-নতুন উন্নত মূল্যবোধের প্রত্যাশী হয় অন্তরাত্মা, আর এই ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়েই মানুষ অমৃতায়িত হ'য়ে ওঠে।

অবশ্য এটা ধরেই নেওয়া যায় পূর্ব পূর্ব জন্মের শুভ সংস্কার গভীর ভাবে তার আছে, না হলে এত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে কেমন করে! এটা মনে রাখতে হবে, উন্নত আধারে এই শূন্যতা অনুভব খুব স্বাভাবিক আর সোচ্চার।

প্রত্যাখ্যান

মাতৃবাণীতে' মাদার বলছেন-'পার্থিব চেতনায় ভগবানকে মানুষ সহ্য করতে রাজি, কেবল যদি ভগবান সেখানে তাদের জন্য কষ্ট ভোগ করেন। এটা কি পরিহাস?

পরিহাস বটে, তবে এই পথেই মানুষ তার ক্ষুদ্র স্বার্থের পথ পরিষ্কার করেছে। এইজন্য বলা হয় জগতের পাপ-তাপ নিয়ে তিনি ক্রুসিফায়েড হয়েছেন। ক্রসের একটা মন ভোলান ভাবনা রেখেছে। আসলে মহাজনরা যে ভাবনা, যে জীবনের কথা বলতে চান, যে জীবন দিতে চান, এই পৃথিবীর মানুষ তা বারবার রূঢ় প্রত্যাখ্যান করে। সেই জীবন না, আমরা আমাদের মত জীবন যাপন করব সেটাই ক্রুসিফিকেশন। ক্রুসিফিকেশন হচ্ছে একটা প্রত্যাখ্যান-জগতের মানুষ মহৎ ভাবানগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে। রবীন্দ্রনাথের ভারি সুন্দর কবিতা আছে-

'একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে
রাজার দোহাই দিয়ে
এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি
মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি।'

কাজেই প্রত্যাখ্যানের রূপ পাল্টায় মাত্র। প্রত্যাখ্যান বজায় থাকে।

একাদশী

প্রথমদিকে ঠাকুর মাস্টারমশাইকে বলেছিলেন, 'একাদশীটা ক'রো, এতে দেহ শুদ্ধ হবে, ভক্তি লাভ হবে'। তা, একাদশী কি পূর্ণিমা, অমাবস্যা থেকে বেশি, না কি অন্য কোন তাৎপর্য আছে?

অমাবস্যা, পূর্ণিমা থেকে একাদশীর জোর বেশী নয়। কিন্তু অমাবস্যা, পূর্ণিমাতে কে পৌঁছুতে পারছে? যে সেখানে পৌঁছতে পারছে, তার কাছে অমাবস্যা, পূর্ণিমা এক হয়ে গেছে, সব তিথি সমান হয়ে গেছে। কিন্তু অমাবস্যা, পূর্ণিমাতে তো আমরা পৌঁছতে পারিনি আমাদের অবস্থার দিক থেকে, এজন্য সর্বজনগ্রাহ্য একটা একাদশী মেনে নিয়েছি। সৎ ভাবনার দিক থেকে একাদশীটা আমাদের সৎ সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এনে দ্যায়। যেমন ঘুম থেকে জেগে উঠেছি, এই বোধটা জাগতে সবার সমান সময় লাগে না। তেমনি দিব্য সত্তার বোধ সম্বন্ধে কারো বোধটা সহজেই জেগে ওঠে, কারো বেশী সময় লাগে, সেইরকম। আমরা একটা তিথি ধরে নিয়েছি। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অত দূর উপলব্ধিতে, অনুভবে আনবে, ধরে রাখবে, এ সংস্কার খুব বিরল। সৃষ্টির এই দোলনের প্রান্তিক বিন্দু দুটি, যে তার বোধে আনতে পারবে বা এক করতে পারবে, সে অবশ্যই এই উত্তবণের উর্ধ্বতম বোধে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

আমরা হয়ত কেউ আছি ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমীতে। কিন্তু মোটামুটি ধ'রে নেওয়া হচ্ছে একাদশীতে। কেননা, সে তো অধ্যাত্ম-পথে এসেছে, সেইজন্য ধরে নেওয়া হচ্ছে। ধ'রে নেওয়া হচ্ছে সে অধ্যাত্ম পথে বা বোধে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মোটামুটি তিন-এর দু-ভাগ এগিয়ে গেছে, তিন-এর এক বাকি। ঝোঁক, প্রবণতা, বা ঢল সে একটা পেয়েই গেছে। অধ্যাত্ম আনন্দের বোধ।

সিদ্ধ ও অবতার

নিম্বার্ক দর্শন এবং তারা যে মত বা অবস্থার কথা বলে গিয়েছেন-নিম্বার্ক মহাজনেরা- এবং গোরক্ষনাথজী আর অন্যান্য নাথ মহাযোগীরা যা বলছেন, এইগুলো পড়ে আমার এটাই সবচেয়ে ঠিক ঠিক বলে মনে হয়েছে-উভয় ক্ষেত্রেই সহজ অবস্থা শেষ অবস্থার কথা বলেছে। আগমাদি অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রেও এই কথার সমর্থন মেলে। মহাযোগী রামদাস কাঠিয়াবাবা বলছেন, 'আরে পরমাত্মস্বরূপ হোনা তো আউর হ্যায়' ওয়ে এক বকত্ হোনেসে কবহি ছোড়তা নেহি। উস্‌কা ফির সমাধ-ফমাধ কুচ্ছ নেহি, সদা এক অখণ্ড রয়তা'।—একালের তিন মহাযোগী-তৈলঙ্গস্বামী, কাঠিয়াবাবা, এবং গম্ভীরনাথজীকে আমরা এই সহজ অবস্থাতেই দেখতে পাই।

তবে ভগবান যখন আসে, তিনি লীলায় বিভিন্ন ভাবনা অঙ্গীকার করেন। মনে কর কৃষ্ণ ভগবান, চৈতন্যদেব ভগবান। ওঁনারা লীলায় বিভিন্ন ভাব, বিচিত্র অবস্থা

অঙ্গীকার করেন। যোগশাস্ত্রের নিরিখে সেইগুলো বিচার করা যায় না। কৃষ্ণলীলা তুমি যোগশাস্ত্রে কি বিশ্লেষণ করবে? পারবে? কিন্তু এই নিম্বার্করাই তো কৃষ্ণকে ভগবান বলে, মুক্তি-দাতা রূপ বলে পুজোআচ্চা চালু করেছে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল, বলবে? কৃষ্ণচন্দ্রকে স্বয়ং ভগবান বলছে। অথচ ওনাদের সনাতন ধারায় যোগতত্ত্বে সেই হিসাবে কৃষ্ণের মূল্যায়ন করা যায় কি? ওনারাই আবার নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ বা সর্বাত্মক ব্রহ্মবাদ এর কথায় বলেন—কৃষ্ণতো ষোড়শ কল থে, মগর আওর এক হ্যায় সহস্রকল, উ কভী আতা নেহী, যাতা নেহী।

শাস্ত্রের নিরিখে যা আছে, মানুষ-সাধক সাধনা করে তা উপলব্ধি করে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু একজনকে যখন অবতার বলছ, তার সম্বন্ধে এসব বিশ্লেষণ -নিরিখগুলো চলে না। চৈতন্যদেব শেষ জীবন পর্যন্ত হে কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলে কান্নাকাটি করে কাটালেন। মুনিজন ধ্যান গম্য সেই রূপেই তো তিনি জগতের চৈতন্য সম্পাদন করে বেড়াচ্ছেন।

যখন ভগবান বলছি, তার নিরিখটা আলাদা-সেটা আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রের অবতারের প্রমাণের নিরিখ। সেখানে কোথাও লীলা রহস্যের আড়াল আছে। সেই রূপই মুক্তিদাতা রূপ। এই যোগমায়ার আবরণটুকু তিনি টেনে এনেছেন মানুষের আবরণটুকু ঘোচাবার জন্যেই। মানুষের মুক্তির জন্য সেই রূপই, সেই লীলাই সবচেয়ে মঙ্গলজনক। অবশ্য সবাই অবতার হতে গেলে, বা বানাতে গেলে অসুবিধা আছে।

রামচন্দ্র ধনুর্বান নিয়ে সারাজীবন যুদ্ধ করলেন। আবার সীতার জন্য হো-হো করে কাঁদলেন। কিন্তু তাঁকে চিন্তা করে হাজার হাজার সাধু, অযোধ্যা, ত্রিকূট, চিত্রকূট সব পাহাড়ের পাহাড়ের নেংটি পরা সাধুরা কঠোর-জীবন, বৈরাগীরা জীবনপণ সাধনা করে যাচ্ছে, উপলব্ধির জীবনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে পরামানন্দের রাজধানীতে।

রামচন্দ্র যখন নৈমিষারণ্যে পৌছলেন, তখন সেখানে ৬০ হাজার ঋষি তপস্যা করছিলেন। তারা বলল, ও, রাজা এসেছে। তাদের মধ্যে ১২ জন চিনতে পেরেছিলেন তিনি ভগবানের অবতার বলে। তাদের মধ্যে ক'জন আবার বনে গেলেন। বললেন, জানি তুমি অবতার, ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের মন নির্বিশেষের ধ্যানে মগ্ন আছে। তাঁদের মধ্যে মাত্র সাতজন তাঁকে পুজো করেছিলেন। স্তব করেছিলেন তাঁর ধর্মসংস্থাপনকারী ভূবন-মঙ্গল স্বরূপের।

রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে বলতে পারি, তিনিই যথার্থ জগতগুরু, রূপে জগতের মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়েছিলেন। সারদা মা একটা কথা বলেছেন, জগতের মানুষ যত ভাবে তাঁকে আস্বাদন করে পরমানন্দ লাভ করেছে, তিনি সে সব আস্বাদন করে বিভোর থাকতেন। তা হলে, তিনি সাধক ভাব অঙ্গীকার করেছেন এবং সাধক জীবনের ও সিদ্ধ জীবনের বিভিন্ন অবস্থা প্রকাশ করেছেন, যা তাঁর গুরু ভাবেরই প্রান্তিক নিদর্শন মাত্র। লীলা প্রসঙ্গে আছে দেখবে, সাধক ভাব, গুরু ভাব। তিনি সাধক অবস্থা, সিদ্ধ অবস্থার বিভিন্ন ভাব গুরু ভাব, এসব বিভিন্ন অঙ্গীকার করে দেখিয়ে গেছেন। বস্তুত তিনি এসবের অনেক উর্ধ্বে। যখন ভাব বলছি, তখন জগতের মঙ্গলের জন্য স্বীকার করছেন। তাঁর বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা, প্রাপ্তির প্রসন্নতা, বিতরণের অধীরতা, সব জীবন্ত ছবি। কিন্তু তিনি চিরন্তন। এটাই মনে হয় ঠিক ঠিক। এবং তিনি সচ্চিদানন্দ গুরু রূপেই প্রকাশ হয়েছেন জগতে।

কেননা, সচ্চিদানন্দ গুরু রূপে তাঁর এই বাণী জগত মঙ্গলের কারণস্বরূপ। সেই জন্য তিনি সচ্চিদানন্দ গুরু রূপে প্রকাশ হয়েছেন বলেই তিনি এই ভাবগুলোকে জগতে প্রকাশ করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন-'সচ্চিদানন্দই গুরু'। কল্পতরু তো এই সচ্চিদানন্দ গুরু রূপেরই প্রকাশ। সচ্চিদানন্দ গুরু রূপেই আশীর্বাদ করেছেন-'তোমাদের চৈতন্য হোক'। নিত্যকালের জন্য শ্রীগুরু, বিগ্রহ রূপে প্রকাশ হয়েছেন-সদ্‌গুরু অবতার তিনি। স্বামীজী বলেছেন, 'অবতার বরিষ্ঠায়'। বস্তুতপক্ষে বিশেষ করে 'সাধকানাং হিতার্থায়' এবং সার্বজনীন ভাবে 'ধর্মসংস্থাপনর্থায়' আর কোন্ রূপ এর চেয়ে কল্যাণকারী হতে পারে।

প্রেমাভক্তি

গোলকের ধন, অনর্পিত সম্পদ, পৃথিবীর ধন নয়। প্রেমাভক্তি—তার এক কণা পেলেও লোকে অধীর-মাতাল হয়ে যায়। মানুষের যে-আমি আস্বাদন করবে, তা নয়, প্রতিটি কোষে সেই আনন্দ-অমৃত আস্বাদন করার জন্য মহা-ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেখানে একক ব্যক্তিবোধ তো থাকে না। শরীরের প্রতিটি কণা আস্বাদন করছে। মানুষ যে দাঁড়িয়ে আছে, তার মানসিক একটা ব্যাক্তিত্ব আছে তো, —মনে কর আমি বসে আছি চেয়ারের উপর, এটা আমার আশ্রয় তো? তা, প্রতিটি মানুষের একটি মানসিক আধার আছে, আধারটাই ব্যাপ্ত-বেসামাল হয়ে যায়। কি অসহনীয় আনন্দের অবস্থা বল দিকিনি? ঐজন্য নাম শোনাতে হয়, নামের অবলম্বনে স্থিতি হয়। না হলে হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। অন্তরের গভীরতম আনন্দের এক কণা প্রকাশ। থাকতে পারছে না তো। সেই অধীর আনন্দ ভেতরে তোলপাড় করে। আর, যদি সমাধিস্থ হয়ে গেল, তো হয়ে গেল—সাগরে সমাপন। না হলে মাঝামাঝি অবস্থা টলমল করে। এইজন্য নামটা ধরিয়ে দেওয়া হয়। এই যে আমরা নাম আশ্রয় করে ভগবানের পথে যাচ্ছি তো, সেটাই তখন উল্টো,—সেই নামটাই তখন স্থূল, জিনিস। সেই অবস্থায় নামটা আশ্রয় ক'রে মানুষ নিজের দিব্য ব্যাক্তিত্বে স্থির হয়। এই নামটাই তখন ব্যাক্তি-ত্বের আধারভূমিকে ধরিয়ে দেয়। 'আনন্দ অমৃত রূপং যদ্ বিভাতি'। এই সর্ব্ব ব্যাপ্ত আনন্দ স্বরূপ তখন মহাজনের ব্যাক্তিত্বের রূপ পরিগ্রহ করে। এই শরীরে মুহুর্মুহু যে কাঁটা দিয়ে পুলক ওঠে, শরীরের লোমকূপগুলো দিয়ে রক্ত ঝরে, সেটা আস্বাদনের গভীর অবস্থার সামান্য বাহ্য প্রকাশ। যেমন সাধন-সমাধি আর সিদ্ধ-সমাধির দুটোর মধ্যে দস্তুর ফারাক, তেমনি সাধন-ভক্তি আর সিদ্ধ-ভক্তির বা প্রেমাভক্তির মধ্যে ফারাক। সিদ্ধ-ভক্তি অনর্পিত, গোলকের ধন। সে নেবার অধিকার বা এক কণা পেলেও মানুষ দেবতা হয়ে যায়। এই জগতে যখন ভগবান বা ভগবতকল্প পুরুষ অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর মধ্যে পূর্ণ প্রেমের প্রকাশ। কথামৃতে আছে লক্ষণকে রাম বলছেন-ভাই, যেখানে দেখবে উর্জিতা ভক্তি, হাঁসে-কাঁদে-নাচে, গায় সেখানে জানবে আমি আছি। তার এক এক কণা জগতের মানুষ আস্বাদন করে বিভোর হয়। সে জিনিস নেবার আধার এই পৃথিবীতে কম-মানে তিন কালেই বিরল। ভগবান এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে, তাঁর কৃপা কণা নিয়ে তাঁর পার্ষদরা সহজেই সেসব আস্বাদন করেন। ভাগবতের কথা। এই হাসছে তো এই কাঁদছে। সুবর্ণ বলছিল, চৈতন্য চরিতামৃতে যে এত-সব লিখেছে, সবসময় ঠিক লাগে না। আমি বললাম, তেমন কিছুই লিখতে পারেনি। সেই জিনিস লেখার নয়। চৈতন্য চরিতামৃতের কথা—গর্গর মাতোয়ারা-আমরা কি বুঝবো। সে যে গোলকের অনর্পিত ধন। আবার ঠাকুরের জীবনে তার নবরূপায়ণ।

পুরুষকার-শরণাগতি

জপটা যতক্ষণ করছ-পুরুষকার, আর যখন হচ্ছে, তখন শরণাগতি আর পুরুষকার এক হয়ে যাচ্ছে, এটা জপের পরিণত কথা। যে কেউ বললে হবে না আমার জপটা হচ্ছে। করা আর হওয়ার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। যার হচ্ছে, তার তো অনেকটা হয়েই গেল। কারণ জপটা সেখানে অনেক গভীরে চলে গেছে। যেখানে আমরা চলে যাচ্ছি, তা বাক্য-মনের প্রায় অতীত অবস্থা। এইজন্য পুরুষকার, শরণাগতি দুটো বিপরীত মনে হলেও পাশাপাশি এবং নির্দিষ্ট স্থিতিতে রাখতে হবে। যেখানে পুরুষকার, শরণাগতি একাকার, সেখানে যুক্তি-বুদ্ধির উত্তর জগতে আমরা এসে গেছি। তখনই বুঝতে পারবে কেন বিপরীত হলেও দুটো পাশাপাশি রাখতে বলছে। এটা খুব ভালো জিনিস। যখন পুরুষকার প্রচণ্ড বেড়ে যায়, শরণাগতি তখন কমে আসে। মনে একটা অশান্ত অবস্থা-শুধু সংগ্রাম। আবার শরণাগতি প্রচণ্ড বাড়তে থাকলে পুরুষকার খুব কমে আসে, সাক্ষাৎ তপস্যার ভাবটা কমে আসে। দুটোকেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে রাখতে হবে। সেখানে জীবন-সাধনা জীবন্ত এবং প্রেরণাপ্রদ থাকে। সাধক যত উন্নত হচ্ছে সাধনায়, তার অন্তর্জগতে আপাত-বিরোধিতা কমতে থাকে। ক্রমে বাক্য-মনের অতীত জগত প্রত্যক্ষ-আনন্দ-গোচর হয়। শরণাগতি পুরুষকারের অতীত অবস্থা, এইজন্য পঞ্চম পুরুষার্থ বলে। উপলব্ধির জগতে সাধক যদি প্রবিষ্ট হয়, জানতে পারে এই আপাতবিরোধী দুটো জিনিস শ্রীভগবানের অচিন্ত কৃপাশক্তি তে একাকার হয়। হিমালয়ে একটা বিখ্যাত তীর্থ আছে—জ্বালামুখী, সেখানে জলের মধ্যে আগুন জ্বলছে। আসলে গ্যাস। কিন্তু এই সহাবস্থানকারী আপাতবিরোধী রূপ পরমের ইশারা বলেই তীর্থ হিসাবে গড়ে উঠেছে। জলে আগুন জ্বলছে, পাথরে আগুন জ্বলছে, সেটা প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের কাছে তীর্থ। সাধারণ মানুষ অলৌকিকত্বে ভুলে যায়, আপ্লুত হয়। ওরে বাবা! চন্দ্রনাথে জলের উপর আগুন জ্বলছে। সত্যিই মাহাত্ম্য আছে। কিন্তু কোথায় মাহাত্ম্য সেটা তো বুঝতে পারছে না। সেটা সূক্ষ্মতর, গভীরতর উপলব্ধির জগত। বাইরে এটা একটা প্রতীক-ভগবানের যেমন অনন্ত প্রতীক, তেমনি একটা। প্রাকৃত লোক বলবে-আঃ, কি মাহাত্ম্য। কিন্তু অপ্রাকৃত তত্ত্ব তার মধ্যে প্রকাশ হচ্ছে। নীল শিখা স্থির হয়ে আছে। প্রুসিয়ান ব্লু কালার। লোকে সন্দেশ-টন্দেশ কিনে ওকে ঠেকিয়ে প্রসাদ করে নিয়ে যাচ্ছে-কি বাত। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে অসীম মাহাত্ম্য বিরাজ করছে। যুগে যুগে কত সাধক ভগবানের অচিন্ত স্বরূপ চিন্তা করেছে সেখানে। আগুন যেন তারই প্রতীক-প্রতিমা হয়ে আছে। পুরো জায়গাগুলো আধ্যাত্মিক তেজে গম্‌গম করছে। কি জ্বালামুখী, কি মণিমহেশ, কি চন্দ্রনাথ, সব জায়গায়।

যে হাঁটবে, সেই বুঝবে কথাগুলো কতখানি সত্যি। সাধারণ মানুষ তো অলৌকিকত্ব বুঝবে। কারণ তারা তো আপাত-বিরোধিতার জগতে হাবুডুবু খাচ্ছে। তবু শ্রদ্ধা আর শুচিতা নিয়ে গেলে তার লাগবে বই কি। গোরক্ষনাথজীর গুহা দেখেছি—ভেতরে আধো-অন্ধকারে আগুন-আলো জ্বলছে, বসার সুন্দর জায়গা। এমন গুহা অনেক দেখেছি, তার মধ্যে একটা ফাটল দিয়ে পরিষ্কার জল এসে অন্য পাশে আর একটা ফাটল দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। টলমল করছে একটু জল। বশিষ্ঠের গুহাতে একটা বাটির মত জায়গা, পরিষ্কার জল ভরে আছে, তুলে নাও, আবার ভরে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক। পরিষ্কার বসার জায়গা। প্রাচীনকালে সাধু সন্তরা বসত, তাদের পাছার ঘষায় নিচেটা চক্‌চক করছে, পালিশ হয়ে আছে। আর শিখা জ্বলছে গোরখ ডিব্বায় নিকষ পাথরের গা থেকে। একদল যাচ্ছে।

বলছে, কি মহিমা। আর একদল যাচ্ছে, বলছে—ভেতরে গ্যাস আছে, বুঝলে? এ সায়েন্স। কোথায় মহিমা কে বলবে তারা সব সায়েন্স ঝাড়ছে। জানেনা নিউটন থেকে আইনস্টাইন পর্যন্ত সকলেই প্রার্থনায় আনত হয়েছে। আমি দীনতায় আপ্লুত হয়েছি সেই অনন্ত তপস্যাপূতঃ জীবনের অনুধ্যানে।

সিদ্ধি

এই সৃষ্টি পঞ্চ তত্ত্বের খেলা। যে ষষ্ঠ তত্ত্বে পৌঁছেছে, তার মধ্যে যোগসিদ্ধির প্রকাশ হয়। যে পৌঁছে দিচ্ছে, তার থেকে যাকে পৌছে দেওয় হল, তার কিছু কম থাকবে। তৃতীয় ভাগ কথামৃতে আছে, কেউ সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠল, আর কাউকে টেনে তুলল। যাকে টেনে তুলবে, তার সেইটুকু সামর্থ থাকা দরকার। ঠাকুর কি প্রকারান্তরে বলেন নি, তাঁর অষ্টসিদ্ধি ছিল? যখন তিনি স্বামীজীকে তা দিতে চেয়েছিলেন।

যে যোগসিদ্ধ হবে, তারই মধ্যে যোগসিদ্ধি প্রকাশ পাবে। তবে কেউই বিশেষ প্রয়োজনে বা ঈশ্বর—ইচ্ছা ছাড়া শক্তি-সমুহের স্বতন্ত্র প্রকাশ করে না। উন্নত আধারে শক্তি-সিদ্ধি সমুহ স্বতঃই এবং অলক্ষিত ভাবে সেই বিভূতিভূষণকে ঘিরে ক্রিয়াশীল থাকে। যোগসিদ্ধির দিকে যারা আকৃষ্ট হয় তারা সাধারণ মানুষের দল, আর ভাগবত জীবন ঈশ্বরপ্রেম, সমাধি, এসব দেখে যারা আকৃষ্ট হয়, তারা মৌমাছির দল। যাদের গভীরতর ভাগবত কর্ম থাকে, তারা এইগুলো বড় একটা আলাদা করে প্রকাশ করেন না- তাতে অবাঞ্ছিত লোকের ভিড় হবে, তাঁর কাজ পণ্ড হবে। ঠাকুরের কাজ আলাদা ছিল। তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের ভাগবত জীবন গঠনের কাজেই অধিকতর ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু ত্রৈলঙ্গ স্বামীর অলৌকিকত্ব জীবনভোর। তাঁকে তো ঠাকুর সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ বলেছেন। তাঁর জীবনে তো যোগসিদ্ধির ছড়াছড়ি ছিল। এই দিকটাই তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন-ভাগবত শক্তি সবকিছুর উর্ধ্বে। সাধারণ মানুষের কাছে, তাদের ভাষায় অধ্যাত্ব পুরুষের মহিমা প্রকাশ করেছেন, আর ত্রিপুরলিঙ্গ প্রমুখ অধিকারী অন্তরঙ্গদের কাছে তাঁর অতলান্ত অধ্যাত্ম স্বরূপ।

☆ আনন্দময়ী মায়ের বিশাল ঐশর্যের প্রকাশ-বড় বড় আশ্রম-তাঁর জীবৎকালেই।

☆☆ "মায়ের কাছে যে সমস্ত শেঠেরা এসেছিল তারা তাদের সামর্থ ঢেলে দিয়ে ছিল। তাতে আশ্রম হয়েছে। আবার ভেঙে পড়ছে। কিন্তু ঐ যে দিল, তাতে তাদের অন্তরে ত্যাগের এবং প্রেমের বীজ বপন হয়ে গেল। তাদের মন তো বিষয়েই, সেই বিষয় দিয়েই আনন্দময়ী মাকে ভক্তি করেছে, তাতেই তাদের মধ্যে ত্যাগ এবং প্রেমের বীজ বপন হয়েছে। একজন জিজ্ঞেস করেছিল—'মা, এত যে বিশাল বিশাল আশ্রম হোল, কি হবে? তিনি বললেন, 'যা হবার তাই হবে।' 'তা এই যে হোল? 'যা করার করা গেল, যা হবার হবে'। অর্থাৎ তাঁর আনন্দে তিনি রয়েছেন, এখন ভেঙে পড়ছে, পাবলিক দখল করে নিচ্ছে। তাঁর কি! মহাভোজ হয়ে গেছে, পাতার খবরে কাজ কি। মা মায়ের মতই আছেন, পদ্ম পত্রে জল।

"উত্তরাখণ্ডে বেশি দেখা যায় সন্ন্যাসীরা বিশাল সব জমিদারি ফেঁদেছে। জীবনভোর তারই দেখভাল। ঠাকুর তখনই বলেছেন—'মোহন্তকে দেখলাম যেন একটি পাকা গিন্নি। ওঁনাদের সঙ্গে তো আর এদের তুলনা হয় না। ওঁনারা আকাশের জিনিস—এসেছিলেন,

আনন্দ করে, আনন্দের স্বাদ লাগিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। ওঁনাদের সঙ্গে কার তুলনা? আশ্রম যখন জাগ্রত আধ্যাত্মিকতাবিহীন হয়ে যায় তখন তা মৃতদেহের মতই পূতিগন্ধময়।

স্বরূপানন্দজীর কথা—আমার নিজের দেখা। শিষ্যরা বলছে—বাবা, এত লোক এসেছে কিছু বলবে না? কিছু বলবে না? উনি তো সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছেন ক্ষণে ক্ষণে। কোনরকমে বললেন—হ্যাঁ যাচ্ছি। বলেই আবার তলিয়ে গেলেন। মুখ-চোখ লাল। অপূর্ব সৌন্দর্য। কোনরকমে ধরে ধরে নিয়ে গেল। ওঁ-ওঁ-ওঁ করতে করতেই চুপ। আবার খানিকক্ষণ পরে জড়ানো কিছু স্বর বেরোল। হাজার-হাজার মানুষ চোখের জলে ভাসছে, এই স্বরূপানন্দজীর পূতঃ জীবন। ওঁনার শিষ্যরা বিভূতির কথা বলে, বিভূতিভূষণের সেদিকে কোন খেয়াল নেই।

("হেলায় আঙুলে যিনি ধরেছিলেন গিরি গোবর্ধনের ভার।
নিষ্প্রাণ পড়ে থাকে কংস পদ নখের ভারে তাঁর।")

যুগে যুগে ভগবান আর ভগবৎকল্প মহাপুরুষদের খেয়াল। এর কোন ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ নেই, কোন কৈফিয়ত দেওয়ার নেই কাউকে। স্বরাট ওঁনারা, নিজেদের আনন্দে নিজেরা ভাসছেন।

নিত্যলীলা

☆ স্থূল জগতে যেমন লীলা করছেন, তেমনি সূক্ষ্ম কারণ জগতেও তো গভীর সব লীলা করছেন—যেমন বৈকুণ্ঠ ধাম। সূক্ষ্ম স্তর বা কারণ স্তরের লীলা তো এখানকার থেকে উন্নত? আর সেখানে যারা লীলা আস্বাদন করছেন তারা তো এই স্থূল জগতে যারা লীলা আস্বাদন করছেন তার থেকে বেশি আনন্দ পাচ্ছেন?

☆☆ গভীর তো বটেই। কৃপা-সামর্থে লীলা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ভগবানের সব নিত্যধাম আছে, নিত্য লীলা হচ্ছে, ভগাবানকে নিয়ে নিত্য উৎসব। ভগবানের যারা লীলা-পরিকর-নিত্যকালের পরিকর, আর যারা পরিকরত্ব লাভ করেছে, সিদ্ধ দেহে যারা লীলায় আশ্রয় পেয়েছেন। সেইসমস্ত ধামে ভগবানকে নিয়ে নিত্য নব নব আনন্দ হচ্ছে। অর্থাৎ প্রতিমুহূর্তে সেই আনন্দ নবীনতা প্রাপ্ত হচ্ছে। সুতরাং সেই আনন্দ নিতুই নব, আর নিত্যই সমৃদ্ধ হচ্ছে সেই লীলা, সেই আনন্দের কোন বিরাম নেই, একঘেয়েমি নেই, সেইজন্য প্রতিহমুহূর্তেই মনে হচ্ছে এইমাত্র পূর্ণ আনন্দের শুরু। 'স্বাদু পলে পলে'। ভগবানের পার্ষদরা সেখানে ভগবানকে নিয়ে আনন্দে বিভোর হয়ে আছেন, এই জগতে যাঁরা নিত্যলীলা দর্শনের অধিকারী, তাঁরাও দর্শন করছেন। সেখানকার সমস্তই চিন্ময়-জীবজন্তু, লতা-পাতা, ফুল-ফল, নদী-পাহাড়-গাছপালা, ভগবানের সিংহাসন, উপাধান, বালিশ, চাদর, সব কিছু। অর্থাৎ তাঁকে নিয়ে সর্বব্যাপ্ত আনন্দ-উন্মাদনা পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। তাই বলা হয় সর্বাতিশায়ী-সর্বপরিপ্লাবি।

☆ সেখানে ভেদাভেদ নেই?

☆☆ 'সে স্বগত ভেদ। অভেদের মধ্যে ভেদ হচ্ছে, না হলে লীলার বৈচিত্র আর প্রসার হচ্ছে কি করে? লীলার পুষ্টি হচ্ছে কি করে? সেখানে ভগবান পরম করুণ, অর্থাৎ করুণাময়। তবু, কতকালের কত ত্যাগ, তপস্যা, প্রেমের মধ্যে দিয়ে তারা সেখানে আশ্রয় পেয়েছেন তো। এই ত্যাগ-তপস্যার অধিকাধিক সামর্থ তো আছেই। তারা অনন্তকাল

আনন্দ করছেন ভগবানের সঙ্গে-কোথাও নারায়ণ রূপ কোথা কৃষ্ণ, কোথাও শিব-কালী-দুর্গা। যে যে রূপ ভালোবাসে, স্বাভিষ্ট রূপে ভগবানের সঙ্গে লীলা আস্বাদন করছেন।

অনন্তকাল ঐ লীলা হচ্ছে, তারই মধ্যে একজন হয়ে একটা কিছু হয়ে সেই লীলা আস্বাদন করবেন। মানে, লীলায় তাঁর যোগ্য ভূমিকা তিনি অনুভব করছেন, সেই মত আস্বাদন করছেন।

★ বিচ্যুত হতে পারে তো?

★★ 'বিচ্যুত! এসব গল্পে শোনা যায়। যারা আনন্দ করছেন, উত্তরোত্তর সেই আনন্দের গুঢ়তা প্রাপ্ত হয়।

★ গুরুসঙ্গেরও তো লাভ আছে?

★★ গুরুসঙ্গ! ঐখানে বসে গুরু সঙ্গ কর, তপস্যা কর। আর যখন খুব ইচ্ছে হবে, আবার আসবি। গুরুসঙ্গেরও তো যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নাহলে তো সংশয় এসে যাবে। সেটা তো আরও খারাপ। ঐখানে একা আছিস, সাধন-ভজন করছিস, খুব ভালো। সমসময় গঙ্গা দর্শন করছিস। হো-হো করে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে।

তারাপীঠ শ্মশান

আনন্দময়ী মা বারবার বলেছেন, ভগবানের কাছে মন-মুখ এক করে চাও পাবে। এই মন-মুখ এক করে চাওয়া মানে কি?

★★ 'মানে, কায়-মন-বাক্যের অবিনা ভাব, আর্জব।

★ তাহলে যে কোন ভাবের পরিপূর্ণতার জন্য মন-মুখ এক করতে হবে? আনন্দময়ী মা বলছেন-যখন হাসবে তখন মন-মুখ এক করে হাসবে। আবার বলছেন তোরা হাসতেও জানিস না।

★★ (হাসিটা খণ্ডিত হয়। যথার্থ হাসির আগে পরে তরঙ্গ থাকে। তরঙ্গের একটা ব্যাপ্তি আছে, সেটা স্পর্শ করে। কান্না হোক, কান্নার মধ্যে এত গভীরতা থাকে যে সুখ হয়। কান্না মানে দুঃখ, ব্যথা। সুখ, দুঃখ একই তরঙ্গের দুটো বিভাব। কেন্দ্রায়িত বিন্যাসে তা প্রশান্তি আনে। শিবজী শ্মশানে বসে আছেন শ্মশান-ভস্ম গায়ে মেখে, হাড়মালা পরে, কিন্তু তিনি তরঙ্গিত হচ্ছেন, তাই গভীর প্রশান্তিতে টলমল করছেন। আমাদের সুখ দুঃখ সব খণ্ডিত, যার জন্য অস্থির হয়ে যাই। আর যেখানে গভীর ভাবে তরঙ্গ স্পর্শ করতে পারছি, সেখানেই আনন্দের পরিপূর্ণ বিস্তার। এই বিস্তারেই প্রশান্তি। তাই শিবজী এত প্রশান্ত। তাই তাণ্ডবেও নৃত্যের প্রকাশ।)

কোন এক সময় আমি তারাপীঠ মহাশ্মশানে এত মানুষের এত ব্যথা, এটার উপর মনন করতাম। কতকাল ধরে কত মানুষ গভীর ব্যথায় এখানে এসেছে, তাদের চোখের জল। ভয়ানক দুঃখে মনটা গুমরে ভারি হয়ে থাকত, থমথম করত। লোকের সঙ্গে কথা কইতে পারতাম না। যেন ডুকরে কাঁদতে পারলে ভালো হত। দিন-রাত সবসময়ই এই অবস্থা। চিতায় পোড়াচ্ছে বা কবরে দিচ্ছে অল্পবয়সী ছেলে মেয়েদের, তাদের আত্মীয় স্বজন সব কাঁদছে, ওই দেখছি, আর ওর ওপর ধ্যান করছি। চূড়ান্ত অবস্থা মনে হোত যেন পাগল হয়ে যাব। সে অমানুষিক সাধন আর কি।

সাধনার বিশেষ দিক একটা। এইগুলো কাব্য করে বলছি না, সত্যিকারের এসব নিজের

জীবনে অনুভব করেছি। চারিদিকে হাড়-গোড়-হাড়ি-কলসি পড়ে আছে, তার মাঝে মড়ার চাটাই আসন করে মন্ত্র জপ করছি, চিন্তা করছি। কখনো মনে হচ্ছে ঐ চিতার দেহটাই যেন আমি, জ্বলে উঠছে-কখনো মাটিতে পুঁতে দিচ্ছে, সেটাই যেন আমি। বুঝতে পারলাম একটা হেস্তনেস্ত হবে।

একদিন বসে আছি, হঠাৎ জলের তলা থেকে যেমন বুদ্‌বুদ ওঠে, তেমনি দেখলাম কি এক প্রশান্ত অবস্থা, সমস্ত মন-প্রাণ একটা গভীর ব্যাপ্তি আর প্রশান্তিতে ভরে গেল। কি প্রশান্তি। যেন জীবনে কোনদিন কোন দুঃখ আমি দেখিনি, কোন দুঃখ স্পর্শ করেনি। বিশাল শান্তি, আনন্দ, করুণা এসে গেল। সর্ব জীবে এক ব্যাপ্ত একাত্মতার বোধ এসে গেল। জন্ম-জীবন আর মৃত্যুর বিচিত্র আপাত খণ্ডিত অনুরণনগুলো এক মহা ব্যাপ্তিতে একাকার হয়ে গেল। একটা অন্তরের নির্দেশ পাই তো, বলল-এ হচ্ছে শিবের শান্তি।

তরঙ্গগুলো খণ্ডিত বলেই মানুষ অস্থির হয়ে যায়। যখন অসীমে ব্যাপ্ত হয়, তখন সেই আনন্দের জগতে চলে যায়। জীবনের সর্ব-বৈচিত্রের মুলে সেই ভগবান আছেন, তার মূলগত তরঙ্গ নিরন্তর ছড়িয়ে-ছাপিয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য এত শান্তি। শিবজী নাহলে কেন এত শান্তিতে থাকেন?

স্তর বিন্যাসের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সমগ্র সৃষ্টি তার অন্তর্নিহিত আবেগে স্রষ্টার কাছে ফিরে যেতে চাইছে। তাই একদিকে সমগ্র সৃষ্টিতে বৈচিত্রের অন্তরালে এত সংঘাত-অশান্তি। অপরদিকে উজান স্রোতে শিবজীর মহাজ্ঞানের নির্বান-শান্তি-সুখের অমিয় তরঙ্গ নিরন্তরই ছড়িয়ে পড়ছে—ভাগ্যবানেরা তা আস্বাদন করে।

আর একটা বলি। অনেককাল আগের ৬৫-৭০ সালের তারাপীঠ শ্মশানের কথা বলছি। সেইসময় থাকার জায়গা বলতে রামকানাই ধর্মশালা। দুপুরে লোক এসে পড়লে মাছ কিনে রান্না হোত, আর উনুনের ধোঁয়ায় যাই যাই অবস্থা। এখন যেখানে লজ-কলোনি হয়েছে, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ইত্যাদি-মানে সাঁকোর ঐদিকটা একেবারে ঘন জঙ্গল ছিল। শ্মশানটা রাস্তার ওপার থেকে এপার পর্যন্ত ছিল। আর শ্মশানটা এত গভীর ছিল যে, দিনের বেলাতেও মানুষ ঢুকতে ভয় পেত। ইলেকট্রিক লাইট তো ছিলই না।

শ্মশানে মধ্যিখানে একটা জায়গা ছিল পাকুড়, বেলগাছের জটলা। তার তলায় একটা বেদী মত ছিল। সেই জায়গাটা এখন বোধ হয় নেই। কেননা, পরে ঐখানে আবার সাপের মূর্তি বসিয়েছিল কেউ, পরে অন্য কেউ আর এক জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। যে যার ইচ্ছে মত নিয়ে যাচ্ছে। জায়গাটিই মনে হয় হারিয়ে গেছে। মধ্যিখানে একটা জায়গা ছিল, সেটাকে বলত শিবাস্থান। বামদেব শিবাভোগ দিতেন আর নিজেও বসে থাকতেন অনেক সময়। একদম নির্জন জায়গা। আর আগেই বলেছি, এত লোকজন কিছুই নেই ঘোর জঙ্গলের মধ্যে দু-একজন লোক মা-এর পাদপদ্মে আসে, পুজো আচ্চা দিয়ে চলে যায়। অমাবস্যা ইত্যাদিতে কিছু লোকজন আসত। আর আমার দশা-তখন তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতাম। যে তীর্থে আসন ভালো জমত, সেখানে যে কোন ভাবেই হোক থেকে যেতাম। তখন তারাপীঠে ছিলাম। জ্ঞানভাই বলে একজন দুপুরে প্রসাদ দিত বলেছিল-কতদিন থাকবে? প্রথমে একটানা থাকতে বলেনি-ক্রমে সাত দিন, দশ দিন, একমাস, দুমাস দুপুরে প্রসাদ পাবে। শেষে বলল-যতদিন থাকবে এখানেই তোমার প্রসাদ বাঁধা। দোকান ঘরের মত একটা ঘর দিয়েছিল। কথা ছিল, যদি কোনদিন দোকানদার আসে তাকে ছেড়ে দিতে হবে। তা, আমি যতদিন ছিলাম দোকানদার আসেনি। আমার মৌরসীপাট্টা। খুব আসনে বসতাম। আর বশিষ্ঠআসনেও, খুব জমত। রাত্রিবেলা বশিষ্ঠের

আসনে বসতাম আর দিনের বেলা গভীর শ্মশানে এসব সাধনা করতাম। জঙ্গলের শিবাভোগের ওখানে বামদেবের আসন মত ছিল-ঐখানে বসে একসময় খুব জপ-ধ্যান করতাম। দিনের বেলাতেও লোক ঢুকত না। কিন্তু কিচ্ছু সাড়া পাইনা। আবার ভাবি-বামদেব বসতেন, শিবাভোগ দিতেন, এখান থেকে কেন কোন সাড়া পাইনা। সিদ্ধাসনে বসলে তার একটা স্রোত আছে একটু নিবিষ্ট হতে পারলে সেই স্রোতটা এসে যায়, খুব ভালো লাগে। কিন্তু এখানে কিচ্ছু বুঝতে পারি না।

একবার ঐ শ্মশানে খুব ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে, চারদিকে জলে জল, তীর্থযাত্রী নেই বললেই হয়। একটা ঝাঁকড়া মাথা পাগলের মত লোক ছিল, আপন মনে বাঁশি বাজিয়ে বেড়াত। স্বামী-স্ত্রী ওরা, লোকে বলত খ্যাপা-খেপি। দোকান-টোকানে ফাই-ফরমাশ খেটে কিছু পেত, তাতেই চলে যেত। কোনদিন ভরপেট, কোনদিন রুখা-শুখা। সুখে-দুঃখে চলে যায়। লোকটা খুব উদাসী ধরনের। শ্মশানে মশানে থাকে। নদীর ধারে একটা কুঁড়ে ঘর ছিল, সেখানে থাকত। লোকটাকে খুব ভালো লাগত। সেদিন আমি শিবাসনে বসে আছি। ভাবছি-কিছু তো সাড়া পাইনা-বামদেব এখানে শিবাভোগ দিতেন। এসব ভাবছি, দেখলাম পাশ দিয়ে আপন মনে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে খ্যাপা ঘুরে বেড়াচ্ছে—পাগল লোক যেমন করে। বললাম, কি গো খ্যাপা, তোমার বাঁশি বাজাচ্ছ না যে? শ্মশানে বাঁশিটা কিরকম লাগত—বর্ষাকালে দ্বারকার জলটা তরতর করে বইত তো। বলল, 'না গো, বাঁশিতে সুর আসছে না'। কেন গো? বলল, 'মনটা খারাপ গো। দেখছ তো বৃষ্টিতে কাজকর্ম কিছু জোটেনি, আর খেপির দুদিন ধরে জ্বর, একটু ভাত খেতে চেয়েছিল, দিতে পারলাম না'। শুনে মনটায় খুব কষ্ট হল। আপন মনে ঐরকম ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন দোকানদার বা পাণ্ডাদের কাছে কিছু চায়, সেসব কিছু না, পাগলাটে লোক, সেইরকম ভাবেই ঘুরে বেড়ায়। চুলগুলো দিয়ে জল ঝরছে, মুখটা অবাক হয়ে দেখছি। আমার পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম পাঁচটা টাকা আছে। সেদিন হয়ত কোন দরকারে নিয়ে বেরিয়েছি। পাঁচ টাকা তখন আমার কাছে পাঁচশ টাকা। থাকতে পারলাম না। বললাম, খ্যাপা, এই টাকাটা আমার কাছে ছিল গা নিয়ে যাও, ভাত রাঁধো। পাঁচ টাকায় কিছু চাল হয়ে যাবে। অনেককাল আগের কথা বলছি। বলল—'তুমি কোথায় পেলে গো'? ওর সরল ভাবে বলল 'দাও দাও'।....টাকাটা নিয়ে চলে গেল। ও যখনই চলে গেল, তখনই ঐ আসন হো-হো করে জেগে গেল। কি স্রোত। সমস্ত শরীর, মন, প্রাণ ভরিয়ে দিচ্ছে গভীর ভাবে—দ্বারকায় যেমন স্রোত, তেমনি। আর আমি এতকাল মাথা খুঁড়েছি। সঙ্গে সঙ্গে গভীর ভাবে জপ-ধ্যানে ডুবে গেলাম। অনেক সময় চলে গেল। তারপর আস্তে আস্তে সামলালাম। আর তখনই মনে হ'ল, বিরাট বিরাট মালা-ঝোলা, ত্রিশূল ইত্যাদি নিয়ে তান্ত্রিকরা টপ্পা পরে আসে, কত রকম মন্ত্র ঝাড়ে, শোল মাছ পোড়ায়, মদ ঢালে, কত কিছু করে, বুজরুকি করে শিবা ভোগ দেয়, সেসব কিছু নয়। শিবা সাধন হচ্ছে সমস্ত জীবনের প্রতি প্রেম। সমস্ত সৃষ্টির প্রতি মায়ের যে প্রেম, সেটা শিবাসাধন। এই যে একটু ভালোবেসেছি না, তখনই আসনটা জেগে উঠেছে।

সংযত জীবন

একটা কথা বলে, আগেকার দিনে ব্রহ্মচর্য আশ্রম ছিল। কথাটার মধ্যে একটা কথা আছে। এই যে ব্রহ্মচর্য আশ্রম বলছে, এ বর্ণানুক্রমিক ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ,

সন্ন্যাস। এটা ছাত্রজীবনোচিত নিষ্ঠার ব্যাপার। কিন্তু সত্যিকারের ব্রহ্মচর্য হচ্ছে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য। সেখানে পঠন-পাঠন, শাস্ত্র অধ্যায়নে যতটা, তার চেয়ে বেশি সংযম ও তপস্যায় জোর দেওয়া হোত। এই নৈষ্ঠিক ব্রত বা গোটা জীবন-নিষ্ঠ ব্রহ্মচর্য ব্রত সাধক সমাজে চিরকালই আছে চিরকালই থাকবে।

বর্ণানুক্রমিক ব্রহ্মচর্যের সঙ্গে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যের ফারাক আছে। বর্ণানুক্রমিক ব্রহ্মচর্যের পর গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করে। কিন্তু নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য যে আন্তরিক অনুসরণ করেছে, তার পক্ষে আর কোনদিন গার্হস্থ্য আশ্রমে যাওয়া খুবই বিরল ব্যাপার। তাদের শরীরটাই আলাদা হয়ে যায়। সুতরাং বর্ণানুক্রমিক ব্রহ্মচর্য আর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য যে অনেক জায়গায় এক করে ফেলে, তা ঠিক নয়।

যেখানে ব্রহ্মচর্য আশ্রমের পর গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করবে, সেখানে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যের সম্পর্ক খুবই কম।

ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হলে তা আমাদের ধ্যান-ধারণার সামর্থ বা পরমার্থ প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। যে এলোমেলো জীবনযাপন করছে, তার ধ্যান-ধারণা শেষ হয়ে যায়, হাতে-নাতে সে বুঝতে পারবে। সংযত জীবন না হলে এইগুলো ভালোই লাগবে না। —ধুর, কাঁহাতক বিড়বিড় করব। একটা গভীর অধ্যাত্ম বই পড়তে গেলেও পারবে না। তার থেকে অন্য বই বা খবরের কাগজ পড়ি। সংযত জীবনের মধ্যে যখন ছিল তখন পারত, কিন্তু অসংযত জীবনের মধ্যে গিয়ে আর পারবে না। আসল জায়গা এটা। এটা হলেই শক্তিমান হবে, বুদ্ধিমান হবে, এসব কিছু না। বুদ্ধি তো বংশগত ব্যাপার। এসব বললে হবে না। আমেরিকা তো ভোগের কাঁথায় বসে আছে, তাদের স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের ইন্টারভিউ নিয়েছিল, তাদের শতকরা ৮০ ভাগেরই বিয়ের আগে বিবাহিত জীবনের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে কোথায় এগিয়ে গেছে, ভারতবর্ষ চিন্তা করতে পারবে না। তাদের গড় আয়ু ৮০ থেকে ১০০ বছর।

একদম ঠিক ঠিক কথা বলতে হবে, যেখানে মানুষ নড়তে পারবে না। হাতে-নাতে কর, নিজে কর, বোঝ। সংযম আর তপস্যা কতখানি সম্পর্কিত।

অভাববোধ

আনন্দময়ী মা বলছেন—'সর্বদা ভগবানের অভাববোধই তপস্যা'। বাঃ, কি সুন্দর কথা। তাহলে, যার অভাব বোধ অখণ্ড, তার তপস্যাও নিরবচ্ছিন্ন। এমনিতে সবাই সত্ত্বগুণ, সত্ত্বগুণ বলি, কিন্তু কারো সত্যি যদি সত্ত্বাগুণাধিক্য হয়, তাহলে তার সর্বদাই ভগবানের অভাব বোধ জেগে ওঠে। এর থেকে কখনো চ্যুতি হবে না। জাগরণ, ঘুম, সর্বাবস্থায়। খুব সস্তার মনে হয় তো এইগুলো? যথার্থ সত্ত্বাধিক্য কোন সত্তায় এলে স্বাভাবিক বৃত্তিতেই সে ঈশ্বরমনস্ক হয়ে ওঠে। সত্ত্বার পরিণতি। বাকি বেশিরভাগ মানুষ রজো, তম—বিভিন্ন স্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো হয়ত অল্প সময়ের জন্য সাত্ত্বিক ভাবে জেগে ওঠে। যার জন্য সে জপ-তপ করে একদিন ব্যাপ্ত হবে এই আশায়। মানুষের সৎভাবনা, সৎকাজ, সাধনা, সমস্তই সত্ত্বগুণ বাড়াবার জন্য।

জ্ঞানদাস

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বৈষ্ণবীয় পদ বা গান, তাঁকে গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে'। আলাদা ভাবে নাম বলা সম্ভব নয়, কিন্তু একজনের নাম তিনি বলে গেছেন-তিনি জ্ঞানদাস। রবীন্দ্রনাথের অবদানের অসামান্য দিক রবীন্দ্র সংগীত বহু সাধক বহু ভাবে বহুবার পেয়েছেন। তার মধ্যে একটি

'এই তো তোমার আলোক ধেনু সূর্য তারা দলে দলে-
কোথায় বসে বাজাও বেণু, চরাও মহাগগনতলে।।'

এই অসামান্য কবিতা বা গান সকলেই পড়েছে বা শুনেছে। আমিও এই কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেছি। পরে দেখলাম ষোড়শ শতাব্দির কবি জ্ঞানদাস একটা কবিতা লিখেছেন, সেই কবিতাটা রবীন্দ্রনাথও মুগ্ধ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কবিতাটার নাম- 'মুরলী শিক্ষা'। বাঁশিকে বলছেন-এই বৃন্দাবনে এত ফুল-ফল একসঙ্গে ফুটে উঠছে, সমস্ত ঋতুর এককালে সমপ্রকাশ, কোকিল অবিশ্রাম পঞ্চম সুরে গায়, নদী-ঝরনা উজ্জ্বল প্রভায় বইছে।

তুমি কি সুর বাজিয়েছ? তুমি যে বোল তুলেছ, তা আমাকে বলতে পারবে? বাঁশি হেসে বলছে, আমার বোল আমি গোপনে তোমায় বলি-' রাধে মোর, রাধে মোর'। এই সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আমি নিজেকে আস্বাদন করছি। সব কিছুর মধ্যেই আমি। শিশু যেমন আরশিতে নিজের মুখ দেখে আনন্দ আস্বাদন করে, আমিও সেই রকম বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে আস্বাদন করছি। তাই জ্ঞানদাস বলছেন, 'রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী'।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে স্বর্গের বার্তা আনিতেছে। যে বধির ক্রমশ তাহার বধিরতা দূর হইতেছে। জ্ঞানদাস হাসিয়া বুঝাইলেন, সে কেবল বলিতেছেন 'রাধে তুমি আমার'-আর কিছু নাই। আমরা শুনিতেছি, সেই অসীম সৌন্দর্য্য অব্যক্ত-কণ্ঠে আমাদেরই নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। জ্ঞানদাসের গান ভালো করিয়া বুঝিতে গিয়া এত কথা মনে পড়িল।"

স্বকীয়তার দিক দিয়ে আর একটি পদে দেখি তিনি সাধনতত্ত্ব যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন-

"ওহে নাবিক, কে জানে তোমার মহিমা
নাম নৌকায় নিরবধি পার কর ভবনদী,
তব আগে কি ছার যমুনা।"

আজ এত বছর পরে তাঁর মূল্যায়ন হচ্ছে। চৈতন্যদেবকে অন্তরঙ্গজনেরা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদ শুনিয়েছেন। আর যেহেতু তিনি আস্বাদন করেছেন, সেইজন্য সেটাই সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে। আর একটি কারণ হল, জাহ্নবা দেবীর তিরোভাবের পর গৌড়ীয় ভাবান্দোলন অনেক স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল।

জ্ঞানদাস ছিলেন আমাদের বাংলার, বীরভূমের আকুমার ব্রহ্মচারী একজন মহাসাধক। তিনি সাধনার বিচিত্র মার্গের অধিকারী ছিলেন—তাত্ত্বিক ভাবনার ক্ষেত্রে, উপলব্ধির ক্ষেত্রে অধিকারী মহাজন ছিলেন। অর্থাৎ সিদ্ধজীবনের সাথে শাস্ত্র জ্ঞানও প্রচণ্ড ছিল। নিত্যানন্দের সঙ্গ করেন দীর্ঘকাল। নিত্যানন্দ বলেন, তুমি আমার স্নেহচ্ছায়ায় আছ কিন্তু তোমার

আশ্রয় হচ্ছেন জাহ্নবা দেবী। নিত্যানন্দের প্রেরণায় জাহ্নবা দেবী তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে উদ্ধার করেন।

এরপর-নিত্যানন্দ প্রভু দেহ রাখার পর জাহ্নবা দেবী যখন নবদ্বীপে এবং বাংলার অন্যান্য বড় বড় বৈষ্ণব তীর্থে গেলেন এবং সেইসব তীর্থে বৈষ্ণব আচার এবং সাধন সংক্রান্ত শিক্ষা দিলেন, তাদের সঙ্গে সাধ্য-সাধনা ক্রম পর্যালোচনা করতেন, সমস্ত জায়গাতেই বিশেষ করে যখন নবদ্বীপ পরিক্রমা করেন, তখন সঙ্গে জ্ঞানদাসকে রাখতেন। জ্ঞানদাস জাহ্নবা দেবীর সহকারী হিসাবে অভিন্ন বাংলার বৈষ্ণব তীর্থ সব দর্শন করেন, জাহ্নবা দেবী এইসব তীর্থের পুনঃ সংস্কার করেন। কারণ তিনি জানতেন, গৌড়ীয় নিত্যানন্দ আন্দোলনে আমরাই শেষ প্রতিনিধি।

শ্রীবৃন্দাবনে গোপীনাথ মন্দিরের গর্ভগৃহে জাহ্নবা দেবী যখন ছুটে চলে গেলেন, তখন জ্ঞানদাস গিয়েছিলেন ধরতে। জ্ঞানদাস জানতেন, আর পাওয়া যাবে না। তাঁর শরীর মিশে যাবে রাধারানীর মধ্যে। শেষ পর্যন্ত জ্ঞানদাস ছুটে গিয়েছিলেন ধরতে—আমাকে তো তিনি সন্তান বলে অঙ্গীকার করেছেন, আমি ধরতে পারি, আমি বাধা দেব। কিন্তু দরজায় ধাক্কা খেয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন, বললেন—আমি রাখতে পারলাম না, জানতাম আর থাকবেন না। আর জানতাম তাঁর স্বরূপ।—এই হচ্ছেন জ্ঞানদাস। শুনেছিলেন—রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী।

দিব্যচিহ্ন

যথার্থ সাধন করলে একটা ভাব হয়, ক্রমে সেই ভাবোচিত চিহ্নগুলো ফুঠে ওঠে। সেইগুলো সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না, কিন্তু যার দেখার চোখ আছে, সে দেখতে পারে। মনে করুন নরেনের পায়ের তলায় ধ্বজা, শঙ্খ, পদ্ম চিহ্ন কোন দৈবজ্ঞ দেখেছিল, তা বলে কি সকলেই দেখতে পাবে? তা নয়। তার সেই দেখার দৃষ্টি ছিল, সাধন ছিল, তাই দেখতে পেয়েছে। শুদ্ধ শরীরে সব দিব্য চিহ্নগুলো, ভাবানুগত চিহ্নগুলো ফুটতে পারে। তান্ত্রিক, শাক্ত, শৈব, প্রত্যেকেই এক একটা ভাব নিয়ে সাধনা করছে ভাবাতীতে পৌঁছবার জন্য। সাধকের উন্নত অবস্থায় সেই সাধন-জাত ভাবানুগত চিহ্নগুলো সূক্ষ্ম ভাবে জ্বলজ্বল করে। একবার যদি ফুটে ওঠে তাহলে সেই চিহ্ন-গুলো জন্ম-জন্মান্তর ধরে থাকে। কারণ চিহ্নগুলো সূক্ষ্ম ভাব-শরীরের চিহ্ন। মহাজনেরা ভাবাতীত ভূমি থেকে ফিরে এসে ভাব ভূমিতেই তো অবস্থান করেন জগত কল্যাণের জন্য, কাজেই ভাবানুগত দিব্য পরিচয় তার সঙ্গের সাথী, অঙ্গের ভূষণ হয়ে যায়।

সাধনার সঙ্গে সম্পর্কিত এই দিব্য চিহ্নের প্রসঙ্গ খুবই প্রাচীন। আমাদের মুণ্ডক উপনিষদে আছে—'তপসো বাপ্যালিঙ্গাৎ'। তপস্যার সঙ্গে এই দিব্য-চিহ্নগুলোর গভীর সম্পর্ক আছে। আজকের মানুষ হয়ত অতটা মানতে চায় না, কিন্তু এই সমস্ত দিব্য চিহ্নগুলোর কথা তপস্যার বিভিন্ন ভাবধারা-নিষ্ঠ হয়ে প্রাচীনকাল থেকেই আছে। স্মৃতিতে যেখানে আছে—'ন লিঙ্গং ধর্মকারনম্' সেখানে অন্তঃসারশূন্য জীবনে শুধুমাত্র বাহ্যিক চিহ্ন ধারনের কথাই বলা হয়েছে।

গুরু-ইষ্ট

একই অখণ্ড চেতনার একটা প্রান্ত হচ্ছে গুরু, একটা ইষ্ট। প্রাথমিক ভাবে তার উপস্থিতি, ভাবনা গুরু-বোধের মধ্যে সীমিত থাকে। এবারে সে গুরু নির্দেশিত একটা জিনিস ধরে নিচ্ছে-ইষ্ট ভাবনা। ক্রমশ গুরু নির্দেশিত পন্থায় সাধন-ভজন করলে সাধন-ভজন যত পরিণত হয় তার অলখ ইষ্ট ভাবনা তার অনুভবের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে আসে এবং চরমে জানতে পারে গুরু এবং ইষ্ট মূলগত একই সত্তা। যে সাধনার মধ্যে দিয়ে সে অগ্রসর হচ্ছে, যে অনুভব তার মধ্যে পরিণত হচ্ছে, সেটাই ইষ্ট-চেতনা। আবার ইষ্ট-চেতনার পরিপূর্ণতায় সে তার শ্রীগুরুদেবকেই নতুন করে ফিরে পায়।

গুরু-শিষ্য

ঠাকুর বলেছেন—'পাঁজিতে লেখা আছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি নেংড়ালে এক ফোঁটাও পড়ে না'। তেমনি আমরা সমস্ত ধর্মশাস্ত্র মুখস্ত করে বিরাট পাণ্ডিত্য হয়ত অর্জন করব, মুখে খুব বক্তৃতার বুলি ছুটবে, কিন্তু কথা ঐ—এক ফোঁটা জলও পড়েনা। গুরুতত্ত্বের প্রশ্ন এখানে নেই, গুরু তত্ত্বের প্রশ্ন কোথায়? ঠাকুর একেবারে তাঁর নিজের মত করে বলেছেন—'একজন আগুন জ্বালে, দশজন পোহায়।' এর চেয়ে সুন্দর বিশ্লেষণ বোধ হয় খুব কমই আছে। জটিল করে কিছু বলেননি। চিরন্তন ভাবে জগতের সামনে গুরুর আসনে যারা আছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে একই প্রশ্ন—কোন পাণ্ডিত্য নয়, কোন বক্তৃতার ফুলঝুরি নয়, কোন বিশাল আশ্রমের মহন্ত-জনিত পদমর্যাদাও নয়, একমাত্র যাতে পাঁচজন এই শীত-পীড়িত জগতে কিছুটা তাপ নিয়ে উপকৃত হবে, সেই অনির্বাণ দিব্যাগ্নি কি জ্বলে উঠেছে? অপরদিকে আমরা, যারা শিষ্য বলে পরিচয় দিই, তাদের মধ্যেও সেই প্রশ্ন-আমরা কি পবিত্রতার সংকল্প নিয়েছি জীবনে? পরমার্থের অভীপ্সা কি আমাদের মধ্যে জেগে উঠেছে? এই জোড়া প্রশ্ন যেমন গুরুর প্রতি, তেমনি শিষ্যেরও প্রতি-উভয়কেই সচেতন থাকতে হবে। নাহলে এটা নেহাৎ একটা সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপার হয়ে গেল। নয় কি?

আর একটা কথা আছে। আমরা গুরুস্তবে পড়ি—গুরু আমাদের অজ্ঞান তিমির বিদূরণ করেন। এই অজ্ঞান তিমির বিদূরণকারী বা জ্ঞানদাতা গুরু, সবই আমাদের মুখস্ত আছে। কিন্তু তার মধ্যে গুরুর একটা বিশেষ পরিচয় আছে, সেই পরিচয়ের মধ্যেই গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক জেগে ওঠে, জেগে থাকে, ফলপ্রসূ হয়। সেই সম্পর্ক হচ্ছে-গুরু কর্মদাতা। কি কর্ম দেন? গুরু শিষ্যকে সেই কর্ম দিচ্ছেন, সেখানে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক জেগে উঠছে। সেই কর্ম হচ্ছে পরমার্থের কর্ম। পারমার্থিক কর্ম। গুরু কি আমাদের নিরন্তর সেই অধ্যাত্ম-কর্মের জাগ্রত প্রেরণা দিচ্ছেন আর আমরাও কি সেই তপস্যার পথে চলছি? এটা পারস্পরিক সম্পর্ক। সেই কর্ম বা কর্মের অধিকার তিনি দেন গুরুর দিক থেকে। শিষ্যের দিক থেকে জীবন-জোড়া এই পরমার্থের কর্ম-শপথ গ্রহণ করে, পরমার্থের পথে হাঁটতে শুরু করা। হাঁটি হাঁটি পা পা করে আমরা হাঁটব। এই হাঁটার প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্যে পারস্পরিক এই সম্পর্কের সফলতা জেগে উঠবে। তাই গুরু হচ্ছেন কর্মদাতা! এই কর্মে তিনি আমাদের নিরন্তর প্রেরণা দিচ্ছেন, সেই কর্মের পথে আমাদের পরিচালিত করেন। এটা আমাদের সকলকেই মনে রাখতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন-একটাই মূর্তি-যখন

পাথর দেখ বিগ্রহ দেখা না, আর যখন বিগ্রহ দেখ পাথরের প্রশ্ন আসে না। এই যে আমাদের জীবনে পাথরে দেখা থেকে বিগ্রহ দেখা, এই পদ্ধতি, এই পরিণতি আমাদের নিত্যদিনের জীবনে আমরা যেন বহমান রাখতে পারি, এই দৃষ্টির যে পরিবর্তন, তা যেন বহমান রাখতে পারি, আমাদের জীবন যেন সব কিছুর মধ্যেই একদিন সেই শ্রীভগবানকেই দেখতে শেখে। এখানেই গুরু কর্মদাতা। এই চলার প্রান্তেই তিনি জ্ঞানস্বরূপ।

এই সম্পর্ককে যদি আমরা জাগিয়ে তুলতে, সফল করতে পারি, তাহলে আমরা দেখব গুরু-শিষ্য দুটো আলাদা জিনিস নয়, একই সত্তার দুটো প্রান্ত-যার এক দিকে গুরু, আর একদিকে শিষ্য, অভেদ সম্পর্ক। এই অভেদ সম্পর্কে আমরা জড়িত হয়ে আছি, এ কোনদিন খণ্ডিত হয় না, অবিচ্ছেদ্য। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কি জ্বালায় জ্বলে পাহাড়ে, বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছেন? আর ভাবতে অবাক লাগে, সুদূর মানস সরোবর থেকে পরমহংসজী ছুটে এলেন কিসের টানে, কিসের বন্ধনে? হাজার বার এই জিনিস দেখেছি। পাঞ্জাব থেকে তোতাপুরী ছুটে এলেন গঙ্গার ধারে একেবারে অপরিচিত একটা স্থানে, একটা গ্রামে, কাশী-গয়া-বৃন্দাবন নয়, কলকাতার কাছে একটা ছোট্ট গ্রাম-দক্ষিণেশ্বরে। বললেন-তুমি কি বেদান্তের সাধন নেবে? কোন সেই বন্ধন, কোন সেই আর্কষণ, যা তাঁকে টেনে নিয়ে এসেছে? এ চির অচ্ছেদ অবিনা সম্বন্ধ।

এটা যেন আমরা সবসময় মনে রাখি যে, আমাদের অন্তরে আমরা সেই শ্রীগুরুকে যতই জাগ্রত করতে পারব, ততই শিষ্য হিসাবে তৈরী হতে পারব। অপর দিক দিয়ে বলা যায়-আমাদের গভীরে আমরা যতই সনাতন শিষ্য হিসাবে উপযুক্ত হতে পারব, ততই জেগে উঠবেন শ্রীগুরুদেব স্ব-মহিমায়। সেই সম্পর্ককে যতই যত্ন নিয়ে অন্তরে জাগিয়ে তুলতে পারব, ততই অভেদ সম্পর্কে সম্পর্কিত হতে পারব। এটাই আমাদের জীবনের অনন্ত সফলতা। এই সম্পর্ক কোনদিন ছিন্ন হবার নয়। এই সম্পর্ককে যেন আমরা সফল করতে পারি আমাদের সমস্ত সামর্থ দিয়ে।

সততা

দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গা, বাবুঘাটেও গঙ্গা—তবু দুটো এক করা যায় না। কেউ যদি করতে চায়, সে নিতান্ত অবুঝ উদ্‌ভ্রান্ত বই কি।

জীবনের অনেক সততার মধ্যে ভাবের বা ভাবনার সততা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হরিনাম যতই ভুবন-মঙ্গলের হোক না কেন-কেউ তো বিয়েবাড়িতে সর্বন্ধনমুক্তি মন্ত্র হরিনাম করে না। অপরপক্ষে, অনঙ্গ রসের গান যতই শ্রবণ-সুখকর হোক চলে না সেটা শ্রাদ্ধ বাড়িতে।

ধর্মস্থানে, ধর্মপ্রসঙ্গে, তীর্থযাত্রায়, সাধুসঙ্গে যারা অন্য ভাবনার আশ্রয় নিতে চায়, তারা যতই ধূর্ত বা চতুর হোক না কেন, সেই অবৈধ আয়োজনের পথ আপাত-প্রলোভন-সুখকর হলেও, পরিণামে অনিবার্য দুঃখ এবং হতাশার ফলই ভোগ করতে হয়। শুদ্ধতার, শুচিতার এই দায় সম্পর্কে কেউ যদি সাবধান সতর্ক না থাকে, তার জন্য অবধারিত আগামী দুঃখের কথা ভেবে আমাদের ব্যাহত প্রশান্তি আয়ত আনন্দের বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

গিয়েছিলাম প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের পদপ্রান্তে। অঙ্গনে প্রকাশিত হোল দুটি মঞ্চ। একটিতে বিশ্বরুচি তার সর্বশুদ্ধকারি লেলিহান শিখা বিস্তার করেছে, অপরটিতে দেখলাম দেবী তুলসী, তার পত্র-পুষ্পের মঙ্গল-সমারোহ।

আমার ভাবনার অনুরণন নীরব ভাষায় সমর্থন পেল। মনে করিয়ে দিল,—শুচিতার সঙ্গে আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির নিবিড় সম্পর্কের কথা।

আড়বার

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা একাধিক ভবিষ্যৎবাণী দেখতে পাই যে, কলিযুগে বহু নারায়ণ-পরায়ণ মহাপুরুষ দ্রাবিড় দেশে মহাপুণ্যা কাবেরী, তাম্রপর্ণী, ইত্যাদি নদীর কূলে জন্মগ্রহণ করবে। ১১.৫.৩৮৩৯।

শ্রীমদ্ভাবতে ১১.৩.৩২ অধ্যায়ে ভগবদ্‌ভক্তের প্রেমোন্মাদ অবস্থার কথা বর্ণনায় পাই-তাহারা অচ্যুতচিন্তায় কখনো রোদন করেন, কখনো হাসেন , আনন্দ করেন, কখনো অলৌকিক কথা বলেন, কখনো নৃত্য, কখনো গান, কখনো কৃষ্ণানুশীলন করেন, কখনও বা পরম বস্তুর লাভে নিবৃত্ত। মৌন থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের সেই ঐকান্তিক আশ্বাস বিফল হবার নয়। তাই দেখি খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শতাব্দি পর্য্যন্ত প্রায় দ্বাদশজন সর্বলোকপাবন মহাপুরুষ অবতীর্ণ হয়ে ভক্তি-প্রেমের এক মহতী বন্যা বহমান করেছেন, যার প্রাণদায়ী প্রভাব আজ পর্যন্ত কোন না কোন ভাবে আমাদের সঞ্জীবিত করে।

স্বতস্ফূর্ত এই ভাবান্দোলনের নাম আড়বার পরম্পরা। কেননা জীবের স্বরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপ মোক্ষের উপায় ও স্বরূপ সম্পর্কে এনাদের ভাবনা চিন্তায় একটা ঐক্যবোধ দ্যাখা যায়। আড়বার তামিল শব্দ। আড়-নিমজ্জিত, বার অর্থে যিনি থাকেন। আড়বার কথার প্রচলিত গভীর অর্থ-যিনি ভগবত প্রেমে নিমজ্জিত হয়েছেন। সুতরাং এই সমস্ত দিব্যোন্মাদ মহাসাধকদের নিবিড় অনুভূতিময় জীবনকথা জানতে আমাদের শ্রদ্ধা হওয়া স্বাভাবিক। জাতরতি দ্বাদশ স্বয়ংসিদ্ধ মহাপুরুষের জীবন একান্তই লোকাতীত, অমানুষিক ও অলৌকিক ছিল। ভগবত গুণগানে, বিরহের হাহাকারে ও প্রাপ্তির অনির্বাণ শিখায় তাঁদের জীবন উজ্জ্বল। তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত অজস্র দিব্যগীতির, যা 'দ্রাবিড় বেদ' নামে পরিচিত-উৎপত্তির মূল হল ভগবৎপ্রসাদলব্ধ দিব্যজ্ঞান এবং দিব্য আনন্দ অভিব্যাক্তির সামর্থ।

১) সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য সম্ভার এইসমস্ত জাতরতি মহাভক্তদের হৃদয়ে শ্রীভগবানের মধুরিমার কথাই জাগিয়ে তোলে। প্রেমবিহ্বল আড়বার গাইছেন-"বিস্তৃত আকাশ ব্যাপ্ত করে মেঘসমুহ তুরী-বাদ্যের আনন্দ-কোলাহল তুলেছে। অনন্ত অগাধ সমুদ্র, চঞ্চল তরঙ্গরূপ হাত তুলে নৃত্যপরায়ণ। সপ্তলোকের অধিপতি প্রভুকে যারা ভালোবাসে, তাদের আনন্দ আর ধরে না।"

আবার মঙ্গল গীতিতে শুনতে পাই—"তিনি আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল এবং ভোজনের পরে পরম উপভোগ্য তাম্বুল।"। অবশেষে আর কোন উপমা খুঁজে না পেয়ে বলছেন-"তিনি আমার অতৃপ্তামৃতং। এমন অমৃত যা পান করলে নিরন্তর পানের স্পৃহা বলবতী হয়"।

২) বিরহের তীব্র অর্ন্তজ্বালায় পরমার্ত মহাজন বলেছেন—'তিনি আমার তপ্তৈতলা-কটাহবৎ'। তপ্তৈতলপূর্ণপাত্রে পতিত জীবের যা দশা।

শ্রীমৎ যতীন্দ্র রামানুযাচার্য লিখেছেন—সমুদ্রের বিক্ষোভ, একাকীত্ব ভাবনা, দীর্ঘায়িত আঁধার রাত্রি, রাত্রিতে পক্ষীর কূজন, বর্ষাধারার উন্মত্ততা-এসবই যেন পতি বিরহিনীর বিরহকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। দেহবোধের উর্দ্ধে উঠিয়া ব্রহ্মানুভবের আশায় জীবাত্মা যেন আকুলি-বিকুলি করিয়া মরিতেছে। পরমাত্মানুসন্ধানের পথে যেন জীবের অভিসার যাত্রা।

আবার দেখি মিলনের মাধুর্যে আড়বার গভীর ভাবে উচ্ছসিত। "আবার হৃদয়ে প্রবেশকরতঃ নিজ-বিগ্রহসৌন্দর্যে আমাকে অভিভূত করিয়া তাঁহার প্রতি আমার প্রীতির প্রবাহ বহাইয়া দিয়াছেন। অন্যত্র-ভগবানের কৃপায় আমি তাঁর স্বরূপ-রূপ-গুণ এবং বিভূতির সাক্ষাৎ লাভ করেছি।"

প্রাপ্তির এই আনন্দ মহা-অধিকারী পুরুষের স্বাভাবিক প্রজ্ঞার সার্থক সম্মিলনে "আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষপুর্বক শ্রীভগবান আমাকে বিশেষ তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানী করিয়াছেন। আমাকে জ্ঞানে ও আনন্দে পরিপূর্ণ করিয়াছেন।"

অথবা-'পরমপুরুষ সর্বেশ্বর নিহেতুক কৃপায় আমার হৃদয়ে নিরন্তর অবস্থান করত আমাকে সংশয়-বিপর্যয়রহিত তত্ত্বজ্ঞানে অলঙ্কৃত করেছেন।

আমাদের শ্রদ্ধা আরো গভীর হয় যখন দেখি এইসমস্ত জ্ঞানস্বরূপপ্রাপ্ত এবং প্রেম-নিমজ্জিত ভাগবতেরাই আবার মানুষের প্রতি করুণা পরবশ হয়ে উপদেশ দিচ্ছেন-কি ভাবে শ্রীভগবানকে ডাকতে হবে—জিভে যাতে কড়া পড়ে যায় সেইভাবে তাঁকে আহ্বান করে, প্রতি অঙ্গে যাতে কড়া পড়ে যায় সেই ভাবে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে—আবার বলছেন-তোমার ভক্তিকে সমুদ্রের ন্যায় অপরিচ্ছিন্ন ক্রমবর্ধমান করে প্রভুকে নিরন্তর স্তুতি করার জন্য তোমরা মনোনিবেশ কর।

এই দ্বাদশ প্রেমনিমজ্জিত, তামিল ভাষায় 'আড়বার' মহাভাগবতদের নাম যথাক্রমে ১)সরযোগী ২) ভূতযোগী ৩) মহৎযোগী ৪) ভক্তিসার ৫) শঠকোপস্বামী ৬) মধুর কবি ৭) বিষ্ণুচিত্ত ৮) শ্রীগোদাম্বা ৯) ভক্তাংঘ্রিরেণু ১০) যোগিবাহন ১১) কুলশেখর ১২) পরকাল।

আনুমানিক খ্রীঃ দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত আবির্ভূত এই সমস্ত ভাগবতগণের শ্রীমুখোৎসারিত গাথা সংখ্যা চার হাজার। মহাজনেরা মনে করেন অসৎ-এর বিনাশ এবং সৎ-এর উদ্ধারকরণের জন্য যেমন শ্রীভগবানের আবির্ভাব, তেমনি সাধকের অন্তরের অসৎ ভাবের বিনাশ এবং সৎ এর উজ্জীবনের জন্য এই সমস্ত দিব্য-গাথাসমুহের অবতরণ বা আত্মপ্রকাশ। তাই তাঁরা পরম শ্রদ্ধায় তাঁদের সমস্ত পূজা-অর্চনা এবং বন্দনাদিতে এই সমস্ত গাথা গেয়ে থাকেন। সামগ্রিক ভাবে এই সমস্ত গাথাকে তাঁরা 'দ্রাবিড় বেদ' নামে অভিহিত করে থাকেন। দ্রাবিড় বেদের বহুতর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, টিকা-টিপ্পনি এই ভক্তি আন্দোলনকে নিয়ত সমৃদ্ধ করে চলেছে।

আড়বার ভক্তি আন্দোলনের দুটি বৈশিষ্ট হচ্ছে—

এক-আড়বার ভক্তি আন্দোলনের একটি গুরুত্বপুর্ণ দিক শ্রীভগবান স্বয়ং যেমন জগতকল্যাণে ধরাধামে আবির্ভূত হন, ওনারা তেমনি পূর্ণ বিশ্বাস করেন দেশে দেশে শ্রীভগবান তাঁদের অর্চিত বিগ্রহে কৃপা পরবশ হয়ে স্বয়ং জগতকল্যাণে প্রকাশিত প্রতিষ্ঠিত থাকেন। যে কারণে ভক্ত প্রাণধন এই সমস্ত বিগ্রহকে এনারা বলেন 'অর্চাবিগ্রহ'। দিব্যশ্রী মণ্ডিত, পূর্ণ করুণা ইক্ষণসামর্থ সম্পন্ন এই সমস্ত মহাজাগ্রত বিগ্রহ দক্ষিণে কন্যাকুমারী থেকে উত্তরে বদ্রীনারায়ণ পর্যন্ত প্রসারিত। আর যে সমস্ত দেশে এই সমস্ত জাগ্রত ভক্তি-

মুক্তি দাতা শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান, সে সমস্ত পাবন-ভূমিকে এনারা বলেন 'দিব্যদেশ'। অবশ্য মুক্তি অর্থে আড়বার ভাবনা হোল-শ্রীভগবানে আত্মসমাপনের পূর্ণতা।

দুই-শ্রীমদ্ভাগবতে দেখি, 'শ্বপচোহপি মহীপাল বিষ্ণুভক্তো দ্বিজাধিকঃ। অর্থাৎ হে মহীপাল, চণ্ডালেও যদি বিষ্ণুভক্ত হয়, তিনি দ্বিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এরই প্রতিধ্বনি পাই-শ্রীশঠকোপ আড়বারের সহস্রগীতিতে-'এই ভাগবতগণ যদি চণ্ডালের চণ্ডাল হন, তাঁরা জন্মজন্ম আমাদের প্রভু। শ্রী পরকাল আড়বার বলছেন-আমার প্রভুর চরণযুগল আশ্রয়কারী ভাগবতগণ যে কোন কুলেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁদের আমি আমার মস্তকে ধারণ করেছি'।

দিব্যদেশস্থ অর্চাবতারগণ সর্বভাবময়, সর্বাভিষ্টপ্রদ, সর্বকালিক এবং সৌলভ্য গুণময়। তবু এক এক শ্রীবিগ্রহে বিশেষ ভাব-গুণের আধিক্য অনুভব আড়বারগণ করেছেন।

প্রধান কয়েকটি দিব্যদেশস্থ অর্চাবতার-

১. শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথজী-ব্যূহ সৌন্দর্যময়।

২. বেঙ্কটাচলে শ্রীবেঙ্কটনাথ-উজ্জ্বল বিগ্রহশোভা এবং বাৎসল্য গুণময়।

৩. শ্রীনগরীস্থ শ্রীআদিনাথ-সৌলভ্যগুণ যুক্ত বিশেষ।

৪. শ্রীকুরঙ্গ নগরীর শ্রীকুরঙ্গনাথ—কল্যাণপূর্ণ পূর্ণজ্যোতি।

উজ্জ্বল-উন্নত-স্বতোৎসারিত স্তুতিগুলি অনেকসময় বিশেষ কোন শ্রীবিগ্রহ উপলক্ষিত-হে সমুদ্রবর্ণ। তোমার চরণযুগল প্রাপ্ত হয়েছি। হে রঙ্গনাথ। তুমি কালমেঘসদৃশ শ্যামল দিব্যমঙ্গল বিগ্রহ বিশিষ্ট পরমপুরুষ।

শ্রীকুরঙ্গনাথের কৃপাবন্যার কথা কখনো শোনা যায়-শ্রীকুরঙ্গপুর নামক দিব্যদেশে বিরাজমান অর্চাবতারের দর্শনলাভের পর থেকেই সেই পূর্ণজ্যোতি-তরঙ্গের মধ্যে উন্নীত হয়েছি। তাঁর চক্রধারী বিশাল স্বর্ণকান্তি শ্রীবিগ্রহ আমার অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন।

সমস্ত অর্চাবতারই এক বা একাধিক আড়বারকে অলৌকিক দিব্যদর্শন ও জ্ঞানানন্দের স্ফুরণের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অভিঘাতে ধন্য করেছেন-ভক্তেরা এই তরঙ্গ-কল্লোলের পরমাণু প্রত্যাশী।

সমস্ত আড়বারগণের মধ্যে যিনি 'প্রপন্নজনকূটস্থ'-অর্থাৎ শরণাগত মহাপুরুষদের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় বলে অভিহিত, তিনি শ্রীশঠকোপ আড়বার। শঠকোপ কথার অর্থ—যিনি ভগবতপ্রাপ্তির বিরুদ্ধ বায় প্রশমিত করে অনুকূল বায়ু প্রবাহিত করেন। তাঁর সুমহৎ জ্যোতির্ময় মহাজীবনী আলোচনার অভিপ্রায়ে আমরা তার প্রস্তুতি স্বরূপ তাঁর একান্ত শরণাগত গুরু গতপ্রাণ সেবক-শিষ্য শ্রীমধুরকবি আড়বারের জীবনী আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

শ্রীমধুরকবি সুদূর বদ্রিকাশ্রমে তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। ক্রমে তাঁর মনে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলাস্থলি দর্শনের অভিপ্রায় হওয়াতে তিনি অযোধ্যায় বাস করার কালে গভীর রাত্রে দক্ষিণ দিক উদ্ভাসিত করে এক দিব্য আলোকচ্ছটা দর্শনে অভিভূত হলেন। রাতের পর রাত চলল সেই আলোক-অভিসার। একদিন এসে পৌছলেন দক্ষিণের জাগ্রত মহাতীর্থ শ্রীরঙ্গনাথ ধামে। কিন্তু না, তবু সেই জ্যোতির আহ্বান তাঁকে ডেকে নিয়ে যায় আরো দক্ষিণে। স্তম্ভিত মধুরকবি দেখলেন শ্রীকুরুকাপুরীর এক তেঁতুল গাছের তলায় বিগ্রহবৎ সমাধিস্থ এক দিব্য কিশোর এই মহাজ্যোতির উৎস। মধুরকবি তাঁর পরিচ্ছন্ন প্রাণের সমস্ত আবেগার্তি নিয়ে সেই কিশোরের শ্রীচরণে চিরদিনের মত আত্মসমর্পিত

হলেন। কিশোরের বাহ্য চেতনার কিঞ্চিত উন্মেষ হলে তিনি আকুল অন্তরে জানতে চাইলেন-প্রভু সূক্ষ্ম জীবাত্মা যখন অচেতন দেহের মধ্যে অবস্থান করে, তখন কি উপভোগ করে, এই জীবাত্মার যথার্থ অবস্থিতি স্থলই বা কোথায়? প্রসন্ন পরাঙ্কুশ কিশোর জ্ঞানমুদ্রায় উত্তর দিলেন—এই আত্মা অচিৎবস্তু দেহেতে থেকে তাকেই উপভোগ করে এবং উপভোগজাত সুখ-দুঃখ ভোগ করে। যদি সে অচিৎবস্তু উপভোগ না করে, পরমচেতন বস্তু সর্বেশ্বরকে উপভোগ করে এবং সেই পরমচেতনে অবস্থান করে তবে সে এই দেহকারাগারজাত বন্ধন থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করে।

মধুরকবি দৃঢ়রূপে অবগত হলেন-ইনি একজন পরাভক্তি ও পরাজ্ঞানসম্পন্ন অবতীর্ণ পুরুষ এবং জগত-তারণকারী মহা করুণায় তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। ভূভারহরণকারী এই ষোড়ষবর্ষিয় কিশোরের নাম শ্রীশঠকোপস্বামী। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অন্তর্ধানের ৪১০ দিন পর তিনি আবির্ভূত হন। সমস্ত আড়বারগণের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে পূজিত হন বলে তাঁকে বলা হয় 'দ্রাবিড়াম্নায়দৈব' দ্রাবিড় বেদের দেবতা। জগত কল্যাণে তাঁর স্বতোৎসারিত দিব্য গাথা সমূহকে চারটি ভাগে চতুর্বেদের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। তার মধ্যে মহত্ব 'তিরুবায়মোড়ি নামক এক হাজার দিব্য প্রবন্ধাবলী, যাতে তাঁর গভীরতম উপলব্ধিসঞ্জাত পরত্ত্ব ও পর-প্রেমানন্দের স্রোতধারা অভিব্যক্ত হয়েছে। আড়বারগণের কাছে যা শ্রেষ্ঠ সামবেদের মর্যাদায় ভূষিত। পরবর্তীকালে একাদশ শতাব্দীতে শ্রীরামানুজ যতীআচার্য অনেকাংশে এই তিরুবায় মোড়ির ভিত্তিতে তাঁর শ্রীভাষ্য রচনা করেন।

দিনের পর দিন শ্রীগুরু শ্রীশঠকোপস্বামীর সেবা-সঙ্গ ও গাথাসমুহ শ্রবণ করে মধুর কবি, জীবনের পরিপূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করেন। কিন্তু একা এই উজ্জীবনে অভিভূত হয়ে না থেকে তিনি শ্রীশঠকোপস্বামীর অন্তর্ধানের পর সমগ্র জগত-এর কল্যাণে তাঁর মহিমান্বিত জীবন ও গাথাসমূহ মানুষের চিরশান্তি ও চির আনন্দের প্রয়োজনে সর্বত্র প্রকাশ করলেন।

শ্রীমধুরকবির গাথাসমুহ মাত্র ১১ টি, কিন্তু আড়বারদের রচিত প্রায় চার হাজার গাথা সমূহের মধ্যে ব্যাতিক্রমী এই গাথা বা গীতিতে একান্তই তাঁর শ্রীগুরু মুনীন্দ্র শ্রীশঠকোপস্বামীর স্তব-স্তুতি বা গুণগান করা হয়েছে।

কালের পথ বেয়ে এই ভাবে তিরুমঙ্গল আড়বার পর্যন্ত দ্বাদশজন আড়বারের আসা-যাওয়া চলতে থাকে। এর দীর্ঘকাল পর খ্রীঃ ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে এক মহান তপস্বী শ্রীনাথ মুনির আবির্ভাব হয়। তিনি পথচারী বৈষ্ণব গায়কদের মুখে দশটি গাথাগান শ্রবণ করে আনন্দ-পুলকিত হয়ে ওঠেন। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর তিনি অবগত হন যে, কুরু কাপুরীর দেবতা শ্রীশঠকোপস্বামীর প্রায় লুপ্ত এক হাজার দিব্য-মঙ্গল গাথা সমুহের মধ্যে উক্ত পদগুলি মাত্র জেগে আছে। পরম শ্রদ্ধায় ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তিনি শ্রীকুরুকাপুরীতে উপস্থিত হয়ে শঠকোপ মুনীন্দ্র বিগ্রহের পদতলে পতিত হলেন। মধুরকবি আড়বার রচিত কন্নিনুন শিরত্ত্বাম্বু গাথাসমুহ তাঁর আকুলতা প্রকাশের অবলম্বন হয়ে উঠল। দীর্ঘ আরাধনার পর, শোনা যায় (১২০০) বার হাজার বার 'কন্নিমুন শিরুত্ত্বাম্বু, 'জপের পর তিনি শ্রীশঠকোপ মুনীন্দ্রের অপ্রাকৃত দিব্য দর্শন লাভ করেন। তাঁর কৃপাপ্রসাদে নাথমুনী শঠকোপ মুনীন্দ্রের উদগীত সম্পূর্ণ গাথাগুলি উদ্ধার করতে সমর্থন হন।

সামগ্রিক ভাবে আড়বার গাথাসমূহ এবং বিশেষ করে শঠকোপ মুনীন্দ্রের গাথাগুলি মুমুক্ষু মাত্রেরই পরম হিতকারি আদরের বস্তু।

শ্রীনাথ মুনি ও যমুনাচার্যের পরম পথ বেয়ে ১০১৭ খ্রীঃ আবির্ভূত হন আচার্য রামানুজ। অপরিমেয় শ্রদ্ধা ও দীনতা, অসামান্য মনীষা ও অমানুষিক সাধনশক্তি বলে তিনি আড়বার পূর্বাচার্যদের বিশাল করুণা ও সাধনসম্পদের অধিকারী হন। ভগবত প্রেম ও শরণাগতির রসোজ্জ্বল পরমতত্ত্ব তিনি নতুন করে সবার সামনে তুলে ধরেন। আড়বার ভক্তি সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে শঠকোপস্বামীর 'তিরুবায়মোড়ির' ভিত্তিতে তিনি রচনা করেন তাঁর একাধিক দার্শনিক সিদ্ধান্ত গ্রন্থ এবং ব্যাস সূত্রের নবতর ভাষ্য। সমগ্র ভারতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে যা বহু খ্যাতি ও স্বীকৃতি অর্জন করে। আচার্য রামানুজের প্রভাব শুধু দক্ষিণ ভারতেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনে আনয়ন করে এক নূতনতর অধ্যাত্মতরোঙ্গাচ্ছ্বাস।

এরপর শ্রীভগবানের অশেষ করুণায় সমগ্র ভারতের অধ্যাত্মকেন্দ্র কাশীর ধর্মজীবনে আত্মপ্রকাশ করেন সর্বজনবন্দিত আচার্য রামানন্দ। জন্ম তাঁর ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে। শ্রীরাঘবানন্দের মহাশক্তিধর শিষ্য রামানন্দ অনুভব করেন, সর্বাত্মক প্রেমভক্তির ভাবধারায় ঘটেছে আদর্শ ও আচরণের মধ্যে মর্মান্তিক স্বতঃবিরোধ। শঠকোপস্বামী ছিলেন চতুর্থ বর্ণের, তিরুপ্পান স্বামী পঞ্চম বর্ণের—অর্থাৎ শূদ্র ছিলেন। কিন্তু ওঁনারা শ্রেষ্ঠ আড়বারগণের মর্য্যাদা পেয়েছেন। অথচ আজ ভক্তের সামাজিক কৌলিন্য গুরুত্ব লাভ করেছে। সর্বাত্মক বা আত্যন্তিক ভক্তিবাদ খণ্ডিত। তাই আচার্য রামানন্দ আনয়ন করলেন-সর্ব ভেদ-বিবাদহীন উদার বৈষ্ণবতা। ত্যাগ, তপস্যা, ভক্তি ও শরণাগতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই মহত্তর আধ্যাত্মিক আন্দোলন শুধু জাত-পাত নয়, এমনকি হিন্দু-মুসলমানের গণ্ডী অতিক্রম করে মহা-প্লাবনের মত সমগ্র ভারতভূমিকে সরস-উর্বর করে তুলল। তারই ফলশ্রুতিতে আমরা শুনতে পাই।

'ভক্তি দ্রাবিড় উপজি লায়ে রামানন্দ
প্রকট কিয়া কবীরনে সপ্তদ্বীপ নওখণ্ড।'

বাস্তবিক আমরা দেখতে পাই এই ভাবে বহু প্রাচীন আড়বার ভক্তি সাধনার সম্পদ আচার্য রামানন্দের মহিমায় শুধু কবীর নয়, নানক, দাদূ, রুইদাস প্রমুখ শক্তিধর আচার্যপরম্পরা সমগ্র উত্তর ভারতের ভক্তিবাদী ও মরমীয়া ধর্মপ্রবাহ সফল করে তোলে। সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে জাগ্রত করে তোলে উদার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বোধ। আমরা লক্ষ্য করি, সার্বজনীনতার সৌকর্যে এই সাধনার ধারা ক্রমশ রূপ নিষ্ঠ থেকে অরূপ নিষ্ঠার দিকে চলে যায়।

এবার আমরা পাঁচ শত বছর আগের ভগবান শ্রীচৈতন্যের কথায় আসতে পারি। তবে তাঁর গুরু পরম্পরা অবহিত হতে পারলে আমরা হয়ত কিছু আলো পাব।

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী প্রথমে দশনামী সন্ন্যাসী ছিলেন। এতে তাঁর অন্তরের স্বাভাবিক ভক্তি-সাধনার স্রোত ব্যহত হচ্ছে দেখে তিনি যান দক্ষিণ ভারতের মধ্বাচার্যের সম্প্রদায়ের উদীপি মঠে। সেখানে আচার্য লক্ষ্মীপতির নির্দেশে নিমজ্জিত হন নৈষ্ঠিক ভক্তি-সাধনার গভীরে। কিন্তু অচীরেই তিনি উপলব্ধি করেন, নওল-কিশোর নন্দ নন্দনের যে রসোজ্জ্বল মূর্তি তাঁর ধেয়ানে, তারই জোয়ার-ভাটায় মিলন-বিরহের গভীর দোলায় তাঁর জীবন উদ্বেল। উদীপি তাঁকে ধরে রাখতে পারে না।

পাশাপাশি আমরা দেখি শ্রীশঠকোপ এবং অণ্ডাল রঙ্গনায়কী অর্থাৎ দিব্য-রমণী রঙ্গানায়কী প্রমুখ শ্রেষ্ঠ আড়বার অর্থাৎ প্রেম-নিমজ্জিত মধুর রসের সাধক সাধিকাদের নিরন্তর অতি-ত্বরা, আতি, আর্তি, নিরতিশয় আকুলি-বিকুলি এবং ক্ষণে বিরহ ক্ষণে মিলনের যে দিব্যোন্মাদ দশা, তা স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের কালানুক্রমিক উত্তর কালের আচার্য শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী ও তারই পরিণত ফল শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে প্রকাশিত। চৈতন্য চরিতামৃতের 'কৃষ্ণের মাধুর্য রস আস্বাদ কারণ' মহাপ্রভু গম্ভীরালীলায় 'অলৌকিক চেষ্টা প্রভুর রাত্রি দিনের'— প্রভৃতি গর্গর মাতোয়ারা দিব্যোন্মাদ দশা আমাদের মনে করিয়ে দ্যায়।

বিরহ-মিলনের টানা-পোড়নে উজ্জ্বল, পরম রসবস্তু শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ মাধুর্য রস আস্বাদন-বিহ্বল শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীকে দক্ষিণ ভারতে সর্পাষদ পরিভ্রমণ করতে দেখি। শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার বর্ণনা করেছেন শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সঙ্গে মাধবেন্দ্র পুরীর মিলন-বিবশ দৃশ্যের কথা।

শ্রীচৈতন্যদেব, অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস, রায় রামানন্দ প্রমুখ অনেকেই শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর পরম্পরায় অভিষিক্ত ছিলেন। শুধু রাগানুগা মাধুর্য্য উপাসনায়, গোপীপ্রেম আস্বাদন বিহ্বলতায় নয়, আড়বারদের মধ্যে জাতপাতের বন্ধনমুক্ত যে উদার ধর্মবোধ তা আর কোন পূর্বাচার্য্য পরম্পরায় এমন গভীর ভাবে আস্বাদিত-আচরিত হতে দেখি না। মধ্ব সম্প্রদায়ে যা একান্তই বিরল।

আমরা জানি শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারত থেকে ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণ-কর্ণামৃত নামক দুখানি পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না, দক্ষিণ ভারতে পরিচিত ব্রহ্মসংহিতা দুটি। প্রায় চার হাজার আড়বার গাথাগুলি সংগ্রথিত ভাবে ব্রহ্মসংহিতা নামে গৃহীত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণকালে আড়বার প্রধান তীর্থ শ্রীরঙ্গমে অবস্থানের কথা আমরা চৈতন্য চরিতামৃত থেকে জানতে পারি। যেখানে শতশত বৎসর ব্যেপে শ্রীভগবানের প্রতি রাগানুগা ভাবোৎপন্ন মাধুর্য্যময়ী বিরহ-মিলেনোদ্বেল রসসাধনা চরম বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছিল। শ্রীরঙ্গনাথ ভগবানের অশেষ করুণাশাবল্যে পেয়েছিল পর সার্থকতা।

নিষ্কাম কর্ম

মানুষ নিষ্কাম কর্ম ক'রে ক্রমশঃ কর্ম-সংস্কার, কর্ম-বন্ধন ছেদন করে। একে বলা হয়েছে কর্মমল। এরপব আছে মূলগত মায়ামল। কর্ম-সংস্কার যখন ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে, তখন তার সংগ্রাম চলছে মায়ামলের বিরুদ্ধে। তখন আত্মকর্মের অধিকার হয়েছে তার, সে সাধনার গভীরে প্রবিষ্ট হয়েছে। যেহেতু আমি-অভিমান বা অহংকার ক্ষীণ হয়ে আসছে, তাই তার নিষ্কাম কর্মের অধিকার আসছে। যথার্থ অর্থে-একমাত্র আত্মকর্মই নিষ্কাম কর্ম। প্রচলিত অর্থে নিষ্কাম কর্ম নামে যা বলা হয়, তা কর্ম-সংস্কার ক্ষীণ ক'রে চিত্তশুদ্ধির জন্য, শঙ্করাচার্য তাই বলে গেছেন। চিত্ত শুদ্ধি হলেই নিষ্কাম আত্মকর্মের অধিকার-সামর্থ-প্রেরণা সে লাভ করে। নিষ্কাম কর্ম তাই, যেখানে কর্মবন্ধন ক্ষীণ এবং যা মায়ামল ছেদন করছে। বাইরে যে একটা সাধক সৎকর্ম বা সেবাকাজ করছে, সেটা তার কর্মের সংস্কার ক্ষয় করার জন্য। একজন সাধক যতক্ষণ না অন্তরঙ্গ সাধনার গভীরে প্রবিষ্ট হতে পারছে ততক্ষণ তার নিষ্কাম কর্মের অধিকার কোথায়? ঠাকুর বলেছেন- প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ।

এসব তো মানতে হবে। তন্ত্রে বা যোগের ভাষায় বলে—সাধনার মধ্যপথ খুলে গেছে। সে মধ্যপথে চলতে শুরু করেছে। এই মায়ামল ছেদন করলেই জীব শিবস্বরূপ বা আত্মজ্ঞানী হয়ে যায়। যে প্রাণশক্তি বিভিন্ন কেন্দ্রে ছড়িয়ে ছিল, সেই প্রাণশক্তি মূলগত পথে প্রাণের কেন্দ্রে এসে হাজির হয়। সাধক বুঝতে পারে, যা নিষ্কাম তাই যথার্থ অর্থে পূর্ণকাম। সার্বজনীন অর্থের পাশে বিশেষ অর্থ অনুধ্যানের প্রয়োজন।

যথার্থ নিষ্কাম কর্ম যেখানে, সেখানে কোন সাধকের পতন হতে পারে না। কিন্তু দেখা যায় বৃহত্তর অর্থে যে নিষ্কাম কর্ম করে তার মধ্যে অনেক বিচ্যুতি বা ব্যর্থতা, শেষ জীবনে হাহুতাশ আসে- কি করলাম। কারণটা হচ্ছে এই। অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক ঠিক নিষ্কাম হয় না। তবে আচার্যরা যে ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন বা পথ দেখিয়েছেন মানুষ সেটুকু অবলম্বন করুক। সেটুকু যদি আন্তরিক হয় তাহলে একদিন সে যথার্থ নিষ্কাম কর্মের অধিকারী হবে। সেখানে নিষ্কাম সাধকের অন্তরঙ্গ সাধনার ফল ইষ্টরূপী প্রাণেতে স্বাভাবিক ভাবেই সমর্পিত হয়। তৎ প্রসাদাৎ মহেশ্বর বা মহেশ্বরী। কত দুধের বাছা সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে হিমালয়ের নির্জন গহ্বরে কঠোর জীবনে তপোমগ্ন জীবন যাপন করছে। তার অন্তর্জীবন তাকে বলছে—আয়, অমোঘ সেই আসনের আহ্বান। সেটাই যথার্থ। তবে সে কোটিতে গুটিক। এইজন্য আচার্যরা সবার জন্য নিষ্কাম কর্মের সহজ ব্যবস্থা দিয়ে গিয়েছেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে, এই লোক লোচনের আড়ালে কত তাপসই তো আছে। আমাদের একটুখানি কি অনুভব হ'ল, না হ'ল, নিজেদের বড় বড় সাধক ভেবে বসে রইলাম। সেই বন সার্থক, যে বনে চন্দন কাঠ আছে। সেই কয়লাখনি সার্থক, যেখানে হীরে আছে। আমি তো উত্তরকাশীতে ছিলাম, দেখেছি কত-শত সাধু উদ্দেশ্যহীন ভাবে গালগল্প করতে করতে যাচ্ছে। তার মধ্যেও দু-চারজন আছে শান্ত মূর্তির মত। তারই জন্য, তার গুণেই চলছে এসব ছত্র। ৫০ টা ঝুপড়ি, কোন ঝুপড়িতে বাঘ আছে কেউ জানে? আমি এরকম ভাবি। কোথা থেকে 'হুম' করে কালান্তক বেরিয়ে এল কে জানে। ছত্রে ৫০ টা সাধু, এর মধ্যে কে রাজা, ভিখিরি সেজে এসেছে আমি তো জানি না। তার আলোতেই সব। এটা ভারতবর্ষ তো। পাহাড়-বন-প্রান্তরে, নদীর ধারে ধারে সব ঝুপড়ি, কোন ঝুপড়িতে আলো জ্বলেছে কে জানে! উপবাস, তপস্যা আর অনিশ্চিত জীবনে চরম নিশ্চিন্ত হয়ে যারা বসে আছে পরমের প্রত্যাশায়।

প্রাণশক্তি

সাধক জীবনের অবাঞ্ছিত দিক হচ্ছে প্রাণশক্তির নিচের দিকের প্রকাশ। বিদ্যুৎ একটা শক্তি, ফ্যানটা চলছে বা বাল্বটা জ্বলছে, সেটা বিদ্যুৎশক্তির প্রকাশ। যদি বল হাওয়া শক্তি, আলো শক্তি, ইত্যাদি কিন্তু মূলগত ভাবে বিদ্যুৎশক্তির প্রকাশ। তেমনি প্রাণশক্তির নিচের দিকের প্রকাশ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলো। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আবার কর্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় ভাগ করেছে। কর্মেন্দ্রিয় স্থূলতার দিক, জ্ঞানেন্দ্রিয় কিছুটা সূক্ষ্ম দিক।

মনটা হচ্ছে আন্তর-ইন্দ্রিয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে চালানোর শক্তি হচ্ছে মন। মনের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক কি? মনের সঙ্গে প্রাণের সাক্ষাৎ সম্পর্ক। প্রাণ, মনকে প্রভাবিত করছে।

মন প্রাণেরই শক্তিতে শক্তিমান। বড়বাবু যখন অফিসে যায়, কর্মচারীরা দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। বড়বাবুকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কর্মচারীরা যে দৌড়াদৌড়ি করছে তা দেখে বোঝা যায় বড়বাবু অফিসে আছে। তেমনি মন ইন্দ্রিয়গুলোকে প্রভাবিত করছে। আবার অন্য দিক দিয়ে বলা যায় মন, প্রাণকে প্রভাবিত করছে। এটা সাধকের দৃষ্টি। এটা উজান বাওয়া বা আরোহণের দিক। আর যোগীরা সরাসরি প্রাণকে তোলার চেষ্টা করছে। ভক্তরা মন দিয়ে ভগবানের পুজোআচ্চা করছে, আলোর খোঁজে, আলোর উৎসে চলে যাওয়া। যে যে ভাবে পারে করছে। শাক্তদের ভক্তির ব্যাপার যেখানে, সেখানে মন প্রাণকে প্রভাবিত করছে। আবার শাক্তদের যেখানে যোগের ব্যাপার, সেখানে প্রাণ মনকে নিয়ন্ত্রণ করে। উদ্দেশ্য সেই একই।

প্রাণ-মন-ইন্দ্রিয়ের যে যতটা উজানে যেতে পারছে সে ততই স্বচ্ছন্দ, আনন্দ, শান্তি আর ব্যাপ্তির জগতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এটা যথাযথ। আর যখন ইন্দ্রিয়কে সামলে রাখছে, এই পর্যন্ত, নিয়ন্ত্রণ তো উপর উপর করছে, ভেতরে ভেতরে সে তো একটাই। একটা বন্য প্রাণীকে বেঁধে রাখার মত। এটা বাইরের দিক থেকে। কিন্তু যখন প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করছে তখন যেন একটা বশ্য প্রাণী যে নিজেই নিজের মত আছে। তার প্রাণের অবাঞ্ছিত প্রকাশ নেই ঐ স্তরে। তার প্রকাশটা উর্ধ্ব স্তরে আলোর জগতে চলে গেছে। এইজন্য সবার জীবনে রাজযোগের সাক্ষাৎ ভাবে অত প্রয়োজন না থাকলেও স্বামীজী সকলকেই মোটামুটি রাজযোগের ব্যাপারটা বুঝে নিতে বলেছেন।

আহত সাপ ছোবল মারছে না, কিন্তু সে তো বশীকৃত হচ্ছে না। বাতাস টেনে টেনে নিচ্ছে, আবার ছোবল মারবে। তেমনি মানুষ হাজার বার বুড়ো হচ্ছে, মরছে আবার জন্মাচ্ছে, আবার যখন তার শরীরে যৌবন আসছে—যে কে সেই। তার কারণ তার প্রাণ তো সংযমে নেই। সে প্রাণ সংযত করতে পারেনি, কাজেই মন, ইন্দ্রিয় কি ভাবে সংযত করবে! হাজার মানুষ জন্মাচ্ছে, মরছে, কিন্তু যে কে সেই। কিন্তু যে প্রাণকে সংযত করতে পেরেছে জন্ম-জন্মান্তরে, সে তার স্বাভাবিক সংযমের অধিকার নিয়েই জন্মাচ্ছে। প্রাণ তো তার সূক্ষ্ম এবং কারণ দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। আলাদা করে বললে, সূক্ষ্ম দেহ কারণ-দেহ যুক্ত হয়ে আছে। প্রাণ সেখানে সংযত হয়ে আছে। সেইজন্য সে বারবার জন্মগ্রহণ করলেও প্রাতিভরূপে সাধনার ফল তার সঙ্গে থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ, তাকে তো কেউ উপদেশ দেয়নি, স্বাভাবিক ভাবেই অল্পবয়স থেকে তার বৈরাগ্য এবং তপস্যার আগুন জেগে গেছে, সহজাত। ঠাকুরের সন্তানরা অল্পবয়স থেকে কিরকম। স্বাভাবিক। আর একটা কথা শাস্ত্রে বলেছে জাতরতি। ভাগবৎ বিষয়ে তাদের জন্ম থেকেই রতি। শব্দগুলো আমাদের প্রাচীন মহাপুরুষরা ব্যবহার করে গিয়েছেন। সহজাত আনন্দের অধিকার।

অভীপ্সা

☆ আপনি বলেছিলেন-ডোবার পর যথার্থ সাধনা চলতে থাকে। কিন্তু ডোবার পর বক্তিগত ইচ্ছে-অনিচ্ছে কি করে কাজ করে?

☆☆ মানুষের ঈশ্বরের প্রতি যে মিলনের ইচ্ছা বা আকাঙ্খা থাকে, সেই ইচ্ছেটাই কাজ করে। মানুষ সচেতন ভাবে মনে করে আমি জপ করছি, ধ্যান করছি, তপস্যা

করছি, ভগবানকে পেতে হবে। এই সচেতন ভাবনা মানুষ যখন ধ্যানের মধ্যে ডুবে যায় তখন থাকে না। কিন্তু এই ভাবনা বা সংকল্পজাত একটা শক্তি তার মধ্যে কাজ করে। সেই শক্তিটাই তাকে আরও গভীর ধ্যানের বা ভগবানের পথে নিয়ে যায়। রাস্তাটা তো সে জানে না। আরও যদি সূক্ষ্ম বা গভীরতর বোধ, উপলব্ধির আনন্দ জেগে ওঠে একমাত্র সেই আবস্থাতেই সেই রাস্তাটা সে ধরতে পারে। তার আকুলতা, ইচ্ছা, শক্তি, যাই বল—পণ্ডিচেরীর মায়ের ভাষায় অ্যাসপিরেশন-সেই অ্যাসপিরেশনটাই কাজ করে। সেটা খুব ক্লিয়ারলি ডিফাইন নয়। কিন্তু সেই সহজাত সামগ্রিক আকুলতার আহ্বানে ভগবান সাড়া না দিয়ে পারেন না। ঠাকুর বলেছেন ছোট ছেলে বাবা বলতে পারে না, হয়ত বা, বা পা বলে, কিন্তু বাবা ঠিক বুঝতে পারে যে তাকেই ডাকছে। সাধনার যে ইচ্ছে, চেষ্টা বা অবলম্বন নিচ্ছে, সাধনা চলতে চলতে এমন একটা অবস্থা আসে, যেখানে বাহ্যিক সচেতনতার ভূমি থেকে উর্ধ্বে উঠে যায়। তখন একমাত্র তার এই বিপুল অভীপ্সা তাকে ভগবানের পথে নিয়ে যায়। এই বা বা পা বলা।

এই বা, বা পা বলা দুটো অর্থে। একটা সাধারণ মানুষ তন্ত্র-মন্ত্র, তার সাধন-ভজন প্রক্রিয়া জানে না, সে ব্যাকুল হয় ভগবানের জন্য। এটা সাধারণ অর্থে যেমন, তেমনি সাধনার গভীরের কথাও সমান ভাবে। সাধনার সমস্ত মন্ত্র বা পদ্ধতির পারে সাধক যেখানে যথার্থ গভীর ধ্যানে বিলীন হচ্ছে, তদাত্ম হচ্ছে, সেই স্তরেও সমান ভাবে সত্য। যোগের ভাষায় এটা একাগ্র এবং নিরুদ্ধভূমির মেশামেশি। নিরুদ্ধভূমিতে কোন মনের ক্রিয়া থাকে না, কিন্তু একাগ্র ভূমিতে সাধকের ইচ্ছেটা থাকে। একগ্রতার চরমে সে সাধনার বা অস্মিতার প্রান্তিক ভূমি স্পর্শ করে। সেটা একটা ধ্যান-তুঙ্গতার স্থান, যেখানে একাগ্রতা আর নিরুদ্ধতার পারস্পরিক মগ্নতার খেলা চলে। সেখানেও মানুষের সমস্ত সাধনার প্রক্রিয়া, পদ্ধতি পড়ে থাকে। একমাত্র ভগবানের অচিন্ত শুভেচ্ছায় সে সেই দুর্লভ সাধন চালিয়ে যেতে পারে বা সাধনার উন্নত, গভীরতম আনন্দটা তার মধ্যে বলবতী থাকে।

জপে সংঘাত

★ জপের সঙ্গে সংঘাতের কথা বলেছিলেন।

★★ জপ করতে করতে জপটা শক্তিমান হয় প্রাণবন্ত হয়। যখন আমি নিবিষ্ট ভাবে জপ করি—আমার সংস্কার ক্ষয় করার চেষ্টা করি, এটা মুখে বলছি আমার সংস্কার, কিন্তু আমি আমার সংস্কার তো আলাদা করে দেখতে পারছি না। একটাই। আমার সংস্কার মানেই আমি। আমার সংস্কার বা আমার সঙ্গে ঐ মন্ত্রের জপ-শক্তির সংঘর্ষ হচ্ছে। এখানেই স্বামীজীর শক্ত কবিতা -'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার'। কেননা আমি আমার স্থূল বোধের মধ্যেই আছি, স্থূল সূক্ষ্মাদি সংস্কার ধ্বংস করছি। যত নিবিষ্ট ভাবে জপ করছি, জপ তত প্রাণবন্ত হচ্ছে এবং আমার সংস্কারগুলোর সঙ্গে সরাসরি সংঘাত হচ্ছে। অমনি মানুষ জপ করতে হয়ত পারে বা ঈশ্বর-চিন্তা নিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু আসন লাগিয়ে নিবিষ্ট হয়ে জপ করাটা কঠিন। নিবিষ্ট হয়ে জপ করতে গেলে অনেকরকম অভাবনীয় সব বাধা আসে। হয়ত এমনিতে সারাদিন ঈশ্বরচিন্তা নিয়ে আছি, কিন্তু আসনে অকারণ চিন্তা সব আসে, অথবা মনটা জড়তার আশ্রয় নেয়। এইগুলো হয়। যখন আমি সংস্কার-

রূপ-আমিকে উজিয়ে যাবার চেষ্টা করছি, ভেঙে ফেলতে চেষ্টা করছি, অত্যন্ত নিবিষ্ট ভাবে জপ করছি, তখন আমার সংস্কারের সঙ্গে সংঘাত হচ্ছে। এতই সংঘাত হয় যে, কখনো মনে হয়—জপ করে কিছু হচ্ছে কি? কি লাভ?

তাহলে তিনটে পাওয়া গেল। একটা হচ্ছে—জপে বসে যতই জপ করছি মনে করি না কেন, নিজের অভিপ্রেত বিষয় নিয়ে কাটাচ্ছি, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি না। সে মনে করছে জপ করছে, কিন্তু যখনই নিবিষ্ট হচ্ছে, সে তার অন্তর্জীবন নিয়েই নিবিষ্ট হচ্ছে, তাই-ই স্মরণ-মনন করছে। অথবা মানসিক জড়তায় তমোগুণকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। এক ঘণ্টা বসল, সেটাই ভুল। কিছুই হয়নি।

আর একটা হচ্ছে—প্রচণ্ড সংঘাত, সমানে-সমানে। যেন উজিয়ে যেতে পারছে না, মনে করছে এতে লাভ আছে কি? কি লাভ? তো, আগেরটা থেকে এটা অনেক ভালো। সংঘাত যে চলছে সংস্কারের সঙ্গে, এটা ভালো। কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘক্ষণ চলতে পারে না। মানসিক যন্ত্রণা, তার শরীর-মনে অসুস্থতা আনতে পারে। ঠিক এদিক থেকে জপ-তপের পাশাপাশি মহাজনরা সৎ কর্ম বা সৎ জীবন, এইগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বৈখরী স্তর। যুক্তি-বুদ্ধি জাত নৈতিকতার বিস্তার এই স্তরেই।

তৃতীয় হচ্ছে, যেখানে সংস্কারকে সে তুচ্ছ করতে পারছে। তীব্র ভাবে জপ করছে, যেটুকু বাধা আছে সেই বাধাটুকু তার জপের তেজটাকে আরও গাঢ় করছে, আরও গভীর ভাবে সে জপে ডুবে যেতে পারছে। এখান থেকে জপ চলে যায় একাত্মতার বা মগ্নতার দিকে। চতুর্থ স্তরে সে ধ্যানের অধিকার পাবে। মধ্যমা। এখানে সংগ্রাম নেই, বিজয়ের নিশ্চয়তা জাত প্রশান্তি সাধকের জীবনে।

ঈশ্বর দর্শন

★ সমাধিস্থ না হলে কি ঈশ্বর দর্শন হয় না?

★★ হ্যাঁ, ঈশ্বর দর্শন সব সময়ই হতে পারে। তবে সমতা বা আধারের পূর্ণতা হয় না সমাধিস্থ না হলে। আমি তোমাকে দর্শন করছি; তুমি আমাকে দর্শন করছ। স্বপ্নে লোকে ঠাকুর-দেবতা, কত কিছু দেখে। ঈশ্বর দর্শন হতেই পারে। শিব, কালী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সব দর্শন হতে পারে। কিন্তু সেটা অসম, সমতা হয় না। একটা শিশু যেমন বাবাকে দেখে, একরকম দেখে, ছেলে যখন যোগ্য হয়ে বাবাকে দেখে, সেই দেখাটা অন্য। এই আর কি। বিরল আধার জেগে বা সচেতন ভাবেও ঈশ্বরীয় দর্শনাদি করতে পারে, কিন্তু অন্তরের জাগ্রত অতৃপ্তি বলে দ্যায়, সমতা বা পূর্ণতা এখনো আসে নি। পূর্ণতায় পরিতৃপ্তি।

গুরু পূর্ণিমা

প্রতিদিন যেমন সূর্য ওঠে, সব জায়গায় তার আলো ছড়িয়ে যায়, আমাদের নিজ নিজ ঘরেও আমরা তার আলো পাই। তেমনি সচ্চিদানন্দ সূর্য বিশ্ব-ভুবন ব্যাপ্ত করেছে, সমস্ত তৃষিত, আলোক পিপাসু মানুষকে তার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। সেই চেতনার সূর্য, সচ্চিদানন্দ গুরু, সদ্‌গুরু, আমরা তাকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলি। সুতরাং সেই ব্যাপ্ত চেতনার সূর্য, তারই আলোর উৎসব ঘরে ঘরে, মানুষের মনে মনে ছড়িয়ে যায়। এমনটা ভাবাই ভালো।

জগতে অন্ধকার আছে, আলো আছে,—দুটোই সত্য। তার চেয়ে বড় সত্য অন্ধকার কখনো আলোকে গ্রাস করতে পারে না, আলোই সরিয়ে দেয়, তাড়িয়ে দেয়, বিলীন করে অন্ধকারকে। এই পরম সত্যটুকু যদি জীবনে না থাকত, জীবনে বাঁচার গৌরব কিছু থাকত না। ভগবানের কাছে আমাদের প্রার্থনা - আমরা যেন আমাদের ঘরে ঘরে সেই অনির্বাণ, অম্লান সূর্যের আলোকে আবাহন করতে পারি, তাঁর উপস্থিতি যেন দিনে দিনে সুন্দর হয়ে ওঠে, আমরা যেন সচেতন হতে পারি, তার পূর্ণ আবির্ভাবকে এই ভাবে ত্বরান্বিত করতে পারি।

মনে পড়ে, ছোটবেলায় রাত্রির ব্যাপ্ত অন্ধকারে চারিদিকের নির্জনতার মধ্যে একটা ল্যাম্পপোস্ট তার আলোর অস্তিত্ব নিয়ে জেগে থাকত দেখতাম। খুব ভালো লাগত দেখতে। আশ মিটত না। দেখতে দেখতে একদিন আমার মনের মধ্যে একটা কথা এল, সেই ভালো লাগাটা শত গুণ হ'ল, ভাবলাম যে, দেখ চারিদিকে এত অন্ধকার কিন্তু একটা আলোর কাছে জব্দ হয়ে গেছে। সেই আলোর মহিমা অন্তরে জেগে রইল যে, অন্ধকার যতই বড় হোক, একটা আলো জ্বললেই সে প্রতিহত, বিলীন হবে, আলো তার গৌরবময় সত্তা নিয়ে জেগে থাকবে।

আমাদের জীবনে বারবার কত তিথিই তো আসে আর যায়, কিন্তু এই তিথিগুলোকে যদি আমরা নতুন করে না পাই, আমরা যদি নতুন করে জেগে না উঠি, এই তিথিগুলো নেহাত আটপৌরে দশটা-পাঁচটা। আমরা যে আনন্দ করতে এসেছি, আলো জ্বালিয়েছি, ধূপ-ধুনো জ্বালিয়েছি, ফুল দিচ্ছি, একটা উৎসবের ভাবনা। কিন্তু প্রতি তিথি আমাদের কাছে নতুন প্রত্যাশা কিছু নিয়ে আসে। সেই প্রত্যাশাটাকে যদি আমরা পূর্ণ না করি, এ নিত্যদিনের মত উৎসাহহীন একটা নীরস ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই এই তিথিগুলো যে প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের কাছে আসে, সেই প্রত্যাশা যেন সফল করতে পারি, তিথি গুলো যেন আরো গৌরাবান্বিত হয় আমাদের উজ্জ্বলতম উপস্থিতির গৌরবে। ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা।

ভাবগত পরমাণু

এই সৃষ্টির মধ্যে মৌলিক ভাবগত পরমাণু আছে। এই সৃষ্টি যতদিন না তার স্বরূপ পরিণামে ফিরে যাবে, ততদিন থাকবে। কোন কল্পনা নয়। তোমার কাছে জবা ফুল যেমন সত্য, উন্নত যোগীর কাছে সেই পরমাণুটাও সৃষ্টি বিকাশের ধারায় তার চেয়ে বেশীই সত্য। যখন সেই ভাবগত পরমাণুর সহস্র ধারা নিয়ে এই সৃষ্টিটা প্রকাশিত হ'ল, তখন এই জবা, ধুতরো, কলকে এসব গাছ, ফুলেরও সৃষ্টি হ'ল। এ যদি না থাকে, যদি নিম্ন ক্রমে সৃষ্টি বিকাশ না হয়, তা হলে উর্ধ্ব ক্রমে বিলীন হবে কি করে? প্রত্যেকটার মধ্যে যোগ আছে। যে সূত্রে ধরে প্রকাশ হয়েছে, সেই সূত্র ধরেই একদিন তা মূলগত সত্তায় বিলীন হবে। কাজেই সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই তার ধারা আছে। যেমন একটা তুলসী গাছ আর একটা ভেরেণ্ডা গাছের মধ্যে বিকাশের ভিন্নতা। কি সেই সূত্র? এ জীব বিজ্ঞানের সূত্র নয়, এ আমাদের ভাবের জগত। সৃষ্টির প্রকাশ হয়েছে সেই ভাবে। ধ্যানের জগতে, জ্যোতির জগতে এই ভাবগত পরমাণু সাক্ষাৎকার হয়। এ যোগীর অধ্যাত্ম-চেতনা। পরমাণুগুলো আরও উজিয়ে শুদ্ধতর জ্যোতির ক্রম। জ্যোতি বলছি, সেই জ্যোতি স্ব-

প্রকাশ, স্ব-নির্ভর, স্ব-তন্ত্র। ঠাকুরের বন্দনায় স্বামীজী বলছেন-'জ্যোতির জ্যোতি'। তাহলে জ্যোতির উর্ধ্বতন বা অধস্তন ক্রম আছে। এই যে আপনারা গায়ত্রী জপ করেন, তাতে আছে, 'বরেণ্যং ভর্গ্য'। বরেণ্যং যখন আছে, তখন অবরেণ্যংও আছে। এবং বরেণ্যং-এর মধ্যেও তারতম্য আছে। পুরো সৃষ্টির মধ্যে সেই ভাবগত পরমাণুর খেলা চলছে। এই যে ঠাকুর বলেছিলেন—'অসৎ লোক বসেছে, কোদাল দিয়ে সেখানকার মাটি খুঁড়ে ফেলে দে—এই চিন্তাভাবনার পরমাণুর প্রভাব। যে শুভ চিন্তা করছে, সৎ চিন্তা করছে, তার মধ্যে শুভ পরমাণুর সংস্থান আছে, তার বিকিরণ হচ্ছে। যে অসৎ চিন্তা করছে তার মধ্যে অসৎ পরমাণুর সংস্থান, তার বিকিরণ হচ্ছে। ঠাকুর সহজ ভাষায় বলছেন—ওখানকার মাটি অশুদ্ধ হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে থেকে বিকিরণ হচ্ছে। ঠাকুর বলছেন—বিষয়ী লোকের হাওয়া সইতে পারতুম না, যেন প্রাণটা বেরিয়ে যাবার মতো হ'ত। আবার পরবর্তীকালে বলছেন—এখানে আসা যাওয়া কোর। দেখ, একই পরমাণু পদ্মফুল হয়েছে, তার মধ্যেও কিছু ফারাক আছে, তারই একটা লাল হ'ল, একটা সাদা হ'ল। সমস্ত সৃষ্টির ক্রম আছে। পদ্মের মধ্যে শুভ পরমাণু, তাই আমাদের সর্ব শুভাত্মক ভাবনায় পদ্মের ছড়াছড়ি।

আবার সাদা ফুলের মধ্যেও দেখুন নানারকম ভাব আছে। কলকে, ধুতরো, আকন্দ ফুলের মধ্যে যে ভাব, কামিনী, যুঁই ফুলের মধ্যে সেই ভাব নেই। সৃষ্টির ক্রমে ঐগুলো আলাদা। সাদা হলেই হ'ল না। ঐগুলো শিবের প্রিয় ফুল হয়ে গেল, এইগুলো হ'ল না। বেলি ফুল কোন পুজোয় প্রসিদ্ধ নয়। বেলগাছের তলায় শিবজী গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন। ওর শিকড়, পাতা, ফুল, ফল সব লাগে। আপেলের মত সুন্দর আর ল্যাংড়া আমের মত স্বাদ কোথায়—কোন ফলে? সেখানে তো শিবজী বসে নেই। বেলগাছের তলায় বসে আছেন। তার মধ্যে সেই অত্যন্ত শুভ পরমাণু আছে, যাতে অধ্যাত্ম চেতনার বিকাশ হয়। আবার মায়ের যে দর্শন পেল দেবতারা, সেও ঐ বেলগাছের তলায়। সেইজন্য বেলগাছ-তলায় এখনো মায়ের বোধন হয়।

শঙ্করী-মা

ত্রৈলঙ্গ স্বামীর এক অন্তরঙ্গ শিষ্যা শঙ্করী মা-এর কথায় ত্রৈলঙ্গ স্বামীর জীবনী লিখেছেন পরমানন্দজী। সেখানে তিনি লিখেছেন—ত্রৈলঙ্গ স্বামীর দেহ বাক্স বন্দি করে ভাসান দেওয়ার সময় দেখে দেহ নেই ভেতরে, খালি বাক্স, তাই ভাসান দেওয়া হয়। এটা একদম নতুন কথা। অন্য জীবনীকার উমাচরণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, সেই অবস্থায় বাক্স বন্দি করে ভাসান দেওয়া হয়। কিন্তু ইনি লিখছেন— শেষ মুহূর্তে গঙ্গায় ভাসান দেওয়ার সময় দেখে খুব হাল্কা, তখন সন্দেহ হওয়াতে খুলে দেখে ওর মধ্যে ওঁনার দেহটা নেই। শঙ্করী মা বলছেন, যে যাই বলুক, এটা আমি প্রত্যক্ষ জানি। উমাচরণ লেখেননি—কেননা উমাচরণকে বলেছিলেন—'দেখ, যা লোকে বিশ্বাস করবে না তা লিখ না'। এইজন্য এই কথাটা লেখেননি হয়ত। এটা একটা সম্ভাব্য কারণ হ'তে পারে। তা উমাচরণ আর বাড়ান নি। আবার লিখেছেন, ফাইনাল ম্যানস্ক্রিপ্ট করার সময় উমাচরণ নিজে করেননি, আর একজনকে দায়িত্ব দেয়। তার জন্য দেখা যায় লিখেছেন—স্বামীজীকে

শোয়ানো অবস্থায় ভাসান দেওয়া হয়। কিন্তু হিন্দুদের এরকম ক'রে সমাধি দেয় না, মুসলমান, খ্রিস্টানদের করতে পারে। হিন্দুদের বসানো অবস্থাতেই দেওয়া হয় এবং ওঁনার ক্ষেত্রেও তাই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শঙ্করী মা বলছেন, এটা আমি নিশ্চিত ভাবে জেনে বলছি—ওঁনার অন্তর্ধানের কথা। অর্থাৎ উনি এখনো আছেন।

এর সমর্থন আছে গোঁসাইজীর কথায়। কুলদার 'সদ্‌গুরু সঙ্গ' বইগুলোতে উল্লেখ আছে। তিনি দুজনের কথা বলেছেন, কুম্ভমেলায় তাঁদের দর্শন পেয়েছিলেন একজন ত্রৈলঙ্গ স্বামী, আর একজন মহাপ্রভু। বৃন্দাবনে বলেছিলেন, দুজন দেহে আছেন, ওঁনারা দেহত্যাগ করেননি। গোঁসাইজী বলেছেন—ভাগ্যবানদের দর্শন দেন।

যা লিখেছে বাপু, মিথ্যে আমার কিছু মনে হয়নি। এখন শঙ্করী মা যদি নিজে লিখতেন তাহলে আরও বিশ্বস্ততার কারণ ছিল। ওঁনার কাছ থেকে শুনে লিখেছেন পরমানন্দ সরস্বতী। তবে, যোগদার যে প্রতিনিধি কুম্ভমেলায় দেখা করেছিল, তিনি বলছেন তখন ১১২ বছর মায়ের বয়স। যোগানন্দ সংগঠনের স্বামী বিনয়ানন্দ গিরি ১৯৩৮সালের হরিদ্বার কুম্ভ মেলায় শঙ্করী মায়ের কাছে শুনে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর বর্তমান থাকার কথা জানতে পারেন এবং সঙ্ঘের পত্রিকায় ঐ সালের নভেম্বর সংখ্যায় তা প্রকাশ করেন। শ্রীবিনয়ানন্দ গিরিজী পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বর যোগদা মঠ প্রধানের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মত-পথের তুঙ্গতা

যোগ সাধনা আর বেদান্ত সাধনা এক নয়। পুঁথিতে এবং লীলা প্রসঙ্গে তোতাপুরীকে যোগী বলেছেন। তোতাপুরী ঠাকুরকে যোগ সাধনা দিয়েছিলেন না বেদান্ত সাধনা দিয়েছিলেন এই নিয়ে প্রশ্ন আছে। বেদান্তের বিচারের ধারা তো ঠাকুরকে দিয়ে করাননি। তোতাপুরী দশনামী সন্ন্যাসী ছিলেন। সম্প্রদায়ের দিক দিয়ে বিরজা হোম করিয়েছিলেন এবং সাধনা যেটুকু পাওয়া যায় তা যোগ সাধনাই। বলা হয় বেদান্তের সাধনা করেছিলেন। অদ্বৈত বেদান্ত বলতে স্বামীজী, সারদানন্দ উপনিষদ বলেছেন। অর্থাৎ বেদান্ত বলতে সামগ্রিক অর্থেই বলেছেন, কোন বিশেষ দর্শননিষ্ঠ সাধন পদ্ধতির কথা বলেননি, ঠাকুর বলেছেন, সমস্ত পথেরই শেষ কথা—অদ্বৈত ব্রহ্মানুভূতি। মত পথ মাত্র। উপলব্ধি অধিকার সাপেক্ষে। সর্বোচ্চ পরিণতি-সেদিক থেকে নয়। শেষে তিনি ইসলাম সাধনা করেছিলেন বলেই সেটা শ্রেষ্ঠ, তা কি বলা যাবে?

ঠাকুর ইসলামের সাধনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি মুসলমান হয়েছিলেন কি? তাহলে—সাধনা একটা দিক আর ধর্মান্তরিত হওয়া একটা দিক। এখানেই সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে সিদ্ধান্তটা পাল্টে যায়। আমাদের যারা প্রাচীনপন্থী, তারা সনাতন ধর্ম বলতে হিন্দু ধর্মকেই বোঝে। ধর্মের যে ঐতিহ্যগত দিক, সার্বজনীন দিক, উপলব্ধির যে আবহমানতা, সেটাই মানতে হবে। সেখানে মানুষের সমস্ত ধর্মীয় আচরণ এবং উপলব্ধির মান্যতা আছে। নাহলে ইসলাম ধর্মের সাধনা করে তো ঠাকুর মুসলমান হননি। এরকম অনেক সিদ্ধান্ত এসে যায়।

আর একটা প্রশ্ন—স্বামীজী বলেছেন, চিঠিও লিখেছেন—বেদান্তের মতবাদ এবং ইসলাম ধর্মের কর্ম পরিণত বা ব্যবহারিক দিক। বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ, এটা বলতে কি বুঝিয়েছেন? বলিষ্ঠ জীবনবাদ। এটাই বুঝতে হবে। এটা যদি ভাবি—ইসলামীয় সমাজব্যবস্থা নিখুঁত বলে স্বামীজী উল্লেখ করেছেন তাহলে কিন্তু ভুল হবে। ইসলামীয় সমাজব্যবস্থা পৃথিবীর মধ্যে বেদান্তের সবচেয়ে নিকটবর্তী—এটা আসে কি, যেখানে নারীর মর্যাদা কোথায় রাখা হয়েছে? ইসলামের যে ভ্রাতৃত্ব, সেটা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব নয়, মুসলিম ব্রাদারহুড। এই প্রশ্ন আসতেই পারে। এই কথাতে জওহরলাল নেহরু থেকে হোসেনুর রহমান খুব উদ্দীপিত হয়েছেন। এটা ঠিক কথা, জগত মিথ্যা বাদ যা জীবনবোধকে দুর্বল করে, ইসলামি সমাজ দর্শনে তার স্থান নেই। তাহলে? স্বামীজী বলিষ্ঠ, সমৃদ্ধ জীবনবাদকে বোঝাতে ইসলাম কথাটা ব্যবহার করেছেন। বেদান্তের সঙ্গে বলিষ্ঠ জীবনবাদ, সেটা কোন ইসলাম বা কোন বেদান্ত—এসব ভাবার কথা।

ব্যবহারিক ভাবে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মই সেই এক পরম উপলব্ধিকে আত্মিকরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া। বিভিন্ন মতবাদ বিভিন্ন প্রক্রিয়া মাত্র। সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে শেষ কথা বা চরম কিছু নেই। বিশ্বের সকল ধর্ম চেষ্টা করছে সেই পরম সত্যকে দেশ-কালের ভিত্তিতে সেই পরম উপলব্ধির দিকে নিয়ে যেতে। জাতিগত দৃষ্টিভঙ্গি সাপেক্ষে প্রত্যেকটা মতবাদ এক একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা মাত্র। সেই জায়গায় কোন সমাজ সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি, সবচেয়ে নিখুঁত সেটা নয়। আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম এবং সমাজব্যবস্থা একই মূল বিন্দুর বিভিন্ন কৌণিক স্থিতি মাত্র।

এটা আমি কোন ধর্মের পক্ষে বা বিপক্ষে বলছি না। কোন একটা ধর্মের তুঙ্গতা এবং ব্যবহারিকরণের দিক থেকে বলছি। কোনটা আমি মনে করতে পারি না ঠিক আছে, মডেল একদম। এটা হতে পারে না। তাহলে মানুষের পরিবর্তন, পরিণতি, এগিয়ে যাওয়া, সেটাকেই ব্যহত করা হয়।

এইগুলোকে লোকে ভালো বলতে পারে, মন্দ বলতে পারে, সাম্প্রদায়িক বলতে পারে, অসাম্প্রদায়িক বলতে পারে, কিন্তু এমন কিছু বলিনি যাতে লোকে হাততালি দেবে।

আর একটা কথা কি জান তো? যে কোন মতবাদের একটা বিমূর্তকরণের দিক আছে, সেটা যদি না থাকে তাহলে মতবাদটা দাঁড়ায় না। কোন ধর্ম, কোন মতবাদ শুধু সত্য বা শুধু ব্যবহারিক, সেটা কোনদিন কোন পূর্ণাঙ্গ মতবাদ নয়। যে কোন পরিবেশ পরিস্থিতিতে সেটা ভেঙে পড়বে। কেননা একটা মতবাদে একটা ব্যবহারিক দিক থাকে, সেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষাগত বিশুদ্ধিকরণের মধ্যে দিয়ে প্রতি মুহূর্তে উচ্চ সত্যকে দেশ-কাল বা পরিবেশ-পরিস্থিতি নিরপেক্ষ বিমূর্তকরণের দিকে যাচ্ছে। তার একটা সংযোগকারী প্রাণ আছে, একটা আত্মা আছে, একটা দেহ আছে। এটা মানতেই হবে। গান্ধীজী একটা কথা বলতেন। বলতেন, আমার কাছে গড ইজ ট্রুথ। রাম নাম সত্য হ্যায়। সত্য রাম নাম নয়। যখন দেশ ভাগের প্রশ্ন আসল, তখন জওহরলাল প্রমুখ নেতারা সেটা মেনে

নিলেন। একজনই শুধু না করতে পারত, সে গান্ধীজী। তিনি চুপ করে মেনে নিলেন। রক্তের স্রোত তো আজ পর্যন্ত বয়ে যাচ্ছে, সেটা তো থামেনি। কত বড় ঐতিহাসিক ভুল হয়েছে। সেটা নিয়ে পৃথিবীর এই প্রান্তের প্রাণ, সম্পদ, সমৃদ্ধি সবই নষ্ট হচ্ছে। গান্ধীজীকে যখন জিজ্ঞেস করা হল—আপনি এতবড় একটা অন্যায়কে মেনে নিলেন কেন? কোন প্রতিবাদ করলেন না। গান্ধীজীর উত্তর হচ্ছে— মোস্ট অফ মাই কমরেডস্ হ্যাভ জয়েন্ড টু ইট। তিনি যদি একসঙ্গে বলতেন,—রামই সত্য, সত্যই রাম, তাহলে এটা কি বলতে পারতেন।

সত্যের একটা অরূপ তুঙ্গতার দিক আছে, যার জন্য সব কিছু দেওয়া যেতে পারে। সেই বোধ যদি জাগ্রত থাকত, সেই সততা, নিষ্ঠা যদি থাকত, তবে যে কোন মূল্যে আমি এটা রুখব—বলতে পারতেন। নাহলে আগামী দিনের ইতিহাসকে, মানুষকে কি উত্তর দেব? তখনকার দিনে কিছু দাঙ্গা, ইত্যাদিকে ভয় পেয়ে মেনে নিয়েছেন। আমি যদি বিরোধিতা করি তাহলে কি হবে? হাজার কৈফিয়ত দিতে পারে গান্ধীবাদিরা। কিন্তু সত্যের একটা বিমূর্তকরণের দিক আছে, যার উপর ব্যবহারিক সত্য দাঁড়িয়ে আছে। নাহলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কখন যে কি অবস্থা আসে মানুষ সেটা সামলাতে পারে না। গান্ধীজীর সামগ্রিক অবদান, অস্বীকার করছি না, কিন্তু একটা উদাহরণ দিলাম। যে কোন উপলব্ধি বা সত্যের বা ধর্মের যেমন একটা ব্যবহারিক দিক থাকবে, তেমনি একটা বিমূর্তকরণের দিক আছে, সার্বজনীন দিক আছে, তারই জন্য বারবার বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতি, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিভিন্ন প্রয়োজনে নতুন করে আমরা উপলব্ধি করতে পারি সেখান থেকে আমরা যাচাই করে নিতে পারি এর ধ্রুব মূল্য।

মনের ওঠাপড়া

একটা আদর্শকে ধরে এগিয়ে যাওয়া। সংশয় আসে, যেখানে সে এগোতে পারছে না, সেখানেই নানারকম জিনিস আসতে পারে। যেখানে এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে সংশয় নেই। তুমি তিন তলায় উঠছ। খানিকটা উঠে ধাপ। সেই ধাপে সংশয় নেই। আবার যখন উঠছ, তখন সংশয় আছে। আবার মাঝখানে উঠে একটা ধাপ, সেখানে সংশয় নেই। সেখানে স্থির। আবার উঠছ পায়ে পায়ে, প্রতিটি পদক্ষেপে সংশয় ক্ষীণ হয়ে আসে, নিশ্চয়তা গভীর। এরকমই ব্যাপার। ওঠাপড়া বলতে আক্ষরিক অর্থে নয়। সেটার অর্থ মানুষ এক জায়গাতেই আছে, তার কোন গতি নেই ধরে নিতে হবে। সে তো শেষ হয়ে গেছে। তার মনটা তো জাদুঘরের জিনিস হয়ে গেছে। সুস্থ মনই তো এগিয়ে যায়। তার ঐতিহ্যকে বজায় রেখে নতুন ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে। সফল মনের সেটাই স্বভাব। এই ওঠা-পড়ার মধ্যে ওঠা একটা আছে, এটা মানতেই হবে, নাহলে শূন্য হয়ে গেল। সেই কথার তো তাহলে কোন মানে হয় না। ওঠা-পড়ার মধ্যে ওঠা।

সাধন-ভজন করতে গিয়ে দেখতাম মাঝে মাঝে ভগবানের আনন্দ ভরে থাকত, মাঝে মাঝে ফাঁকা, কিচ্ছু নেই। আর তখন জীবনের শুরু, বয়সটা কম, মানে— ভগবানের পথে চলা শুরু। খুব অসহায় বোধ হোত। আর গুরুদেবকে তো বেশী বলা যাবে না, আলোচনা অত তিনি পছন্দ করেন না, আর ভাঙা-গড়ার কথা তো বলাই যাবে না।

তবে মনটা অসহায় হয়ে পড়ে তো, খুব খারাপ লাগে। তা, গুরুদেবকে একদিন বললাম। তিনি চুপ করে ছিলেন। চুপ করে থাকলেও খেয়াল রাখতেন খুব। একদিন বললাম, দেখলাম আমার দিকে তাকাচ্ছেন, কিছু বললেন না। পুজো, ধ্যান সব হয়ে গেল, বেলতলায় বসলেন। বললেন—"ওরে এটা তো জ্যান্ত জিনিস, ওঠা-নামা করবে। ওঠা-নামা করতে করতেই উঠবে। এক ভাবে যদি কোন সাধকের থাকে, সেটা ভালো লক্ষণ নয়। সে বেশী দূর এগোতে পারবে না। এই ওঠা-নামা করতে করতেই এগিয়ে যায়। মায়ের খেলা। এটা ভালো।" বলে আবার চুপ করে গেলেন। মনে ভগবানের পথে চলার একটা দারুণ জোর, বিশ্বাস, শিক্ষা, যাই বল পেলাম। পরে আস্তে আস্তে বুঝলাম—হ্যাঁ, গুরুদেবের কথাটা ঠিক। তারপর আর ফাঁকা গেলে মনটা ভেঙে পড়ত না। জানতাম বিরাট ভাবে, আরও বেশী করে ওঠে বলেই ফাঁকা যাচ্ছে। এটা হোত। মনে বিশ্বাস এসে গেল। ফাঁকা অবস্থাতেও মনে ভরসা থাকত। তারপর যখন আরও আনন্দ পেতাম, আরও ভালো লাগত। আর, গুরুদেবকে আর একটু জানতে পারলাম—'এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা'।

জাপানি গল্প

জাপানে একটা পাহাড়ের গায়ে সরু পথ দিয়ে যেতে হয় অনেকটা। সেই পাহাড়ের উপরে একটা সমতলভূমি। সেখানে একটা ছোট দিঘি আছে। আর, পাহাড়ের গায়ে যে বড় বড় গুহা মত আছে, সেখানে একটা বুদ্ধদেবের মূর্তি আছে। বেশ বড়-সড়। মাঝে মাঝেই চারপাশের গ্রাম থেকে মানুষরা যায় সেই বুদ্ধের মূর্তির কাছে, পুজো পাঠ করে, সেই মূর্তি সাজায়, বুদ্ধের মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে, ধূপধুনো জ্বালায়, ভোগ নিবেদন করে, আবার সবাই চলে আসে। একটা ছোট ছেলে, সেও সুযোগ পেলেই মায়ের সঙ্গে সেখানে যায়, বুদ্ধের মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে। তার ভীষণ ভালো লাগে তাকিয়ে থাকতে। আসতেই ইচ্ছে করেনা। কিন্তু ফিরতে হবে। চলে আসে। এমনি করে করে যখন একটু বড় হল, তখন আশেপাশের গ্রামের মানুষ যখন কোন উপলক্ষে সেখানে যায়, সেও তাদের সঙ্গ নেয়। যাওয়াটা আরও ঘন ঘন হতে লাগল। শেষকাল এমন হল, যে আর ফিরে আসতে ইচ্ছে করে না, ওখানেই থাকতে ইচ্ছে করে, অপলক দৃষ্টিতে শুধু বুদ্ধের মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকতেই ইচ্ছে করে। শেষ পর্যন্ত এমন একদিন এল যে আর তার ঘরে থাকা দায়, ঘরে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। একদিন সে তার নিজের ছোটবেলার গ্রাম-ট্রাম ছেড়ে সেই পাহাড়ের উপর নির্জন স্থানে গিয়ে রয়ে গেল। সারাদিন বুদ্ধের মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে। যারা পুজো দেয়, তাদের নিবেদন করা প্রসাদ যা দেয় বা পড়ে থাকে তাই খায়। সারা দিন বুদ্ধের চিন্তা, বুদ্ধের রূপ ভাবতে থাকে—মানুষটা কেমন ছিল, জীবনটা তাঁর কেমন ছিল। এইরকম ভাবে, যা পড়েছে, শুনেছে, সেইগুলোই ভাবে আর ঐ রূপ প্রাণ ভরে দেখে। গ্রামের কত লোক এসে কতবার বলল—ফিরে চল গ্রামে। সে বলল, না, আর ফিরে যাওয়া যাবে না। শেষ পর্যন্ত সবাই হাল ছেড়ে দিল।

তার এখন মাঝ বয়স হয়ে গেছে। এই ভাবেই তার জীবন কেটে যায়। একদিন সে দিঘির ধারে তন্ময় হয়ে বসে আছে, কোন হুঁশ নেই। কিছু মানুষ এসে তার উদ্দেশ্যে স্তব-স্তুতি ধূপ-ধুনো দিতে লাগল, ভোগ নিবেদন করতে লাগল। সে বলল—এ কি হচ্ছে? কি করছেন আপনারা? বুদ্ধ মূর্তি তো ওখানে, এখানে কেন আমাকে নিবেদন করছেন? সেই মানুষেরা বলল, আপনাতে আর ওতে তো আমরা কিছু পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না। সে লজ্জায় মাথা নিচু করল, আর তখনই জলের ছায়ায় দেখতে পেল—তার মূর্তিও বুদ্ধের মত শান্ত, সুন্দর, সৌম্য হয়ে গেছে।

তিথি

প্রত্যেকটা তিথিই পূর্ণ। প্রত্যেকটা তিথিই সাধককে কিছু দিয়ে যাচ্ছে তার সামর্থ অনুযায়ী। বারবার তিথিগুলোর সঙ্গে বোঝাপড়া হচ্ছে সাধকের। প্রত্যেকটা তিথিই তো আসছে বছর বছর ঘুরে ঘুরে। এই যে প্রত্যেকটা শুভ তিথি প্রত্যেকটা সাধককে পূর্ণ করে দিয়ে যাচ্ছে সাধকের সামর্থ অনুযায়ী, প্রত্যেকটা তিথিই তার কাছে একট প্রত্যাশা নিয়ে যাচ্ছে যাবার সময়—আমরা বারবার আসছি এত তিথি তোমার জীবনে, কিন্তু তুমি একদিন নিজেই তিথি-স্বরূপ হয়ে যাবে। সেই বিশেষ তিথিতে সব তিথি চিরন্তন হয়ে যাবে, যেদিন তুমি সফল হবে, পূর্ণ হবে, সেদিন তোমার মধ্যে আমাদের আসা সফল হবে। তোমার মধ্যে সব তিথি পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। সেই তিথিটা সাধকের নিজস্ব তিথি। সেই সৃষ্টি করে সেই তিথি। সেই তিথি তার জীবনে চিরন্তন, আর সেই তিথিতেই সব তিথির পূর্ণতা তার জীবনে।

রাস পূর্ণিমা

জন্মাষ্টমিতে যেটা শুরু, রাস পূর্ণিমায় তার পূর্ণতা। রাস পূর্ণিমা সম্বন্ধে বলা হয়, রস আস্বাদনের যেটা পূর্ণতা, সেটাই হচ্ছে রাস। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা আছে—'রসো বৈ সঃ'। ব্রহ্মের স্বরূপ কি? না, তিনি রস স্বরূপ। 'রসং হ্যেবায়ং লবব্ধানন্দী ভবতি'। জীব এই রস আস্বাদন করে অমৃতত্ব লাভ করে। ঠাকুর বলছেন স্বামী বিবেকানন্দকে—'মনে কর এক খুরি রস আছে, তুই কি ভাবে খাবি?' 'আমি আড়ায় বসে খাবো। কেননা রসে বসে খেতে গেলে ডুবে যাব'। ঠাকুর বলছেন, 'ওরে সেই রসে ডুবলে কি মরে? সে তো অমর হয় রে'। কেমন সুন্দর কথা। বলা হয় অনন্তের সুরে কৃষ্ণচন্দ্র বাঁশি বাজাচ্ছেন। তাহলে ধরে নাও জন্মাষ্টমিতে প্রথম ফুৎকার দিয়েছিলেন আর রাস পূর্ণিমায় সপ্তম সুরে। সমস্ত রন্ধ্র যেখানে উন্মুক্ত, সেটা রাস। প্রথম রন্ধ্র উন্মুক্ত—উপলব্ধির প্রথমা। তারপর আস্বাদন তত্ত্বের অসীম এলাকা। আস্বাদনের স্তরে স্তরে সেই আস্বাদনের গভীরতা আসে। আর যখন শেষ দ্বার, মহাদ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে, তখন সপ্তমের বাঁশি বাজিয়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। সেটা হচ্ছে রাস। যার ষষ্ঠ উন্মুক্ত হয়েছে সে মহাপুরুষ, আর যার সপ্তম উন্মুক্ত হচ্ছে সে পরমপুরুষ। তাই বলা হয় পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। পরম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। তিনি সপ্তমের সুর ধরেছিলেন, তাই তিনি পরমপুরুষ।

দেবপ্রসঙ্গ

বাঁশি

কৃষ্ণের হাতের বাঁশি, এই বাঁশির প্রসাদী-সুরের আস্বাদনের শেষ নেই। আজ পর্যন্ত কত মহাপুরুষ এই বাঁশির সুরে মুগ্ধ হয়েছেন, বাঁশির তাৎপর্য অনুধাবন করেছেন, তা যদি বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ, আলোচনা, আস্বাদন করা যায়, তাহলে স্বতন্ত্র একটা চৈতন্য চরিতামৃতের মত বই হবে। আমি খুব সংক্ষেপে দুটো-একটা দিগ্‌দর্শন বলছি। প্রথমে আমি সাধকদের অন্তর্জীবনে এই বাঁশির দুটো তাৎপর্য এবং পরে লীলার দুটো তাৎপর্য বিশ্লেষণ করব।

প্রথমেই যেটা বলা হয়, সেটা হচ্ছে—বাঁশি, শব্দ-ব্রহ্মের অনাহত নাদের প্রতীক। কোন একটা জায়গায় যদি একটা শুদ্ধ শব্দ বাজে এবং তার কাছাকাছি অনুরূপ ধ্বনিসামর্থ সম্পন্ন কোন তারের যন্ত্র বা সূক্ষ্ম যন্ত্র থাকে, তাহলে ধ্বনির প্রতিধ্বনি সেসব যন্ত্রে হবে। তবে, সেসব যন্ত্রের শুদ্ধতার সামর্থে সেই শুদ্ধ সুরের অনুরণন হবে। যে যন্ত্রগুলো সেই শুদ্ধ সুরের যত কাছাকাছি ভাবে বাঁধা আছে। মহাবাক্য আছে- " যা আছে ভাণ্ডে, তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে"। তাই সাধকদের পরাবস্থায় শুদ্ধ ওঁকার ধ্বনি অন্তঃশ্রবণে আসে। জ্যোতি বা শব্দের মহাপ্রকাশ সাধকদের পরাবস্থায় বা সিদ্ধাবস্থায় হয়। যেমন একজন মহাপুরুষ সিদ্ধাবস্থায় বলছেন-

" লাগা গগন মে আগ জ্যোতি কা ঝলক সে।
ফুট গয়া আসমান শব্দকা ধমক সে।।"

এমন মহা শব্দ আসছে যে, এই আকাশ ছাপিয়ে মহাকাশে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করবে। এটা মূল শব্দ। সাধকরা যখন সাধনা করতে করতে প্রাণের স্রোতে উচ্চ, আরও উচ্চতর কেন্দ্রবিন্দু স্পর্শ করে, প্রাণের বিভিন্ন কেন্দ্রগত স্থিতিতে এই মূল শব্দের ক্রম-শুদ্ধ অনুরণন হয়। শুদ্ধতার সামর্থে অনুরূপ সেই অনুরণন। এটা যত উপর দিকে যায়, তত সূক্ষ্মতর, উচ্চতর এবং আমাদের অধিক মন-লয়ের সামর্থ যুক্ত হয়, অর্থাৎ অধিকাধিক আমাদের মনকে টেনে নিতে বা অধিকাধিক সমাহিত করে। এসব শব্দকে কখনো মেঘের গর্জনের সঙ্গে, কখনো ঘন্টার ধ্বনির সঙ্গে, কখনো হাতির বৃংহণ-ধ্বনির সঙ্গে তুলনা করা হয়। অনাহত ধ্বনি বা শ্রীভগবানের হাতের বাঁশি বিভিন্ন রন্ধ্রে ধ্বনিত হয়ে, আমাদের বিভিন্ন প্রাণকেন্দ্রের সজীবতায় অধীকাধিক আমাদের মন-প্রাণকে একীভূত, কেন্দ্রগত করে এবং সর্ব অন্তিমে সেখানে শব্দ এবং শব্দাতীতের মিলন-ভূমি। মহাশব্দ বলা হয়েছে, সেখানে একাকার হয়।

আরও একটু অন্যভাবে সরিয়ে বলি। এই বাঁশির বিভিন্ন ছিদ্র আছে। ভগবান যে ফুৎকার দিচ্ছেন, আমাদের প্রাণশক্তির জাগরণ হচ্ছে। বিভিন্ন ছিদ্রগুলো বিভিন্ন চক্রের প্রতীক। শব্দের ভূমিতে, বিভিন্ন দ্বারে বিভিন্ন ধ্বনি উঠছে যা শেষ পর্যন্ত মহাশব্দ বা

নাদে পরিণত হচ্ছে। যেহেতু বিভিন্ন প্রাণকেন্দ্রে যে শব্দ তা ক্রমশুদ্ধ। এবং, মূলগত যে শব্দ, সেটাকে ছিদ্র বলা হয়নি, সেটাকে মহাছিদ্র বলা হয়েছে, যেখানে সাধক তার দেহকে যোগ বিদ্ধ করেছে। প্রথমে একটা মহাছিদ্র যেখান থেকে মহাবায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। আর শেষে একটা মহাছিদ্র, যেখান থেকে মহাবায়ু উৎসারিত হচ্ছে। তন্ত্রের ভাষায় বলে- কূল আর অকূল। এই মহাছিদ্রকে বলা হয় অকূল, সেখানে সব শব্দ মহাশব্দে বা মহাকাশে মিলে যাবে।

এইবার লীলাতত্ত্বের দিক দিয়ে বলছি। সাধক তম, রজ, সত্ত্ব, এই তিন স্তরের অতীত ভূমিতে পৌঁছবার জন্য সাধনা করে। এই রজো-সত্ত্ব মিশ্রিত অবস্থায় সাধকের সাধনা শুরু এবং সত্ত্ব ভূমিতে সাধকের সাধনা তীব্রতর, গভীরতর হয় এবং সত্ত্বের অতীত অবস্থায় অর্থাৎ গুণের অতীত অবস্থায় পূর্ণ অবস্থা পায়। একে রামানুজ বলেছেন গুণযুক্ত অবস্থা। শঙ্করাচার্য বলেছেন গুণাতীত। সাধক এই সত্ত্বের সীমানায় সাধন-ভজন ক'রে প্রকৃতির অতীত অবস্থায় যাওয়ার চেষ্টা করে। সাধক যদি সাধনার পারে আরও উচ্চতর অবস্থা পায়, তাহলে এই গুণময় প্রকৃতি তার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ঠাকুরের কথা আছে-বনের পথে তিনজন ডাকাত ধরল। তাদের মধ্যে একজন ডাকাত বনের ধারে এসে শহরের পথ দেখিয়ে দিল—চলে যাও শহরে। কিন্তু বলল, আমার যাওয়ার উপায় নেই। সেও ডাকাত। বলেছেন, এ হচ্ছে সত্ত্ব। তাহলে, সাধন-ভজন ক'রে সাধক সমস্ত গুণের অতীত বা গুণযুক্ত অবস্থায় পৌঁছচ্ছে। এখানে মায়াবাদী দর্শন বলছে— সে গুণের থেকে মুক্ত অবস্থা পাচ্ছে। কিন্তু লীলা-বাদের ক্ষেত্রে বলা হয় সে শ্রীভগবানের লীলায় প্রবিষ্ট হচ্ছে। কি ক'রে? না, এখানে লীলাবাদী বা যে-সমস্ত মহাপুরুষ ভগবানের লীলাকে স্বীকার করেছেন তাঁরা বলছেন—সমস্ত গুণের অতীত, ত্রিগুণের অতীত, মায়ার অতীত ভগবানের এক বিশেষ অধিকার বা শক্তি আছে, সেটা হচ্ছে যোগমায়া। এই যোগনায়াকে আশ্রয় ক'রে এই জগতে এবং অপার্থিব লোকে তাঁর লীলা প্রকাশ করেন। এই যোগমায়া আশ্রয় ক'রে যে লীলা প্রকাশ করেন, এ প্রকৃতির অতীত শক্তি, জ্যোতির্ময় বিশুদ্ধ সত্ত্ব নামে পবিত্র একটা সত্তা যা আশ্রয় ক'রে তিনি লীলা প্রকাশ করেন এই পৃথিবীতে বা পৃথিবীর অতীত দিব্যলোক সমূহে। তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তকে এই আনন্দ সত্তা আস্বাদন করান, যে শক্তিতে ভক্ত-ভগবানের চিরন্তন লীলা-আস্বাদন চলছে এই পৃথিবীতে বা অপার্থিব লোকে। এই যে জ্যোতির ঢেউ বা আনন্দের উল্লাস, এ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি। তিনি যোগমায়া আশ্রয় ক'রে বিশুদ্ধ সত্ত্বের ঢেউ তুলছেন, যাতে অপ্রাকৃত ধামে তো বটেই, এমনকি এই পৃথিবীর শুদ্ধ-মানস যেখানে যা আছে ব্যাকুল, উন্মাদ হয়ে ওঠে। তিনি এই বিশুদ্ধ সত্ত্বের সুর তুলেছেন, ঢেউ তুলেছেন এই সৃষ্টি ব্যাপ্ত ক'রে, যাতে শুদ্ধ প্রাণ, শুদ্ধ আত্মা ব্যাকুল, উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে। একেবারে ইদানীং কালের এক কবি ইদানীং-এর ভাষায় এই অপূর্ব কথাটা ব্যক্ত করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ—

'আকাশে উঠেছে সুর, অজানার বাঁশী বাজে বুঝি।
শুনিতে পায় না জন্তু, মানুষ চলেছে সুর খুঁজি।।'

কেমন লিখেছেন বল! সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বের ঢেউ উঠেছে, সমস্ত সত্তা ব্যাপ্ত করছে এবং লীলাস্থলীগুলোতে সেই সত্তার বিশেষ প্রকাশ এই বিশুদ্ধ সত্ত্বের যেখানে ঢেউ ওঠে, সেখানে এই পার্থিব জগতে অপার্থিব ধামের সৃষ্টি হয়, সেখানে আকাশ, বাতাস, প্রতিটি

ধূলিকণার মধ্যে অপার্থিব রূপান্তর সাধিত হয়। অপার্থিব প্রাণ সেখানে বাসা বাঁধে, অ-প্রাকৃত দৃষ্টিতেই তা ধরা পড়ে। ভারী গভীর লীলার এই সমস্ত আসর। ভগবান তাঁর বংশীধ্বনিতেই এই অপার্থিব লীলার ঢেউ তুলেছেন। বিশুদ্ধ সত্তার শক্তিতে পূর্ণ মানসকে অমোঘ বলে আকর্ষণ করছেন। তিনি তো নামেই কৃষ্ণ-কর্ষয়তি ইতি কৃষ্ণ। তাই শ্রীকৃষ্ণ।

এরপর আর একটা ছোট কথা। মানে, বাঁশি নিয়ে বহুতর লীলা-কাহিনী আছে তো, তেমনি একটা খুব ছোট করে বলছি।

গোপীরা ভাবে-আমরা কৃষ্ণের জন্য এত দুঃখকষ্ট সইলাম এত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, কিন্তু তেমন ভাবে তো তাঁকে পাইনি। কিন্তু এই মুখপোড়া বাঁশি-রূপ নেই, রস নেই, পোড়া বাঁশ, এমন কি গুণ জানে যে কৃষ্ণকে বশ করেছে। সবসময় কৃষ্ণের হাতে হাতে, ট্যাকে ট্যাকে ঘুরছে, মুখে-মুখে মুখামৃত পান করছে। নিশ্চয় গুণ করেছে কৃষ্ণকে। একবার যদি পাই তো ওকে দেখব। কিন্তু কৃষ্ণ বাঁশি ছাড়ে না, আর বাঁশিও কৃষ্ণ-ছাড়া হয় না। কিছুতেই পায় না, পায় না-শেষকালে একদিন পেয়ে গেল। কৃষ্ণ গাছের ডালে তাঁর উত্তরীয় রেখে যমুনায় নেমেছেন চান করতে। যমুনার জলে নেমে কৃষ্ণ স্থির হয়ে গেছেন! কেন স্থির হয়ে গেছেন? না, যমুনার জলে নিজের রূপ দেখে নিজেই বিভোর! বলছেন—আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত ত্রি-ভুবন আমার রূপে মুগ্ধ, কিন্তু আমি তো জানিনা আমার রূপ! এ কার রূপ! অবাক হয়ে দেখছেন। বিশ্বাস করতে পারছেন না। আর এই অবস্থায় গোপীরা খুঁজে খুঁজে দেখে বাঁশিটা কাপড়ের মধ্যে সযত্নে রাখা। সেটা নিয়ে তারা দে ছুট। তারপর একটা কুঞ্জের মধ্যে এসেছে। প্রথমেই বকা-ঝকা, ইত্যাদি খুব হ'ল। তারপর বলল, —তুই কি গুণ জানিস আমাদের বলতেই হবে! বাঁশি বলল. আমি তো কোন গুণ জানি না। গোপীরা বলছে, আমাদের এত রূপ, গুণ, এত বিরহ-ব্যাকুলতা, এত জ্বালা, আমরা পাইনা, আর তুই মুখপোড়া বাঁশি, তাও ভেতরে শাঁস নেই, ফাঁকা, অসার, শুকনো ঝাঁ ঝাঁ, তবু কি গুণ তোর আছে যে কৃষ্ণকে বশ করেছিস? সবাই যখন বকা-ঝকা আরম্ভ করে দিয়েছে, তখন বাঁশি কেঁদে বলে-ভাই, তোমরা যা বলেছ সব ঠিক। তোমরা জানো তোমাদের কত রূপ, গুণ, কত বিরহ-ব্যাকুলতা। কিন্তু আমি জানি আমার কিছু নেই-আমার বাইরে শুকনো, অন্তরে শুকনো, কঠিন কঠোর, নিষ্প্রাণ, নিঃসার, কিন্তু আমার কৃষ্ণ ছাড়া চলে না, তাই তিনি দয়া ক'রে আমাকে নিয়েছেন।

বিশ্বকর্মা

একটা চূড়ান্ত জ্ঞান অন্বেষণের দিক, আর একটা সামাজিক ধর্মাচরণের দিক, যা লৌকিক পুজো-অনুষ্ঠানে উৎসবের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে, এই ভারতাত্মার শাশ্বত প্রকৃতির চিরায়ত অভিব্যক্তি। আমরা যদি ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব এটা আবহমান কাল ধরেই চলে আসছে।

বিশ্বকর্মা পুজো কবে বা কি ক'রে শুরু হ'ল, সেটা নির্দিষ্ট করে না পাওয়া গেলেও, এই ঠাকুরটির হাতে দেখা যায় হাতুড়ি। সেই সঙ্গে শাশ্বতের মেলবন্ধন সুদর্শন চক্র। সুতরাং এটা যে আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পায়নের যুগের থেকে শুরু হয়েছে, সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের অর্থনীতি যখন শিল্পমুখী হয়েছে, শিল্পায়ত হয়েছে, তখনই মানুষ তার গণচেতনায় এই শ্রমদেবতা সৃষ্টি করেছে, বিশ্বকর্মা। সমস্ত কর্মযজ্ঞের মধ্যেও

এতটুকু অবসরে একটা দেবতার আসন সে সযত্নে বিছিয়েছে, জীবন সংগ্রামের সমস্ত কাঠিন্যের মধ্যেও যা অস্বীকার করতে পারেনি। প্রাণের মাঝে লুকিয়ে থাকা একটু যে শ্রদ্ধা, তাই দিয়ে সে কারখানার ধূলি-ধূসরিত অঙ্গনে একটি দেবতার আসন বিছিয়েছে- শ্রমদেবতা-তাঁর হাতে দিয়েছে চক্র আর হাতুড়ি। যিনি বিশ্বাতীত, তাঁকে করেছে বিশ্বময়, সে হচ্ছে বিশ্বকর্মা। এ ভারতীয় ঐতিহ্যের ব্যাপকতর রূপময় দিক। আমাদের অধ্যাত্ম-ঐতিহ্যের প্রাচীনতম দিক থেকে এর একটা সুগভীর মূল্য আছে। আমাদের ঔপনিষদিক ধর্মে মূলত যাকে বিশ্বাতীত, সমস্ত প্রপঞ্চের অতীত করেছে, তাকেই আবার কিছু কিছু উপনিষদে-শেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য, ইত্যাদি উপনিষদে বিশ্বময় বিশ্বাত্মক বলেছে। যিনি যথার্থ বিশ্বময় মগ্ন হয়ে আছেন, তাকেই রূপের মধ্যে আনা হয়েছে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলছে-'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।'

বলা হয়েছে-ভুবনেশমীড্যমের স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়ার কথা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের এই বাণী ব্যাপকতর উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে। আর তারই লোকায়ত দিক হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বকর্মার রূপ, যা মানুষ সৃষ্টি করেছে, তাকে নিয়ে উৎসব করছে, আনন্দ করছে।

আজকে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যদি তাঁর হাতে ক্যালকুলেটর থাকে, তাহলেও আমরা অবাক হব না। যদি একদিন বিশ্বকর্মা এই লৌকিক দিক বা স্তর থেকে আরও উচ্চতর চেতনার স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাঁর লৌকিক শ্রমজন-মন-অধিনায়ক রূপ হয়ত সরে যাবে। এমনি করেই হয়ত আজকের দিনে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত কিছু দেব-দেবীর পুজো বা আবির্ভাব হয়েছে। সেই আসন নেবে মানুষের উন্নত চেতনার যুগে, পরিশীলিত রূপে। কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বকর্মার লোকায়ত রূপ সমস্ত মানুষের কাছে, বিশেষ করে খেটে খাওয়া মানুষের কাছে পূজিত হচ্ছে তাদের ভালোবাসার মধ্যে, একান্ত আপনার হয়ে। মানুষের মধ্যে দেবতার আসনে তার সহজ-অম্লান রূপটা আজ আমাদের কাছে প্রকাশ পাচ্ছে। সেটা আমাদের কাছে বড় কথা।

প্রাণ প্রতিষ্ঠা

প্রাণ প্রতিষ্ঠার যে অনুষ্ঠান, তার মধ্যে চক্ষুদান একটা চূড়ান্ত দিক। চলতি পুজোয় দেখা যায় নানারকম গভীর সব মন্ত্র ঝেড়ে কাঁপতে কাঁপতে ত্রিনয়ন দিচ্ছে। যার সে চক্ষু নেই সে চক্ষু দিচ্ছে-কিরকম ব্যাপার নয়? তবু এই প্রতিমায় মানুষ ভক্তি ভাবনায় পুজো করে। বহমান গঙ্গা থেকে এক ঘট জল তুলে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছি। প্রাণের ধারা খণ্ডিত হচ্ছে না, প্রাণ তো বহমানই, তবুও আমরা যখন পুজো করছি তখন সাধনার সৌকর্যার্থে ভাবনায় একটু আলাদা করে ভেবে নিচ্ছি। বহমান গঙ্গার ধারা যেন নিত্য বহমান প্রাণের ধারা। এই প্রাণের ধারা থেকে যেন একটু আলাদা ক'রে প্রাণ ঘটে রাখা হ'ল, তাতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠার সাধনা। আবার পুজো হয়ে গেলে বিসর্জনের সময় ঘটের গঙ্গাজলটা গঙ্গায় দিচ্ছি। তাহলে, এই ঘটের প্রাণটুকু যেন আলাদা করে আমরা পুজো-প্রতিষ্ঠা করলাম, আবার সাধনার সফলতায় সেই মহাপ্রাণেই মিশে গেল। এদিকে দেখুন, ঘটে তো প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছি। আবার ঘট থেকে মূর্তিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ ঘটে যে

প্রাণ, সেই প্রাণ মূর্তিতে সঞ্চার করছি। মহাপ্রাণ থেকে প্রাণ সঞ্চয় করে আমরা আলাদা করে মনোমত পুজো করলাম। তাহলে, যা ছিল ভাবনায় তা এল রূপে এবং ক্রমে তা অনুভূতির সফলতায় সর্বব্যাপ্ত হ'ল। আবার অনন্ত প্রাণের ধারায় সেই বিগ্রহ আমরা বিসর্জন দিলাম। সর্বব্যাপ্ত যে প্রাণ আছে, সেই প্রাণের ধারা থেকে ঘটে প্রতিষ্ঠা করছে কে? জাগ্রত প্রাণের অনুভূতি-দীপ্ত সাধক করছে। সেই প্রাণের ধারা থেকে নিয়ে বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলাম, তাকে পুজো করে আবার হৃদয়ে বিসর্জন-প্রতিষ্ঠা করলাম। প্রথমটা ঐতিহ্যময় প্রাণের ধারা-গঙ্গা, আর দ্বিতীয়টা অন্তঃপ্রাণের ধারা। পূজান্তে যা ছিল বাইরে, তা এল ভেতরে-আরও উজ্জ্বল, আরও সুন্দর, আরও জীবন্ত হ'ল। সেইজন্য যে পুজো করে, সে সর্ব অঙ্গে দেব বা দেবীকে আবাহন করে। ন্যাস বলে না। মূলমন্ত্রকে বিশ্লিষ্ট করে, তার পর সর্ব অঙ্গে সর্বাত্মক আবাহন করে, আবার সংশ্লিষ্ট সেই প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। পুজোর যে দর্শন, তার ভাবানুবাহী হচ্ছে পুজোর পদ্ধতিগুলো।

চণ্ডী

অনেক জায়গায় চণ্ডীর একটা পদ সবাই উদ্ধৃত করে, বড় বড় সভা-সমিতিতে ভাষণ দেয়—'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'। চণ্ডীতে মাকে যখন অসুর বলল—আমি তো একাই যুদ্ধ করছি আর তুমি এত সব দেবীদের নিয়ে যুদ্ধ করছ! তখন মা অট্টহাস্য করে বলছেন,—এই ত্রিভুবনে আমি একাই আছি, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই, তুমি যে এত দেখছ, সে তোমার অজ্ঞান বা ভ্রান্তিবশত। এই দেখ আমার মধ্যে সব সংহৃত হচ্ছে। এই বলে তিনি সব নিজের মধ্যে সংহৃত করে নিলেন। এই যে একের কথা, এটা অদ্বৈত তত্ত্বের কথা বলে অনেকের আহ্লাদ হয়। কিন্তু এটা পরিষ্কার ভাবে মনে রাখা দরকার যে, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ আর শাক্তাদ্বৈতবাদ, দুটো একেবারেই দু পাড়ার কথা। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ মায়া অদ্বৈত বলা যেতে পারে। সে অদ্বৈতে শক্তির কোন স্থান নেই। অপর দিকে শক্তিবাদ সমর্থিত অদ্বৈতবাদ, সেটা শাক্তাদ্বৈত বা শিবাদ্বৈত যাই হোক না কেন তাদের মধ্যে অমিল সামান্যই। এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, পণ্ডিত, আচার্য, গবেষক, সাধক, যে ভাবেই বলা যায়, যার কাছাকাছি কোন বিদ্বজ্জন ইদানীংকালে দেখিনি,—সেই ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ বলছেন—ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার শ্রেষ্ঠ উপাদান এই শক্তিবাদ সমর্থিত অদ্বৈতবাদ। এর উপরে কোন সাধ্য-সাধন তত্ত্ব বা দর্শন আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বলছেন, কোন তর্কে এর মীমাংসা নেই, এ অধ্যাত্মশাস্ত্র। চরম জ্ঞানের কথা এই শাক্তাদ্বৈতবাদে এবং শিবাদ্বৈতবাদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাব্য করে ওঁনারা বলেন—নির্বিশেষের পরেও আমার মহেশ-মহেশী। মহাযোগীর বুত্থান-সামর্থ, এও তো মহাশক্তিরই।

মন্ত্রমালা

মূল মন্ত্র, তার সঙ্গে সম্পর্কিত মন্ত্র। যেমন বর্ণালী হয় না? একটা ধর লাল, একটা হলুদ। কিন্তু কোন চিহ্ন নেই। অনেক হেরফের হবে, লালের কাছাকাছি। লাল একটা চূড়ান্ত ধরছি। আবার যখন অন্য বিশেষ রঙের দিকে যাচ্ছি, তরঙ্গগুলো একটা বিশেষ

জায়গায় যাচ্ছে, আবার সেইরকম নেমে আসেছে। আমার দৃষ্টিতে আমি সেটাকে দাগ দিচ্ছি এটা লাল, এটা নীল, এটা হলুদ। আমার সচেতনতা লাগছে। কিন্তু বস্তুত ব্যাপারটার মধ্যে তরঙ্গ বিন্যাস ছাড়া কিছু নেই।

তেমনি মন্ত্রমালার ব্যাপারটা এই। মূল মন্ত্র ওঁকারকে ঘিরে সেই সমস্ত মন্ত্রের আবর্তন চলছে। তার মধ্যে বিশেষ একটা দিক তুলে ধরছি—কোনটা কালী, কোনটা দুর্গা। আর বিভিন্নরকম মন্ত্রে দাগ দিচ্ছি। এক একটা দাগ, তার আশেপাশের মন্ত্র আছে। তার মানে, আমি যেটাকে কালী মন্ত্র ধরছি, সেটা একটা দিক ধরে বললাম। তার কাছাকাছি মন্ত্রগুলো ঘুরছে। মন্ত্রের আবর্তন তো হচ্ছে। যার জন্য সমস্ত মন্ত্রের সঙ্গে ওঁকারের তরঙ্গ এসে যায় বা ওঁকার এসে যায়। আমি বলি এটা দুর্গা মন্ত্র। কিন্তু দুর্গার সম্পর্কিত অনেক মন্ত্র আছে। যার জন্য হোম পদ্ধতিতে বা বিশেষ বিশেষ পূজোয় আনুসঙ্গিক মন্ত্র সমস্ত ব্যবহার করা হয়। এই যে পৌরাণিক বা তান্ত্রিক পুজোতে দেখ অঙ্গ দেবতা, আবরণ দেবতা, পার্শ্ব দেবতার পূজো হচ্ছে, এইগুলোর মূল ভাবনা হচ্ছে, আমি একটা মন্ত্র ধরছি, কিন্তু তার আশেপাশের সম্পর্কিত মন্ত্রও এসে যায়-এসব পুজো বা হোমে। এমনকি দুটো দিক আছে। একটা-মূল মন্ত্রকে ভেঙে ভেঙে মন্ত্র আসছে, আর একটা মূল মন্ত্র সম্পর্কিত মন্ত্র আছে। মূল মন্ত্রকে ভেঙে মন্ত্র-যেমন হোমকুণ্ড যন্ত্রে মূল মন্ত্র থাকছে, আর আশেপাশে ভেঙে ভেঙে মন্ত্র হচ্ছে। এটা একটা দিক। তেমনি মূল মন্ত্র এবং তার আশেপাশের গুলো সম্পর্কিত মন্ত্র। এইগুলোও মূল মন্ত্র, প্রত্যেকটাই মূল মন্ত্র, কিন্তু আশেপাশের গুলো সম্পর্কিত মন্ত্র, যখন আমি একটা মূল ধরছি। একদিক দিয়ে মূল বলতে কিছু নেই। দেহশুদ্ধিগত ন্যাসের অনুষ্ঠানে মূল মন্ত্রের ভাঙা মন্ত্র। আর আবরণ বা পার্শ্ব দেবতা বা দেবীরা সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের মন্ত্র। হোমে আমরা যে মন্ত্র করি, যন্ত্রের ভেতরে, পাপড়ির ভেতরে মূল মন্ত্র থাকে, পাপড়ির সমাহার টাটে। সমস্ত মন্ত্রই মূল মন্ত্রের বিকীরণ। কাজেই সমর্থ সাধক মন্ত্রের উজান স্রোতে যথার্থ ভাবে মূল মন্ত্রের অধিকার লাভ করে। যথার্থ বললাম এই জন্য যে, মন্ত্র জপ করলেই মন্ত্রের মূলগত স্পন্দন বা তরঙ্গের অধিকার অনেক সময়েই আসে না, সেই দিক দিয়ে এই সমস্ত বিচ্ছুরিত মন্ত্র, নাম বা মন্ত্রমালা সাধককে সেই সামর্থের দিকে নিয়ে যায়। মন্ত্রের রেশ ছড়িয়ে গেলেও, মন্ত্রের আড্ডা মহামন্ত্রের ঘরে।

হিন্দু দেবদেবী

আমরা এই নর-বিগ্রহ বা স্থূলদেহ পাই, এর দ্বারা সাধন-ভজন করে ঈশ্বরলাভ করব এই উদ্দেশ্যে। কোথা থেকে পাই? বাবা-মা'র কাছ থেকে। মা, বাবার তাঁদের ইচ্ছা দ্বারা সৃষ্টি করেন এই স্থূল দেহ।

এখন সৃষ্টির ক্রমোর্ধ পরিণাম হিসাবে, এই মায়িক সত্তার ভিতরেই পারমার্থিক সত্তা লুকিয়ে আছে। যার জন্য আমরা খুঁজে পেতে চাই আপন স্বরূপকে।

নিত্যকালের জন্য দেব-দেবীদের সৃষ্টি করেছেন মুনি, ঋষিরা, যাঁরা স্বরূপ-স্থিত হয়েছেন। এই সৃষ্টি সূক্ষ্ম ভাব জগতের। সাধারণ মানুষের থেকে এই সব মুনি-ঋষিরা অনন্তগুণ শক্তিশালী সুতরাং তাঁদের সৃষ্ট দেব-দেবীরাও যে মনুষ্যকৃত স্থূল সৃষ্টির তুলনায়

অনন্তগুণ শক্তিশালী হবে, তাতে সন্দেহ নেই। ঋষিদের মধ্যে অজ্ঞান-অবিদ্যার লেশমাত্র নেই। তাঁরা সচ্চিদানন্দময়। সুতরাং তাঁদের ইচ্ছা বা সৃষ্টির মধ্যেও সেই প্রজ্ঞান এবং কল্যাণ-ইচ্ছা কাজ করে। সেই হিসাবে তাঁদের সৃষ্টি ও করুণাঘন সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। মানুষকে পরমার্থের পথে সাহায্যদান করা ও তাদের আত্ম-সাক্ষাৎকার পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই সমস্ত দেব-দেবীরা বিরাজ করছেন—তাঁদের লীলা বিস্তার করছেন। দেব-দেবীরা যে কতটা জীবন্ত, যারা একবার সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছে তারা জানতে পারে। একটা অপূর্ব-পাথরের মূর্তি আমরা বলি, আহা যেন জীবন্ত! যেন জীবন্ত বলি, সেটা আমাদের স্থূল দেহের তুলনায়। পাথরের মূর্তি যেমন জীবন্ত নয় স্থূল দেহের কাছে, তেমনি যারা দেব-দেবীর সাক্ষাৎ দর্শন পায়, তারা জানে দেব-দেবী এতটাই সত্য, এতটাই জীবন্ত যে, সে তুলনায় মানুষ দেহ মৃতবৎ। অর্থাৎ কতটা জীবন্ত তাঁরা, ভাব।

দেব-দেবীদের অধিষ্ঠান ভাব রাজ্যে। যখনই ভাব, তখনই রূপ-গুণ; তখনই দ্বৈত। ভাব, অর্থাৎ দ্বৈত, তার পারে অদ্বৈত। এই সব দেব-দেবীদের আরাধনার ফলে তারা ভাবরাজ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন, অর্থাৎ দ্বৈত ও অদ্বৈতের সীমানায়। সাধনার সীমা বা চরিতার্থতা এক হিসাবে এখানেই॥ এরপর সাধনা বা উপলব্ধি এগিয়ে চলে আপন স্রোতে।

সাধক যখন দেব বা দেবীর প্রথম দর্শন পায়, তখন ভাবরাজ্যে প্রবেশ করল বুঝতে হবে। কি দর্শন পেল, কি হল, তা বোঝার জন্য সাধনা করে যেতে হবে। কঠোর সাধনার দ্বারা যখন ভারাজ্যের শেষ সীমানায় পৌঁছে সেই জ্ঞানের আভাস পাবে, তখন আপনা আপনিই গাড়ি চলতে থাকবে। কথাটা এই, একটি ভাব ধরে, সর্বভাব। তার পরেই ভাবাতীত। তাই গোরক্ষনাথ বিবেকমার্তণ্ডে বলেছেন 'ভাবাভাব বিনিমুক্তং, নাশোৎপত্তি বিবর্জিতম'।

অবতার-মিলনভূমি

কৃষ্ণ অবতারে ব্রাহ্মী স্থিতির কথা বলেছেন। সুখ, দুঃখ কিছুই নেই সেখানে। শান্ত স্থিতি। তা বলে কি মানুষের প্রেম ভালোবাসা থাকবে না? রামচন্দ্র ভগবান হয়েও মানুষ। দেবত্বের যা কিছু মহত্ব অধিক তাঁর মধ্যে, মানুষের যা কিছু মহত্ব, অধিক তাঁর মধ্যে। ভাগবত্তার যা কিছু, মানুষের যা কিছু। দুই-এর মিলনভূমি অবতার। বাবার কথায় বনবাসে গিয়েছিলেন। বনবাসে পাঠানোটাই তো অন্যায়। দ্বিতীয় স্ত্রী অসুখে সেবা করেছিল, তাকে বলেছিল, বর চাইলে বর দেবে। কি বর চাইল? রামকে ১৪ বছরের জন্য বনবাসে পাঠাও। তাহলে তার ছেলে ভরত রাজা হতে পারবে। কি ভয়ংকর জিনিস। সে যে ফিরে আসতে পারবে তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু রামচন্দ্র বলেননি—আমি তো কোন অন্যায় করিনি, আমাকে কেন বনবাসে যেতে হবে? —ভগবানের স্থিতপ্রাজ্ঞের কথা হল তো? পিতৃসত্য পালনের জন্য পরম ঔদাসীন্যে রাজসুখ আর বনবাসের দুঃখ এক করেছেন। মানুষ হিসাবে সামাজিক মূল্যবোধ আর পারমার্থিক প্রাজ্ঞতায় সুখ-দুঃখকে সমজ্ঞান করেছেন। লোকাচার মেনে নিয়েছেন। তৎকালীন প্রশ্নাতীত ব্যাপার। মানুষ রামচন্দ্র সীতার জন্য কেঁদেছেন, বিলাপ করেছেন যে—একটা অসহায় নারী আজ আমার ভাগ্যদোষে শত্রুর কবলে পড়েছে। মানুষের প্রেম ভালোবাসা,—সেটাই তুলে ধরেছেন।

আবার সীতা-বিহনে অন্তরে সোনার সীতাকে প্রতিষ্ঠিত করে বাইরে কঠিন-কঠোর কৌমার্যের ব্রত—এ আদর্শ সব যুগে সব দেশেই বিরল। ঠাকুর বলেছেন—'বলেছি বাহ্যে যাব, তো যেতেই হবে।' লৌকিক ভাবে মানুষের কাছে ছোট-খাটো সত্যকেও মর্যাদা দিয়েছেন। তেমনি শ্রীরামচন্দ্র সেই দেশে সেই কালে যা প্রচলিত, যা স্বীকৃত, সেই অতি খণ্ড, অতি তুচ্ছ এতটুকু একটু সত্যকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন—নিত্যকালের আসরে অগণিত মানুষকে এই উপলক্ষই একদিন মহা-লক্ষের দিকে নিয়ে যাবে। কেননা তিনি তো পারমার্থিক সত্য আর লৌকিক সত্যের মিলনভূমি, তাঁর মধ্যে দুটো দিকই থাকবে। একটা, যেখান থেকে তিনি এসেছেন, আর যেখানে এসেছেন। যেখানে মানুষ আছে, আর যেখানে তাকে নিয়ে যেতে হবে।

কত সুন্দর আদর্শ। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন—নারায়ণের চারটে রূপ। চারটে রূপের মধ্যে দিয়ে পারমার্থিক সত্য বারবার উদ্ভাসিত হয়েছে। মানুষের যা কিছু কুটিলতা, যা কিছু হীনতা, তার মধ্যে থেকেও মহত্তম আদর্শ প্রকাশ পাচ্ছে। রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে গেলেন। সীতা, লক্ষ্মণ, বিনা দ্বিধায় তাঁর অনুগামী। আর এদিকে ভরত—যে পরোক্ষ কারণ, যাকে নিয়ে, যার জন্য এত কাণ্ড হল, সে আরও এক মহত্ব স্থাপন করে গেল। অবতার লীলার বৈশিষ্ট্য এই। এই পৃথিবীর পবিত্র-মহত জীবনগুলো এমনি করেই সমস্ত বিরূপতার মধ্যে দিয়েও অম্লান-মহিমায় ফুটে ওঠে।

সতীপীঠ

শাস্ত্রে আছে—'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে'। পূর্ণের যা কিছু প্রকাশ সব পূর্ণই। অপ্রাকৃত জগতে যা পূর্ণ, প্রাকৃত জগতে তাই যেন খণ্ডিত, অংশভূত। তাই রূপ-ভেদে বহু-বিচিত্র প্রকাশ। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, এই প্রাকৃত জগতে এই যে খণ্ডিত বিচিত্র প্রকাশ, লীলায় আবার তাই পূর্ণতা পরিগ্রহ করে। যার জন্য যেমন বলা হয়,—সেই সতীর অপ্রাকৃত শরীর যখন বিষ্ণুচক্রে ৫১ খণ্ডে খণ্ডিত, পতিত হল, প্রতি খণ্ড যেখানে পতিত হয়েছে তাই পূর্ণ শক্তিমান, সেখানেই পূর্ণ শক্তিময়ী মা তাঁর পরিপূর্ণ রূপে, পূর্ণ-জ্ঞান-প্রেম-আনন্দে বিরাজ করছেন। আর শিবও তাঁর পরিপূর্ণ স্বরূপে বিরাজ করছেন। ৫১ সতীপীঠের প্রতিটি পীঠই পরিপূর্ণ সত্তায় প্রকাশমান ভাগবতী লীলায়। শিব যখন শান্ত, সতী তখন প্রেম-নিবেদনে তৎপর। আর সতী যখন শান্ত, শিব তখন তাঁর প্রেমে উন্মত্ত, অধীর। তাই দেখি সতীর শান্ত শরীর নিয়ে শিব উন্মত্ত হয়ে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করে নৃত্য করছেন। আবার লীলার তরঙ্গে যখন সতীপীঠের সৃষ্টি হয়, সেখানেও শিবের পূর্ণ অধিষ্ঠান। শিবের যে প্রেম সতীর প্রতি, এ চিরন্তন প্রবহমান। তাই আজও যারা জড়তার বন্ধন-মুক্ত হয়ে চিন্ময় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, যারা সৎ-এর সাধনায় মগ্ন, তাঁরা শিবের প্রেম তরঙ্গে সতীপীঠে ছুটে আসে, সেই মহা সতীর অনুগামী হয়ে। শিব-শক্তির প্রেম ও সামরস্যে হয় রসায়িত। শাস্ত্রবচন শুনতে পাই—'উন্মত্ত ভৈরবং যত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়কম'।

তারাপীঠ ঋষি-পীঠ, ঋষির স্থান। মহাসিদ্ধ স্থান। বশিষ্ঠ ঋষির স্থান। ঠাকুর বলতেন—ঋষিদের মধ্যে আবার দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, এসব আছে। উনিই আবার বামদেবের রূপে এসে জাগিয়ে দিয়ে গেছেন। গমগম করছে।

প্রতীক প্রাণী

(কতকগুলো প্রাণী বিশেষ বিশেষ অর্থের প্রতীক আমাদের ভারতীয় ভাবনায়। পরেশনাথজীর বিগ্রহ দ্যাখা যায় বেদীতে একটি ফণা বিস্তার করা সাপ, মাথায় ওপরে অনন্ত সাপের ফণা-বিস্তার। ভারতীয় যোগ ভাবনায় সাপের প্রতীকত্বের সঙ্গে জৈন মুনি ধর্মের এই সৌন্দর্যময় অলংকরণ সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। ষাঁড় ধর্মের প্রতীক, তার অনমনীয় দৃঢ়তার জন্য। গতিমান ঘোড়া প্রাণের, প্রাণশক্তির প্রতীক। প্রাচীন ভারতীয় ভাবনায় হরিণ তার গতিময়তার জন্য আশু ফলদানের ভাবনায় আনা হয়েছে। সেজন্য পূজা বা হোম-যজ্ঞাদি কর্মে মৃগ-মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত। বৌদ্ধ যুগে গতিমান ঘোড়া। হাতি প্রাচুর্য বা সমৃদ্ধির প্রতীক। এটা জাগতিক অভ্যুদয় বা পারমার্থিক। দুটোই হতে পারে। মহাবলীপুরমে দেখবেন ছোট টিলা আছে, ওখানে মুনি-ঋষিরা তপস্যা করতেন। মুনি-ঋষিদের কিছু কিছু মূর্তি, হাতির মূর্তি খোদাই করা আছে। অনেক দিব্য স্থানে দেখবেন হাতির মুখ বা হাতির মূর্তি খোদাই করা। বুদ্ধদেব যখন জন্মালেন, গণতকাররা এসে গণনা করল। তারা মায়াদেবীর স্বপ্নের দুটো জিনিস গুরুত্ব দিল। রুপোর মত সিংহ দেখলেন, আর সাদা হাতি। সিংহ হচ্ছে পশুরাজ। যদি উজ্জ্বল বিরাট সিংহ দেখে তাহলে বিরাট রাজা হয়, আর যদি কালো হাতি দেখে তাহলে প্রাচুর্য হোত। সাদা হাতি অধ্যাত্ম ঐশ্বর্যের প্রতীক। তারা শেষে শুদ্ধোধনকে আশ্বস্ত করেছিলেন। যদি রাজা হয় খুব বড় রাজা হবে, আর ধর্মপথে এলে অনেক বড় ধর্ম প্রবর্তক হবে, জগতের মানুষকে আশ্রয় দেবে।

সনাতন ভাবধারায় হাতির অন্য একটি প্রতীকত্ব আছে, তা হোল—মনঃশক্তির প্রতীক। কেননা সংযত মন মহাশক্তির আধার হয়ে ওঠে।

গণেশ সিদ্ধিদাতা, তাঁর মুখ হাতি, এখানে অন্য একটা দিক—। বিভিন্ন ভাবের গণেশ আছে। পঞ্চমুখি গণেশ, নানারকম গণেশের দর্শন পায়। গণেশের মুখটা সাদা, দেহটা লাল। এই গণেশ যখন সাধককে দর্শন দেয়, তখন তা ঐশী করুণার ধারা বুঝতে হবে। সাধকের পূর্ব-জন্মার্জিত তপোবলে, এই জন্মের তপস্যা তার দরজা খুলে দ্যায়। তুমি এবার এগোও এই স্তরে। —যখন গণেশের পূর্ণাবয়ব লাল, তখন সাধক সাধনার প্রথম স্তরে, আর যখন সাধক দর্শন করে, মুখটা সাদা, দেহটা লাল তখন দ্বিতীয় স্তর। আর দর্শনের চরমে পূর্ণ সাদা বা শুভ্র গণেশের দর্শন পায়। শিবের গায়ের রঙ যা তাই। সাধক নির্বিশেষ স্তরে চলে যাচ্ছে। সেখানে গণেশের স্তব—'চৈতন্য রূপং জগদাদিবীজম।' এখানে গণেশ একদিক দিয়ে গুরু, গুরু গণেশ। নৈষ্ঠিক সাধনার প্রথমে বাম দিকে গুরু পরম্পরা স্মরণ করা হয়েছে, ডান দিকে তার করুণার ধারা দেখানো হয়েছে গণেশ স্বরূপ। দেখ গুরু গণেশ পাশাপাশি দুদিকে রাখা হয়েছে। গুরু কৃপায় গণেশ সিদ্ধি।)

মুণ্ডমালা

☆ গানে আছে—'ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথা পেলি।' এর মানে কি?

☆☆ এর মানে, কালী সাকার, আকার, নিরাকার। মায়ের যে সাকার, সবিশেষ, সগুণাত্মক রূপ, এর অতীত নির্বিশেষ, নির্গুণাত্মক রূপ আছে, পরম অব্যক্ত, সেটাই

বলছে—'ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথা পেলি'। যখন ব্রহ্মাণ্ড ছিল না, তখন মুণ্ডমালাও ছিল না, তিনি তখন নির্বিশেষ। কমলাকান্তের বলার ঢঙটা এই।

★ মুণ্ডমালার মানে কি?

★★ তুমি একটা মানে কর—রাগী মেয়েছেলে, মুণ্ডগুলো কেটে কেটে মালা করেছে। সাধকদের মনের যে জ্বালা, ইষ্টের এমন রূপ না হলে মানাবে কেন? মুণ্ডমালার অনেকে অনেক রকম মানে করে। এক মতে—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। বারবার এই বিশ্বপ্রকৃতি কল্পান্তে বিলীন হচ্ছে। এক একটা কল্পের এক একটা স্মৃতি এক একটা মুণ্ড। আবার লীলাকথা আছে—মা অসুর নিধন করে, অসুরদের পাণ্ডাদের মুণ্ডুগুলো দিয়ে মালা করে পরেছেন। আর একটা মানে করেছে—সমস্ত বর্ণের মধ্যে তিনি আছেন। 'কালী পশ্চাৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম রটে।' বর্ণময়ী যে মা, বিশ্বপ্রকৃতি এই বিভিন্ন বর্ণের দ্যোতক এক একটা মুণ্ডু। আর কল্প-কল্পান্তের যে সৃষ্টি, স্থিতি বারবার বিনাশ হচ্ছে তো, মা আমার অনন্তকাল স্বরূপিনী-শিবজী কালাতীত অব্যক্ত। বিন্দুবাসিনী হয়ে মা পার করবেন। মানেটা গভীর। এইজন্য এই গানেই আছে—মহাকালের মনমোহিনী।

সাধক মায়ের রূপ অনুভব করবে তো ভেতরে। সাধকরা যখন সাধারণ ভাবে সিদ্ধ হয়, তখন জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি জেগে ওঠে। আর ঈশ্বর কোটি মহাপুরুষরা যখন মহাসিদ্ধি লাভ করেন, তখন তাঁদের কল্প কল্পের স্মৃতি জাগ্রত হয়। মা তো তখনই মা, যখন সাধক তাঁকে অনুভব করছে। সেদিক থেকে এই কল্প-কল্পান্তের স্মৃতি বা জন্মান্তরের স্মৃতি, এ অনুধাবনযোগ্য। মহাত্মারা তো মায়ের কোলে আশ্রয় পেয়েছেন। যদি মাকে অন্তরে-বাইরে আস্বাদন না করে, তাহলে কিসের মা? বিশ্বপ্রকৃতি একদিন বিলীন হয় পরা-প্রকৃতিতে, পরা প্রকৃতি একদিন বিলীন হয় অব্যক্তে। মা যখন করুণা করেন, তখন সমস্ত রহস্য সাধকের কাছে উদঘাটিত হয়। সেদিক থেকে এই মুণ্ডমালা অবাধিত স্মৃতির দ্যোতক।

যে অপ-সত্তাটা আমার মধ্যে পরাজিত হচ্ছে, সেটাই আমার বিজয়। সেটাই আমার গৌরব, আমার বিজয়মাল্য। কাম হচ্ছে আমার মধ্যেকার অসুর। কাম যদি পরাজিত হয়, তাহলে সেই পরাজিত কামশক্তি মহাশক্তিতে বিলীন হচ্ছে। সেটাই আমার জয়মাল্য। তেমনি অহং তাড়িত সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি যখন আমার কাছে উৎপাত, আমার কাছে অসংযত, আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তখন সেটা অসুর। যখন আমার কাছে পরাজিত হয়ে মূলীভূত শক্তিতে একীভূত হচ্ছে, তখনই সেটা আমার বিজয়মাল্য। আদ্যাশক্তি স্বরূপকে আত্মস্থ করেই সাধনার পূর্ণতা। মায়ের সন্তান, সন্তানের মা সেখানে একাকার।

মা কালী

জগত ব্যাপারে আমাদের দীর্ঘ সম্বন্ধজনিত আসক্তি বা বিরক্তির কারণে আমাদের মন, বুদ্ধি জগত ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে আছে। এখান থেকে সরে গিয়ে পরমার্থ বোধে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তাহলে, জগত ব্যাপার আমাদের মন থেকে লয় হতে হবে। যেখানে যত আসক্তি, বিরক্তি আছে সমস্তই শূন্যে বিলীন হতে হবে। বেদে একে বলেছে রুদ্র।

আর, আমরা বাংলার ঘরে একে বলেছি কালী। বস্তুত কালীকে যদি রুদ্রাণী বলা হয়, তাহলে ঠিক আছে। কালী হচ্ছে বিনাশের দেবী—মোটা কথায়। আর, একটু ভালো ভাষায়—লয় বিদ্যা। কালী বিদ্যা হচ্ছে লয় বিদ্যা। কালী সব কিছু লীন করছে। 'সর্বাঙ্গ ভূষাবৃতাম।' সাদা সব কিছু প্রতিহত করে, কালো সব কিছু গ্রাস করে। কলন করা—গ্রাস করা। কলয়তি ইতি কালী। তিনি কালী, অনন্ত কালো চুল ব্যাপ্ত করে আছেন। আমাদের সমস্ত জগত-চেতনা, সমস্ত আসক্তি লয় হচ্ছে, লীন হচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে।

আমরা আমাদের যজ্ঞে রুদ্রের আবাহন করি। যখন আগুনটা জ্বলে ওঠে। যে সমিধ স্থাপন করি, তা হচ্ছে আমাদের দেহবোধ। দেহ অভিমান। কর্পূর হচ্ছে মনঃস্থান—যা উবে যাচ্ছে। আগুনের শিখাটা জ্বলে ওঠে, আমরা আবাহন করি সেই ভাবে। —'রুদ্রায় বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ, রুদ্রায় বহ্নি চৈতন্যায় নমঃ'। অগ্নি সব কিছু গ্রাস করে কিনা। হে রুদ্র স্বরূপ, তুমি অগ্নি মূর্তি হয়ে আবির্ভূত হয়েছ। অগ্নি কি করছে? সমিধ গ্রাস করছে, ভস্মীভূত করছে। আর, দেহ স্বরূপ যে সপ্ততল সমিধ, তাকে গ্রাস করছে দিব্য অগ্নি। আবার যখন অগ্নির শিখা লেলিহান হচ্ছে, তখন আমরা সপ্ত জিহ্বার নামে আহুতি দিই। তার অন্তিম নামটি হচ্ছে বিশ্বরুচি। আহা, বিশ্ব ব্যাপারেই তার রুচি, বিশ্বগ্রাসী কিনা। হে অগ্নি রূপে রুদ্র, তোমাকে আবাহন করছি। রুদ্রাগ্নি রূপে তুমি আমাদের দেহ-মনের আসক্তি সব গ্রাস কর।

রবীন্দ্রনাথের গান আছে

'আগুন আমার ভাই, আমি তোমারই জয় গাই।
তোমার শিকল ভাঙা এমন রাঙা রূপ তো দেখি নাই।'

জগত বোধের, স্থূলতার বা আসক্তির যে শিকল, সেই শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে-বেঁধে রেখেছে মনঃশক্তিকে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলছেন, 'শিকল ভাঙা এমন রাঙা রূপ তো দেখি নাই।' অরবিন্দ বলছেন, 'হে পাবকশিখা, মধ্যাহ্নের তেজ তুমি দিতেছ আনিয়া।' আগুনের পাবক নাম শোধনকারী অর্থেই। যজ্ঞকুণ্ডে নৃত্যপরায়ণা অগ্নি শিখা—ঋষিদের দেওয়া প্রিয় নাম—কালী, করালী, মনোজবা।

এই আমরা আবাহন করি বিনাশের দেবী। যার জন্য এই কালী রূপ, আর তার পূজা হয় রাত্রিতে। কেন? জগত বোধ সেখানে তিরোহিত। 'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন, গগন অন্ধকার, কে দেয় আমার বীণার তারে এমন ঝঙ্কার।।'

অমারিত্রিতেই তো আমরা মায়ের পুজোয় বেশী করে মেতে উঠি। মহা অন্ধকারে আবৃত হচ্ছে। আমাদের ভরদ্বাজ ঋষির মেয়ে রাত্রিদেবী রাত্রিকে আবাহন করছেন। যখন জগত বোধ চলে যাচ্ছে, তখন বলছি, হে পরমাত্ম-স্বরূপ, তুমি আমাদের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হও। কুশিক ঋষি, ঋক্‌বেদের প্রথম দিকের ঋষি, তিনিও ঠিক একই ধরনের মন্ত্র বলেছেন। ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১২৭ তম মন্ত্রে বলেছেন, রাত্রিতে শ্রান্ত, ক্লান্ত বা তাপিত মানুষ যেমন নিদ্রার কোলে আশ্রয় নিচ্ছে, তেমনি ব্রহ্মচেতনায় মানুষ তাঁর আশ্রয় নেবে। তোমার চেতনায় জগতকুল শান্তি পাবে। চণ্ডীতে আছে, চিতি রূপে তোমাকে নমস্কার।

কিন্তু হয়েছে কি, যে পরম মঙ্গলের জন্য কালী মূর্তির প্রচলন, কালী মূর্তির পুজো-আচ্চা, পরবর্তীকালে কিছু গায়ক, কবি, এরা কালীকে খুব ঘরোয়া ক'রে ফেলেছেন, কালীর যে প্রলয়ঙ্করী রূপ, বন্ধন বিনাশের রূপ, সব কিছু গ্রাস করে ফেলছেন এই রূপের বদলে পরম কোমল, শান্ত, কান্ত রূপ আনা হয়েছে। কালী হয়ে গেছে ঘরের মেয়ে। সুন্দরী তো বটেই। কিন্তু শাস্ত্র মুখে মায়ের রূপ ঘোরা। সুন্দরী নয়, করাল বদনা। শান্ত নয়, মহারবা। মহারব-যে রবে সব রব বিলীন হয়ে যায়। ঘোররূপা যে রূপে সব রূপ স্তিমিত। তিনি স্পন্দিত হচ্ছেন, আর সব গ্রাস করছেন, তাই ঘোর। বালার্ক মণ্ডলাকার, নবোদিত সূর্যের ন্যায় রক্তবর্ণ তাঁর চোখগুলি।

এই যে মায়ের বিকট রূপ তা, আমাদের শাস্ত্র নির্দিষ্ট। মন্ত্রে আছে, 'সৃক্কদ্বয় গলদ্রক্ত ধারা বিস্ফুরিতাননাম্'। নিরন্তর রুধির পান করছেন, বিরাম নেই। কষ দিয়ে গলে গলে পড়ছে রুধির। রক্ত কামনার প্রতীক। এই রূপ আজকালকার দিনের ভদ্রলোকেদের খারাপ লাগে। এই বিভৎস রূপ ভালো নয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত প্রাচীন শাস্ত্রে যে বর্ণনা আছে, তা ভয়ঙ্করী, ভীষণা রূপ। 'শ্মশান বাসিনীং ধীমহি.........'। তাঁর স্থান শ্মশানে। রামপ্রসাদ বলছেন—

'আর কোন সাধ নাই মা চিতে,
চিতার আগুন জ্বলছে চিতে,
চিতাভস্ম চারিভিতে, রেখেছি মা আসিস যদি।'

চারিভিতে চারদিকে। চিতাভস্ম তাঁর প্রিয়। যখন দেহ শেষ হয়ে যায়, তখন শরীর চিতাভস্ম। তেমনি আমাদের সর্ব আসক্তি যখন গ্রাস হয়ে যায়, তখন তা চিতাভস্মই বটে। এখনো রুদ্র স্বরূপ উজ্জয়িনীর মহাকাল বিগ্রহকে চিতাভস্ম মাখিয়ে আরতি করা হয়। রামপ্রসাদের অন্য গানে—

'শ্মশান ভালোবাসিস বলে মা শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি।।'

এই শ্মশান আমাদের বিশ্বচেতনা যেখানে বিলীন। আমাদের সমস্ত লোভ, স্বার্থ, কামনা-বাসনা, হিংসা, বিদ্বেষ, জগতের যা কিছু মল সেখানে ভস্মীভূত।

স্বামীজী কটাক্ষ করেছেন, ব্যাঙ্গ করেছেন, 'মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায় ভয়ে ফিরে চায়—নাম দেয় দয়াময়ী। মুণ্ডমালা পরিয়েছি, পরিয়ে আবার নিজেরাই আতঙ্কিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি,' দয়াময়ী নাম দিয়েছি। বস্তুত তিনি করুণা এদিক দিয়ে নয়, ঐদিক দিয়ে করেন। তিনি এমন কিছু করেন না, যাতে আমরা আরও বাসনায় জড়িয়ে যাবো। তাঁর করুণা মুক্তি দিতে, আমাদের অজ্ঞানের বন্ধন ঘোচাবার জন্য।

এতক্ষণ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটা কবিতা সবাইকার ভালো লাগবে। সেটা হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের' কালী দি মাদার' কবিতা।—

'কালী, করালী তোর নাম, মৃত্যু তোর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে।
তোর ভীম চরণ নিক্ষেপে প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।'

জগতের আসক্তি তারই মৃত্যু। তিনি মৃত্যু ভয় থেকে মুক্তি দিতে এসেছেন। তাঁকে আবাহন করছি। তিনি আমাদের দিকে যত এগিয়ে আসছেন, এগিয়ে আসার মধ্যে দিয়ে প্রতি পদক্ষেপে আমাদের মধ্যের মায়ার বন্ধন মোচন করছেন। তাই তাঁর স্বভাব।

'সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে।
কাল নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।'

পরমার্থের পথে চরম সততার সঙ্গে যে জীবনের সব কিছু দুঃখ, দৈন্য, মৃত্যুভয়কে অস্বীকার করতে পারবে সেই পাবে মায়ের চরণ। যা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র নির্দিষ্ট কালীরূপ তাকে নতুন করে বর্ণনা, প্রতিষ্ঠা করেছেন অত্যন্ত কাব্যময় করে, সুললিত ছন্দের মধ্যে দিয়ে। সাক্ষাৎ ভাবে মায়ের দর্শন পেয়ে লিখেছিলেন। স্বামীজীর এই কবিতা পড়লে আমাদের শাস্ত্রে যে কালী-রূপের বর্ণনা আছে, সেটা বোঝা যায়। পুরাণের যুগে গীতায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মহাকাল রূপের যে বর্ণনা আছে, তাও অবশ্যই খুব মেলে। 'যথা নদীনাং বহবম্বুবেগা' নদী যেমন তার বিস্তৃত জলরাশি নিয়ে প্রবল বেগে মহাসাগরে বিলীন হয়, তেমনি এই সৃষ্টি প্রবল বেগে তোমার দ্রংষ্ট্রা করাল বদনে বিলীন হচ্ছে।

মায়ের এই কাল নৃত্য যে উপভোগ করতে পারবে, সেই বীর সন্তান দ্রংষ্ট্রা করাল রূপের আড়ালে সুখ-প্রসন্না, স্মেরাননা রূপের অভয় আশ্রয় লাভ করবে।

অরবিন্দ একটা কবিতা লিখেছেন—' Space is the stillness of God, building his earthly abode'. স্থান আর কালের সীমার মধ্যে দিয়ে, বোধের মধ্যে দিয়ে আমাদের জগত-চেতনা। তিনি করুণা করলে এই বন্ধন আমাদের ঘুচে যাবে, 'সম্মোহিতং দেবী সমস্ত মেতৎ'। আবার—'ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ'। ভূতাকাশে আমাদের যে স্থিতি, সেটা ঘুচে গিয়ে চিদাকাশে আমাদের স্থিতি হবে। কালীর যে স্থান, কাল, সেটা ভূতাকাশ। কালীর পাশে স্বামীজী লিখে দিয়েছেন 'টাইম'। এই ভূতাকাশ থেকে করুণায় চিদাকাশে তিনি নিয়ে যাচ্ছেন। কাল থেকে কালাতীত মহাকালের সীমানায়। স্থান-কালের সীমা, জগত বোধ যেন ভাঙতে পারি আমরা।

মা দুর্গা

সৃষ্টির মূল কথা সংঘাত। শুভশক্তি আর অশুভশক্তির সংঘর্ষ। একজন সাধকের জীবনে একটা শুভ শক্তি একটা নিরপেক্ষ শক্তি আর একটা বিরোধী শক্তি আছে। তীব্র সাধন-সমরের মধ্যে দিয়ে তার সহায়ক শুভ শক্তি উদ্দীপ্ত হয়, নিরপেক্ষ শক্তি তার নিপেক্ষতা ভঙ্গ করে শুভ শক্তিকে সবল করে, আর বিরোধী শক্তিও বিপরীত সংঘাতে তার আত্মশক্তিতে বিলীন হয়। এটা ব্যষ্টি বা সমষ্টি যে দিক দিয়েই নাও।

মা দুর্গার দশ হাতে দশটি অস্ত্র আছে। আমাদের হিন্দু মতে দশটা দিক। তার মানে সর্ব শক্তি দিয়ে সংঘর্ষ হচ্ছে। এই সংঘর্ষের মধ্যে অশুভ শক্তি-অসুর যতক্ষণ বেঁচে ছিল ততক্ষণ মায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, যখন বিনষ্ট হল, তখন তার জ্যোতি মায়ের শরীরে বিলীন হল। যখন তার বিনাশ হল, তার আগে পর্যন্ত যুদ্ধ করেছে, বিরোধী শক্তির যা স্বভাব। একটা সাপকে টুকরো টুকরো করুন, যতক্ষণ নড়তে পারবে, ছোবল মারতে চেষ্টা করবে। একটা বাঘকে যতই ঘায়েল করুন, একটুখানি জীবন থাকতেও কামড়াতে যাবে। অশুভ শক্তির তাই স্বভাব, বিরোধিতা করবেই। কিন্তু যখন সে মরে গেল ত্রিশূলের আঘাতে, তার জ্যোতি মায়ের শরীরে বিলীন হল। অশুভ শক্তি মূলগত শুভ শক্তির মধ্যে বিলীন হল। এর মধ্যে হিন্দুদের শাস্ত্রের একটা বিশেষ দিক আছে। পৃথিবীর সব ধর্মে-ইসলাম, খ্রিস্টান সব ধর্মেই দুটো শক্তি আছে। আর আমাদের এখানে একটাই শক্তি

কখনো শুভ, কখনো অশুভ, কখনো নিরপেক্ষ প্রকাশ। সাধনা সামগ্রিকতার আসরে সে স্বরূপ শক্তিতে ফিরে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, মহাজনরা বলেন-মূলত শুভ শক্তির উদ্বোধনের জন্য আপাতবিরোধী শক্তির বিশেষ প্রয়োজন।

এটা তো শুধুমাত্র একটা মূর্তি নয়, এটা পাশ্চাত্য দর্শন নয়, সাধ্য-সাধনা পথ বেয়ে জাগ্রত জীবনদর্শন। একটা সাধকের জীবনে অন্তর্নিহিত পরিস্থিতির বিগ্রহীভূত লীলায়িত রূপ। কেউ ইচ্ছামত পরিবর্তন করতে পারে না। অসুর কখনো হাতজোড় করেছে মায়ের কাছে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত? তার এক হাতে ঢাল আর এক হাতে খাঁড়া। সে কি মায়ের কাছে সমর্পণ করেছে? করেনি। তাহলে তো অসুরের চরিত্রটাই নষ্ট হয়ে গেল। সংঘাত তার ধর্ম। সে স্বধর্মচ্যুত হবে কেন? শক্তির অশুভ প্রকাশ যখনই বিনষ্ট হল, তখনই মায়ের অঙ্গে বা মূলগত প্রবাহে বিলীন হল। অসুরের মৃত্যুর পর তার শক্তি, জ্যোতি স্বরূপে মায়ের মধ্যে, মহাজ্যোতির মধ্যে বিলীন হল। তার আগে পর্যন্ত যুদ্ধ করছে। অসুর হাত জোড় করছে, মা আশীর্বাদ করছেন, এটা যারা করছে তারা জীবনটাকে খুব মোলায়েম করে দেখছে। অশুভ শক্তিকে প্রচ্ছন্ন ভাবে সমর্থন করে বলেই একরকম করেছে। গীতার কথা, "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। চণ্ডীর কথা-'করিস্যাম অরিসংক্ষয়ম। আর স্বামীজীর কথা—পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার।

কিছু শক্তি আছে, যা বিরোধিতা করে না, সহায়তাও করে না। এই নিরপেক্ষ শক্তিকে বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলেছে, তটস্থ শক্তি। এই তটস্থ শক্তির স্বরূপ শক্তিতে পুরোপুরি বিলীন হয় কিনা, এই নিয়ে বৈষ্ণব শাস্ত্রে অনেক মতভেদ আছে। তটস্থ শক্তি বিলীন হলেই সাধক স্বরূপ পায়, তখন আর দাস ভাব থাকছে না। কিন্তু যারা শাক্তাদ্বৈতবাদী, তাদের কোন মতভেদ নেই এই ব্যাপারে। 'পাশবদ্ধ ভবেৎ জীব, পাশমুক্ত ভবেৎ শিবঃ। পাশমুক্ত জীবের আর কোন আগল নেই, তার অশুভশক্তি, নিরপেক্ষ শক্তি, সব শক্তিই বিলীন হচ্ছে মহাশক্তি প্রবাহে। যুদ্ধ। সত্যদেব বলছেন, সাধনসমর। 'দেখব মা হারে কি পুত্র হারে, আয় মা সাধন-সমরে। রামপ্রসাদ বলছেন-'মায়ের পোয়ে মোকদ্দমা ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে'। ধুম কি? এই যে তীব্র তপস্যা, তারই ধুম। সাধকের জীবনে ধুম পড়ে গেছে। যুদ্ধের। আপ্তকাম সাধক মায়ের চির চরণাশ্রিত হয়ে আর এক ধুমের কথা আছে- 'হৃদিকমলে বড় ধুম লেগেছে।

প্রতি জীবে জীবে সাধনা তো তাঁরই খেলা। মা দুর্গা ফুঁ দিয়ে নিমেষেই উড়িয়ে দিলেন-তা তো নয়। রীতিমত লড়াই হল। প্রতি জীবে জীবে মুক্তির সাধনা মায়েরই খেলা, মায়ের আস্বাদন। জগত তো সব মায়ের খেলা। মা চান সন্তান তাঁকে খুঁজে বেড়ায়। প্রত্যেক জীবে জীবে তিনি হারানো সন্তানকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ উপভোগ করছেন। জীব তলে তলে তার দিব্য সন্তান স্বরূপতায় পৌঁছে যাচ্ছে। চণ্ডীতে কি বলেছে? - মা, মহিষাসুর তো তোমার এই জ্বলন্ত তীক্ষ্ণ খড়্গের দিকে তাকিয়েই ঝলসে যেত, তোমার হাতের যে ঘণ্টা তার ধ্বনিতেই তো তার হার্ট ফেইল হয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি। তোমার দৃষ্টিতে ভালোবাসা ছিল। তুমি চেয়েছিলে যুদ্ধটা চলুক, জমুক। অশুভ শক্তি নিঃশেষ হয়ে বা তার অশুভ প্রকাশ নিঃশেষ হয়ে মহাশক্তি জেগে উঠুক। এই তো যুগে যুগে মানুষ আস্বাদন করছে। সাধকের অন্তর সত্তায় একীভূত এই আস্বাদন। তাকে তলায় তলায় হারিয়ে ফিরে যাচ্ছে স্বরূপে। ...চণ্ডী পড়ুন, চণ্ডী চিন্তা করুন, দেখুন কি

বলতে চাইছেন মা। মহাভারতেও দেখবেন শিশুপাল বধের পর তার আত্মশক্তি জ্যোতি স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ শরীরে বিলীন হল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন-ত্রিশূলটা সবে অসুরের বুকে স্পর্শ করছে, কিন্তু কোথাও বধ করেননি দেখবেন। কারণ, বধ হয়ে গেলে লীলা ফুরিয়ে গেল। এটা চরমের আগের মুহূর্তে। দেখবেন, যখনই বধ হয়ে গেল, তখনই দৃশ্যটা এগিয়ে গেল তখন দেবতারা স্তব-স্তুতি করছে। আনন্দে ধুম লেগেছে।

একই সাধকের জীবনে কঠিনতর সাধনার মধ্যে দিয়ে উন্নত-সমৃদ্ধতর আনন্দের প্রকাশ-স্থিতি। কত কচি মুখের সাধকের জীবনে মায়ের দৃপ্ত পদধ্বনি। বারবার একই খেলা। তাই শ্রী গীতা আশ্বাস—যদা যদা হি ধর্মস্য....। আর রণচণ্ডী মায়ের হুঙ্কার- ইথথং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।

কার্তিক

কামদেব ভস্মীভূত হল। বস্তুত প্রতিমুহূর্তেই মদন-ভস্ম হচ্ছে। জ্ঞানী যেমন বলে- দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই। কামদেব একটা প্রতীক। তেমনি ভক্ত যতই ভগবানের দিকে এগিয়ে যায়, প্রতিমুহূর্তেই তার পূর্বতন ভাবনা, ভালো লাগা ভস্মীভূত হয়, নবতর মূল্যবোধে, নবতর জীবনে সে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভক্তের জীবনে প্রতিমুহূর্তেই মদন-ভস্ম হচ্ছে, প্রতিমুহূর্তেই সে তার ইষ্টকে নতুন করে, উজ্জ্বল করে, আপনার করে খুঁজে পায়।

গীতায় কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন, ভক্ত যা কিছু দেয়, আমি গ্রহণ করি। কেন? 'ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি'। তার মধ্যে ভক্তিটুকু মাখানো থাকে তাই। কাজেই তার জীবনের ভালোবাসাটুকু গ্রহণ করছি। প্রতি মুহূর্তে তার ভালোলাগাটুকু রূপান্তরিত হচ্ছে। ভালোবাসাটুকু পবিত্রতর হচ্ছে হচ্ছে। তাই কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন, ভারী সুন্দর করে বলছেন—ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি। এই ভক্তি মাখান আছে। ভক্তিটুকুতেই আমার লোভ, তাই আমি গ্রহণ করি। গ্রহণ করছি আর প্রতি মুহূর্তেই ভক্তের চেতনা রূপান্তরিত হচ্ছে। বিরূপতায় বিরহ, স্বরূপতায় সান্নিধ্যের আনন্দ। 'তোমাতে হয়ে যাব আমার আমি হারা'।

পার্বতী শিব-সাধনায় পরমজ্ঞান-পরম মঙ্গল স্বরূপ শিবকে প্রাপ্ত হলেন এবং তার ফলে কার্তিকের জন্ম হল। ব্রহ্মকুমার আবির্ভূত হলেন। সমস্ত কু সেখানে শেষ হয়ে গেছে, তাই কুমার। পরম জ্ঞানের প্রতীক কার্তিক। তাই পার্বতী-শিবের পরিপূর্ণ আস্বাদনের ফলে কুমারের জন্ম। আর, বিচিত্র বিশ্বের উপরে তিনি অবস্থিত, তাই সপ্ত বর্ণাত্মক ময়ূর তাঁর বাহন। তাই ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপ। তাঁর হাতে তীর-ধনুক। মুণ্ডক উপনিষদে আছে প্রণব হচ্ছে ধনু, আর শর হচ্ছে আত্মা। এই দিয়ে পরমাত্মাকে বিদ্ধ করে পরমাত্ম-স্বরূপে সে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই হাতে তীর-ধনুক। আবার আমাদের উপনিষদে নির্বিশেষ ব্রহ্মকে বলা হয়েছে ময়ূরাণ্ড। কেননা, সাদা রঙের অণ্ড-এই ডিম থেকেই বহু বর্ণাত্মক ময়ূর জন্ম গ্রহণ করছে। তাই উপনিষদে সুগণাত্মক পরমাত্মাকে ময়ূর বলেছে। পার্বতী যখন শিবজীকে লাভ করল, তখন কিসের জন্ম হল? ছেলের রূপকে কার্তিকের বা দিব্য জীবনের আবির্ভাব হল। কার্তিকের জন্ম যদি স্থূল জন্ম হোত, তাহলে কি আর মদনভস্ম হোত? তিনি দিব্যজ্ঞানস্বরূপ। তাই মদনভস্মের পরে কার্তিকের জন্ম।

অসুর বধ

অসুর সবসময়ই রূপ পাল্টাচ্ছে। শেষে যখন পাল্টাতে গেল, তখনই কেটে দিল। এই সংসারে ধূর্ত বদমাইশ লোক দেখবে সবসময় রূপ পাল্টাচ্ছে। আমরা বলি না, টুপি পাল্টেছে, জামা পাল্টাচ্ছে? তা, অসুরের রূপ পাল্টানো স্বাভাবিক। আমাদের মনের অনভিপ্রেত প্রবণতাগুলোও কোন না কোন ভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। বর্ণনা আছে লড়াই করতে করতে মহিষাসুর মায়ের বুকে মুষ্ঠাঘাত অর্থাৎ ঘুসি মেরেছে। তা অশুভ শক্তিগুলো বুকেই তো আঘাত করে।

কিন্তু একটা কথা আছে। মা দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ করলেন, অথচ যখন মারলেন, তখন অক্লেশেই মেরেছেন। মারার আগে বলছেন, এখন তুমি একটু লাফাও, আমি ততক্ষণ মধু পান করি। এই মধু পানের একটা মানে করা হয়, মা তাঁর আনন্দ স্বরূপে অধিকতর রূপে প্রকাশিত হচ্ছেন। তিনি আনন্দ-অমৃত-স্বরূপিনী। তারপর বধ করলেন-সেটা অনায়াসেই। কিন্তু যুদ্ধটা অনেকদিন হয়েছিল। জয়টা হয়ে গেল টুক করে। যেমন গাছে একটা ফল অনেক দিন ধরে পুষ্ট হয়, পেকে ওঠে—তারপর কখন নিঃশব্দে ঝরে পড়ে।

যদি টুক করে যুদ্ধ জয় হয়ে গেল, তাহলে এই যুদ্ধটা অনেক হালকা করে দেখানো হোত। মা একটা নারী, আর মহিষাসুর বিরাট শক্তি-মান, তার সঙ্গে অনেককাল যুদ্ধ হবে। মনে হবে মা হেরে গেল-হেরে গেল। দেব-দর্শকবৃন্দ উত্তেজিত হচ্ছে, হা হুতাশ করছে। যুদ্ধটা অনেককাল ধরে চলেছে। যুদ্ধ জয় যদি সহজেই হয়, তাহলে নিষ্ঠা, ধৈর্য, দৃঢ়তা, এসবের তো কোন মানেই থাকে না। (জীবনে যা কিছু মহৎ, যা কিছু বিশাল, ভূমা, তা আমাদের দীর্ঘ তপস্যার মধ্যে দিয়ে, দীর্ঘ ক্লেশবহ জীবনের মধ্যে দিয়ে অর্জন করতে হয়) যা কিছু হালকা, পাতলা, ভঙ্গুর, তুচ্ছ, তাই ফস করে হাতাবার চেষ্টা করি, সেই ক্লেদাক্ত সফলতার বোঝা ক্ষণকাল বহন করি, এবং পরক্ষণেই ফেলে দিই। কিন্তু জীবনে যা কিছু পরম সম্পদ,তা আমাদের যথাযথ মূল্য দিয়েই অর্জন করতে হয়। এই কথাটা ভাবলেই মায়ের দীর্ঘকাল—কত হাজার বছরের যুদ্ধ—কিছুই মনে হয় না।

এই যুদ্ধের পাতার পর পাতার বর্ণনা আমাদের কাছে যেন জীবনের পাতার পর পাতা সফল উত্তরণের ইতিহাস। যে, একদিন জয় হবেই এবং সেটা শেষপর্যন্ত সহজেই হবে সাফল্যের সুষমামণ্ডিত হয়ে। এটা যদি ভাবি, তাহলে অনেক যুদ্ধের পর মা হাসতে হাসতে মেরে ফেললেন, এই যুদ্ধ জয়টা তখন বড় শোভন সুন্দর লাগে। মনে পড়ে যায় সেই স্তব-'সৌম্যাসৌম্যতরাশেষসৌমেভ্যস্তুতিসুন্দরী'। আমরা মেলাতে পারি না, তাই ভালো লাগে না। যখন মিলে যায়, তখন ভালো লাগে। জীবনের বছরের পর পছর চণ্ডীর পাতার পর পাতা মিলেমিশে এক হয়ে যায়। তাই বলছে, মা অনেককাল যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু মারলেন তো হাসতে হাসতেই। মেরে দিলেন প্রশান্ত সুন্দর রূপেই।

'পূর্ণতার পথে জীবনে যা কিছু বাধা, প্রতিবন্ধকতা, যেগুলো বিঘ্ন মনে হয়, যখন মানুষ উত্তরণের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়, তখন মনে হয় সেইগুলো যেন বেশী সুন্দর, সেইগুলো যেন আমার আত্মশক্তিকে আরো প্রকটিত, জাগরিত, উদ্বোধিত করেছে। তখন যেগুলো ভীষণ, করাল মূর্তি মনে করেছি জীবনের পথে, সেই যেন আমার চরম সাফল্যে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। মহিষাসুরের তেজ দেবী অঙ্গে বিলীন হল। স্বর্গলোকে বেজে উঠল দেব-দুন্দুভী।...আমাদের দেহ-মন,প্রাণের সর্ব শক্তি একীভূত হয়ে ব্রহ্মময়ী মায়ের পূর্ণপ্রকাশ ত্বরান্বিত হোক।

হর-পার্বতী

আমাদের আধ্যাত্মিক ভাবনার দুটো দিক, দুটো জীবনের মধ্যে বিগ্রহীভূত হয়েছে। তার একটি দুর্গা, অপরটি শিবজী।

শিবের রূপ কি? জ্ঞান-বৈরাগ্যময় রূপ। শিব শ্মশানবাসী, পরিণামদর্শী, অঙ্গে শ্মশানের ছাই মেখেছেন। শ্মশানের বৈরাগ্য আশ্রয় করেছেন, তাঁর ধ্যান-স্তিমিত দৃষ্টিতে জগতের সব বৈচিত্র একাকার – তাই বুঝি হাড়মালা তাঁর কণ্ঠভূষণ। বিশ্বের সব বৈপরীত্য আর বিরোধ তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে সাম্য পায়। দেখি বিষ নিস্যন্দি মহা সর্প আর সুধা-নিস্যন্দি মধু চন্দ্র তাঁর অঙ্গে একই সঙ্গে শোভা পাচ্ছে।

আধ্যাত্মিকতার আর এক ধারা—প্রেমের, ভক্তির ধারা। জ্ঞানের ধারা যেমন পথ পেয়েছে ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিচারের, ব্যাতিরেকের মধ্যে দিয়ে, বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে, প্রেমের ধারা, ভক্তির ধারা তেমনি পথ পেয়েছে ভালোলাগার—ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে। নির্বিচারে ভালোবাসা আর শরণাগতির মধ্যে দিয়ে। যার জন্য ঠাকুর অন্ধভক্তি কথাটার বিরোধিতা করেছিলেন। সর্তরহিত অহেতুক ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে সাধক সমস্ত শর্তের অতীত অহেতুক কৃপা-সিন্ধুকে খুঁজে পায়। শাস্ত্রে যেমন বলেছে – তদ্‌ভাব ভাবিত, তদ্ অনুরঞ্জিত, তদাকারকারিত। এই দুটো শেষ পর্যন্ত পরমাত্ম বস্তুতে নিবিষ্ট হয়। জ্ঞানের ধারার মধ্যে প্রেমের প্রকাশ আসে, প্রেমের ধারার মধ্যে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা – মম সমীপাগতা-মম, সাদ্ধর্মমাগতা।

শিব শিশুকাল থেকেই আত্মজ্ঞানী, ত্যাগ বৈরাগ্য তাঁর অঙ্গের ভূষণ, ঘরের মধ্যে মন বসে না, শ্মশানে বাস করেন। ঋষির দৃষ্টিতে তাঁর যে রূপ, তার কোথাও অজ্ঞানের লেশমাত্র নেই, তাই তাঁর বর্ণ কর্পূর কুন্দ ধবল। তপস্যার, দীর্ঘ কৃচ্ছ্রতার প্রতীক-ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাভার নেমে এসেছে তাঁর মাথা বেয়ে। ধ্যানময়তায়-বলে নাকি ভাঙের নেশায় তাঁর চোখ দুটি ঢুলু-ঢুলু। পরনে বাঘের ছাল, বা গাছের ছাল, তাও কোনরকমে। শ্মশানের ছাই-ভস্ম তাঁর অঙ্গের ভূষণ। এই জীবন তপোনিষ্ঠ বৈরাগী মানুষের অতি ভালোবাসার জিনিস। সমাজের স্বচ্ছন্দগতি যে ষাঁড়, সেই বৃষই তাঁর বাহন। স্বেচ্ছাবিহারী তিনি নিজের আনন্দে আত্মারাম। বলে, শিবনেত্র—অর্থাৎ, কিনা জগত ব্যাপার বর্জ। পরিপূর্ণ ত্যাগ বৈরাগ্যময় জীবনের প্রতীক শিব।

অপর দিকে আর একটা ছবি—পার্বতী। পার্বতী রাজার মেয়ে। পূর্ণ চন্দ্র যেমন উদয়কালেই তার সর্বাত্মক সৌন্দর্যে বিশ্বজনের মনোমোহন করে, তেমনি হিমালয় কন্যা গৌরীর উদিত যৌবনেই রূপ-গুণের খ্যাতি চারিদিকে রটে গেছে, বহু রাজা প্রলুব্ধ হয়েছে। সবাই ভাবছে, অপেক্ষা করে আছে, কবে স্বয়ংবর সভা হবে।

কিন্তু পার্বতীর সেদিকে মনই নেই, সে লোক মুখে শুনেছে, অনতিদূরে, শ্মশানে, পাহাড়-জঙ্গল-নদীর তীরে-তীরে এক উদাসী বৈরাগী আপন মনে বিহার করে। কখনো বা তাঁর তুষার-শুভ্র দেহটি স্তব্ধ হিমাদ্রীর মতোই, নীল আকাশের নিচে পরমাত্ম ধ্যানে অটল স্তব্ধতায় বিরাজ করে। জটাজুটাধারী, শ্মশানের ছাই-ভস্ম মাথা, অর্ধ-উলঙ্গ, লোকে বলে অর্ধোন্মাদ। সদাই নিজের ভাবে বিভোর। হাড়ের মালা গলায়। ভয়ঙ্কর সাপ না কি নির্ভয় নিশ্চিন্তে তাঁকে জড়িয়ে আছে। তবুও তাঁর কথা শুনে কেন জানিনা মনে লেগে গেছে। কেউ যখন কারো কথা বলে, তখন তাঁরই কথা মনে পড়ে যায়, অন্য কারো কথা মনে পড়ে না, অন্য কারো কথা ভাবতে পারে না, এমনই অবস্থা।

দিনের পর দিন পার্বতী যে ভাবে রাজপুরীতে শিক্ষা পেয়েছেন, সেই ভাবে শিবের মনোরঞ্জন করতে চেয়েছেন। তাঁর গতি, তাঁর হাস্য-লাস্য, তাঁর আবরণ-আভরণ, সব কিছু, কেমন করে শিবের মন পাওয়া যায়।

পার্বতী তাঁর প্রথাগত সমস্ত চেষ্টায় যখন ব্যর্থ হলেন, তখন নূতন করে চিন্তা করতে বসলেন, কেমন করে শিবের মন পেতে পারি। কেমন ক'রে শিবকে পাব? চিন্তা করে করে তাঁর মনে উদয় হ'ল — যদি আমি শিব-এর মত হই, তাহলে শিবকে পেতে পারি।

শিব কি করেন? সর্ব সঙ্গ ত্যাগী আপন ভোলা তিনি। সদা পরমাত্ম ধ্যান-নিষ্ঠ।

পার্বতী কঠোর তপস্যা শুরু করলেন শিবের জন্য। ধ্যানমগ্ন হলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যেতে লাগল, পার্বতীর তপস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হ'তে লাগল। পার্বতীর দীর্ঘ কঠোর তপস্যার বর্ণনা আছে আমাদের শিবপুরাণে। আজন্ম সুখ-সম্পদের মধ্যে লালিতা পার্বতীর এই কঠোর কৃচ্ছ্রতা আর গভীর তপস্যা দেখে মা মেনকার মন অস্থির হয়ে উঠল — তিনি 'উঃ মা' বলে কেঁদে উঠলেন। তাই পার্বতীর আর এক নাম হল উমা। এক সময় তিনি এমন কি অনাহারে দিন কাটাতে লাগলেন। তপস্যার মধ্যে ডুবে রইলেন। সেই সময় কিছুই খেতেন না, এমনি কি গাছের পাতাও না, তাই তাঁর নাম হোল 'অপর্ণা। এমন কঠোর শিব তপস্যায় পার্বতী ধীরে ধীরে শিবের মত হয়ে উঠলেন, শিবের মতই তাঁর রূপ হোল, তিনি শিবময়ী হয়ে গেলেন। শিবের ধ্যান করতে করতে পার্বতী হলেন শিবানী।

কেঁপে উঠল কৈলাসের আসন। শিব তাঁর কাছে এসে বললেন, তোমাতে আমাতে আজ অভেদ হয়েছি, আজ আর কোন বিচ্ছেদ নেই। সর্ব সত্তা একাকার, সমরস হয়ে গেছে তোমার তপস্যায়। দেবগণ জয়গান করে উঠলেন - জয় হোক গৌরী মায়ের কপোললিপ্ত তপোঃস্বেদ বিন্দুর। জয় হোক কৈলাসনাথের কপাললিপ্ত শ্মশান ভস্ম বিন্দুর। জয় হোক শিব-শিবানী, শংকর-শংকরী, হর-পার্বতীর।

শিবের যে পথ, শিশুকাল থেকেই ত্যাগ, বৈরাগ্যের পথ, জ্ঞান-বিচার বিশ্লেষণের পথ। আর, পার্বতীর যে পথ, তা ভক্তি-বিশ্বাস-নির্ভরতা, প্রেমের পথ, ভালোবাসার পথ; শুধুমাত্র তাঁর প্রতি অনুগত হওয়া, তাঁর কথা ভাবা অনির্বাণ, অবিচ্ছেদ। ঠাকুর বলতেন —'সব মন যদি কুড়িয়ে আমাতে এল, তবে বাকী কি রইল।'

এই শিব আর পার্বতী আমাদের আধ্যাত্মিকতার দুটো প্রতীক। মানুষের মধ্যে কারো জ্ঞানের পথ; সে মূলত ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিচার-বিশ্লেষণকে আশ্রয় করে ভগবানের দিকে এগিয়ে যায়। তার সত্তার মধ্যেই এই ভাব প্রধান থাকে, সে বিরক্ত, নিরাসক্ত-জীবন যাপনের মধ্যে দিয়ে ভগবানের কাছে এগিয়ে যায়।

আর, এক একজন মানুষের প্রেম-ভক্তির পথ। পার্বতী জানে না শিবের স্বরূপ কি। কিন্তু ভালোবেসেছে শিবকে। কেন ভালোবাসল? তাঁর সংস্কারে। কেন পার্বতী দীর্ঘ তপস্যার মধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন? তাঁর অন্তর ভরে গিয়েছে সেই প্রেমে।

এক একটা এমন আধার থাকে, যারা জানেনা ভগবান আনন্দময়, কত মহান। ভগবানকে যে পেতে চাইছে, ভগবান কত বিরাট জানতে চায় না, শুধু ভালো লাগায়, ভালোবাসায় ভগবানকে পেতে চায়। আর, ভালোবাসা দিয়ে ভগবানকে পেতে গিয়ে সে জানেনা কখন সে তার ভালোবাসার জনের মত হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে নিজের

অজান্তে হাঁটতে শুরু করে, ভালোবাসা চলে যায় বৈরাগ্যের কাছে, বৈরাগ্য চলে যায় প্রেমের কাছে, দুটো একাকার হয়। ঠাকুর বলতেন, শুদ্ধজ্ঞান আর শুদ্ধা ভক্তি এক। বস্তুতপক্ষে শুদ্ধতার যে পর্যায়ে দুটি পথ একাকার হয়ে এক স্থিতি লাভ করে তা-ই পরামাত্মস্থিতি বা স্বরূপস্থিতি।

কথামৃতে আছে— একজনকে বলছেন, তোর জ্ঞান হবে, আর একজনকে বলছেন তোর ভাব হবে। আবার, কাউকে বলছেন, তুই এরকম করিস নি, তোর আকর আলাদা। কাউকে বলছেন শিবের অংশ। আবার কাউকে বলছেন নারায়ণের অংশ।' দেখ, অমুককে দেখলাম, মানসে চন্দন আর ফুলের মালা দিলাম।' আছে না কথামৃতে এসব কথা? কোথাও হৃদয় মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়, কোথাও বুদ্ধি। কোথাও বা দুটোর সাম্য থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব কিছু ঠিক সঠিকভাবে একাকার হয়। কারণ লক্ষ্যবস্তু তো একটাই।

একটা ছোট্ট জিনিস আগুনের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে, সে আগুনের আলোটা ভালোবেসেছে। আর একটা ছোট্ট জিনিস আগুনের কাছে এগিয়ে আসছে। সে আগুনের উত্তাপটা ভালোবেসেছে। কত বিরাট তেজের আকর। একজন বলছে, বাঃ, কি আলো, সব কিছু আলো করে দিচ্ছে। আর একজন বলছে, আঃ, কি উত্তাপ, দারুণ শীতের মধ্যেও উত্তাপ বিকিরণ করছে। দুটোই যত আগুনের কাছে এগিয়ে যাবে, তার সমধর্মিতা পাবে। শেষে একাকার।

শিবজী

'দগ্ধ ইন্ধন অনল সদৃশ'—এখানে অনল হচ্ছে জ্ঞান-স্বরূপ, আর ইন্ধন হচ্ছে বাসনা। শিবজী হচ্ছেন জ্ঞানস্বরূপ। এই শিবের নাম করলে, শিবের ধ্যান করলে আমাদের বাসনারাশি দগ্ধ হয়। কাঠ যখন জ্বলে ওঠে, তখন শিখাগুলো অশান্ত হয়, নানারকম আওয়াজ, আর কাঠটা যখন জ্বলে যায়, তখন শান্ত-লাল আগুনটা বিরাজ করে। তেমনি জ্ঞান-অগ্নি। তাঁকে আমরা চিন্তা করি, তাঁর আশ্রয় নিই, তিনিই আমাদের বাসনাগুলো দগ্ধ করে শান্ত উজ্জ্বল রূপে আমাদের মধ্যে বিরাজ করবেন। সেইজন্য মহেশ্বরকে বলা হচ্ছে—তিনি আমাদের দগ্ধ ইন্ধন অনল স্বরূপ। তখন অঙ্গার অগ্নি স্বরূপ, আমাদের সত্তাও জ্ঞান স্বরূপ।

আর বলেছে তিনি জ্যোতি স্বরূপ। হিরণ্যগর্ভাদিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি দেহ নিরপেক্ষ জ্যোতি স্বরূপ, তিনি হিরণ্যগর্ভ-সমষ্টি স্বরূপ সৃষ্টি করে তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন। অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপ্ত শরীরের মধ্যেই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মহেশ্বর স্তুতি বেদোক্ত প্রাচীনতম স্তুতিগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাঁর আদি নেই অন্ত নেই, তার মানে তিনি নিত্যকাল বিরাজমান। প্রথমটা বলছে লোকপাল, আর একটাতে বলছে লোকপিতা। যিনি ব্যাপ্ত জ্যোতি স্বরূপ, তিনিই আবার সচ্চিদানন্দের কণা হয়ে জীবে জীবে অধিষ্ঠান করছেন। আর একটা তাঁর জ্ঞান স্বরূপের কথা —প্রত্যগাত্মা। যখন নিত্যজ্ঞান হবে, তখন জেগে রবেন জ্যোতি স্বরূপে। এই দগ্ধ কাষ্ঠ অনল সদৃশ। তখন তিনিই বিরাজ করছেন। অনন্ত প্রজ্জ্বলন সার্মথ নিয়ে।

তিনি নির্মল। আবার বলছে তিনি স্ফটিক সদৃশ। এই জন্য স্ফটিকে পুজো করে শিবজীর। তিনি নির্মল, তাঁতে কোন মল বা সংস্কার নেই, আবার তিনি জ্যোতি স্বরূপ

আত্মবোধের প্রকাশক। ভাবনায় এই দুটো মেলানো মুশকিল হয়। একটা বলা যেতে পারে যে —বাইরে থেকে যা জ্যোতি স্বরূপ, ভেতরে সেটাই স্বচ্ছ। কেমন? একটা উপমা দেওয়া যেতে পারে। একটা টর্চের আলো অন্ধকারে দেখ কত আলো, আর সেটা যদি সূর্যের আলোতে দেখ, কোন আলো নেই। তেমনি এক স্তর থেকে এক ভাবে যেটাকে দেখাচ্ছে জ্যোতি স্বরূপ, আর ভাবে সেটাই স্বচ্ছ, নির্মল। তবে ভক্তের ইচ্ছামাত্র অনন্তরূপ তাঁতে প্রকাশিত হচ্ছে। বলা হয় কল্পতরু। তবে এ হচ্ছে কল্পলোক।

শিবজী পরম অব্যয় মহাজ্ঞান স্বরূপ। তাঁর সত্তায় মহাজ্ঞানের স্ফুরণ হয়েছে। তাই গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। উচ্চতর প্রদেশের যে জ্ঞানভূমি, তা তাঁর সর্ব সত্তা পরিপ্লাবিত করেছে। এই হচ্ছে শিব মুণ্ডক ও কঠোপনিষদে যে 'বরণ' কথাটা আছে, সেও এই আত্মবরণ। গঙ্গা তো আর কোন জায়গা থেকে নামছে না, মাথা থেকেই নামছে—বলা হয় জটা থেকে নামছে। সুতরাং রূপের দিক থেকে যেমন সুন্দর, ভাবের দিক থেকেও তেমনই সুন্দর। এ হচ্ছে সাধকানাং হিতার্থায়-ঋষি-মুনিদের ধ্যানগম্য রূপ—বলা যায় অদ্বৈতের দ্বৈতভাবনা।

(চন্দ্রচূড়। কপালে চন্দ্র শোভা পাচ্ছে। চন্দ্রকে বলা হয় মনের অধিপতি। মনের ১৬ কলা, আর চন্দ্রের ১৬ কলা। সাধক সাধনার মধ্যে দিয়ে মনের প্রভাবকে অতিক্রম করে, মন ক্ষীণ হয়ে আসে। যে মন চঞ্চলতার বশবর্তী হয়ে সাধককে ভোগায়, উন্নত সাধকরা সেই মনকে অন্তর্মুখ করে তোলে। এই চাঁদের একটা একটা কলা যেন অন্তর্হিত হচ্ছে। যিনি পূর্ণভাবে আত্মস্থ হয়েছেন, তার ১৬ কলা বিলীন হয়ে গেছে। যিনি পূর্ণ ভাবে আত্মস্থ হয়েছেন, আত্মস্বরূপ, তার তো মনের ক্রিয়া নেই।) কিন্তু শিব তো কল্যাণকারী, মানুষের মায়া-মোহ তাঁর কল্যাণ দৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছে, জগতকে মহা শান্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাঁর মহা-করুণা সম্পাতে। তাই, তিনি একভাবে দেখছেন না, আবার দেখছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ দেখুন—তিনি যেন দেখছেন না, এই জগতের যা কিছু যে দৃষ্টিতে মানুষ দেখে সেই দৃষ্টিতে দেখছেন না। কিন্তু মানুষকে তুলতে হবে, প্রেমের দৃষ্টিতে, করুণার দৃষ্টিতে তাই তিনি দৃষ্টিপাত করছেন। সমস্ত মহাযোগী মহাপুরুষদের দৃষ্টিই এরকম। ঠাকুর বলতেন – 'দেখ, পাখী ডিমে তা দিচ্ছে, সব মনটা ডুবে আছে, ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি।' জগতের দৃষ্টিতে দেখছেন না, করুণার দৃষ্টিতে দেখছেন। তাই বলা হয় একটুখানি দৃষ্টি। শিবের দৃষ্টি অর্ধনিমিলীত। তাই চন্দ্রকলা একটুখানি বিরাজ করছে। তা নাহলে তো অমানিশা —কে কাকে দেখছে। শিবঃ এব কেবলম্। এইজন্য ক্ষীণ চাঁদ একটু থাকে শিবের কপালে, মা দুর্গার কপালে, মা কালীর কপালে।

আবার দেখুন – স্মেরানন। একটুখানি হাসি লেগে আছে মুখে। যে হাসি প্রসন্ন। একটুখানি প্রসন্ন হাসির সঙ্গে একফালি চাঁদের প্রকাশ। কত সুন্দরভাবে মিলে যায়, যেন একাকার হয়ে যায়। চাঁদের একটু প্রকাশ আর আলো, আর শিবের মুখের স্মিত হাসি। এ তো চিরকালই আছে। এই বুদ্ধ মূর্তি দেখুন —যিনি ধ্যানে বিলীন হয়েছেন, করুণায় আবার তাঁর মুখে স্মিত হাসি। শুধু ধ্যান-বিলীন হলে বাবু আমাদের চলবে না, একটুখানি সুখ-প্রসন্ন হাসি থাকতে হবে। সেইজন্য একটু মহা-মনের বিকাশ হয়েছে। দেখুন এই বুদ্ধমূর্তি কত সুন্দর। কত লাবণ্যময়। আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্যের পথ বেয়ে।

এই যে শিবের রূপ বর্ণনা - আহা কিবা নাক, কিবা চোখ, এসব নয়, রূপের সঙ্গে

যে ভাব ওতপ্রোত হয়ে আছে, সেইগুলো চিন্তা করতে হবে। না হলে নেহাত। এই যে শিবের রূপ, তার সঙ্গে মুনি-ঋষিরা তাঁদের প্রজ্ঞাঘন অন্তরে যে ভাবটা অনুভব করেছেন, সেই ভাবনাটা অনুভব করতে হবে।

'বৃষরাজ নিকেতন'। বৃষরাজ - ষাঁড়ের পিঠে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই ধর মজা করে বলছি, শিবের এত সব থাকতে ষাঁড়ের পিঠে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আসলে নেশায় ঢুলুঢুলু তো, গাড়িতে চড়লেন না - প্যাঁক প্যাঁক হর্ন দিতে হবে। কিন্তু ষাঁড়ের ওসব নেই, তার শিং দুটোই হর্ন, লোকে নিঃশব্দে সব সরে দাঁড়াবে, নেশা ছুটবে না, অশান্তি নেই। ষাঁড় হচ্ছে শ্মশান-মশানে, খোলা মাঠে, জঙ্গলে আপন মনে বিচরণ করে। উদাসী জীবন। আর শিবও বৈরাগী, —শ্মশানবাসী, সমাজের কোন নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে নেই, আত্ম তন্ত্র, আপন আনন্দে বিভোর হয়ে আছেন। স্বেচ্ছাচারী স্বয়ং কর্তা, ভ্রমতি ভৈরবো যথা —শিবের বাহন ষাঁড়। ষাঁড়ের কি আছে? ষাঁড়ের আছে দৃঢ়তা। অনমনীয় দৃঢ়তা। ধর্মের পথে যে এগিয়ে যেতে চাইবে, তাকে ষাঁড়ের মতই দৃঢ়, অধ্যবসায়ী, অনমনীয় হয়ে থাকতে হবে —লড়বে, না হয় মরবে। ষাঁড়ের যখন লড়াই হয় দেখবে মাথা ফাটা-ফাটি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ছাড়বে না। আমরা বড়ুলে চা খাচ্ছিনু। এমন সময় দুটো ষাঁড়ের ভয়ানক লড়াই শুরু হয়ে গেল। কেউ কাউকে ছাড়বে না। একটা লোক সেখানে ছিল, সে একটা ছড়া বলল—আমি শুনেছিলাম। - 'এঁড়ে গরু নেড়ের জাত, বন-জঙ্গল আঁধার রাত'। হ্যাঁ, এই যে কথাটা বলেছে বাপু ভালো কথা বলেছে। ষাঁড়ের যে গোঁ, যে দৃঢ়তা, যে আপসহীন মানসিকতা, যে ধৈর্য-ধর্মের পথে এগোতে গেলে তা অবশ্যই দরকার। স্বামীজী বলেছেন,—ধর্মের ক্ষেত্রে হাঁটবি তো বুলডগের মত হবি। শত বিঘ্নানি—ধর্মের পথে এগোতে গেলে এই উত্তরোত্তর—নব নব বিঘ্ন পার হতে হয়। এই জন্য দেখবে বৌদ্ধ ধর্মেও ষাঁড় প্রতীক। অশোক স্তম্ভের নীচে দেখবে ঘোড়া আর ষাঁড় আছে। ঘোড়া হচ্ছে গতির প্রতীক। সিন্ধু সভ্যতার সীলমোহরে দেখবে পশুপতি ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন, তাঁর নীচে অনেক পশু বসে আছে তাঁকে ঘিরে। একই জায়গায় পাওয়া গেছে ষাঁড়ের সৌন্দর্যমণ্ডিত রিলিফ। এটা ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে আবহমানকাল ধরে, বলা যায় খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সাল থেকে চলে আসছে।

শিঙা। শূন্যকে মহাশূন্যে, অব্যক্তে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শিঙার একদিকে ছোট্ট ফুটো আছে। যে শূন্যে আকাশ। তাতে একটি ফুৎকারে ব্যপ্ত দিকে-মহাশূন্যে মহাকাশে প্রতিষ্ঠিত করছেন। সুতরাং শিঙা, সেই সঙ্গমের আনন্দধ্বনি। সর্ব্বাভিষ্ট প্রদ মহাসঙ্গীত। তাই শিবের পূজোয় শিঙা না থাকলে চলে না। নাথ সম্প্রদায়ের যে ভেক নেয়, তাতে শিঙা বেঁধে দ্যায় নাদের প্রতীক হিসাবে। নারায়ণের যেমন শাঁখ, শিবের তেমনি শিঙা। রবীন্দ্রনাথের গান আছে—'শূন্য-ভরা তোমার বাঁশির সুরে সুরে'। 'হৃদয় আমার সহজ সুধায় দাও না পুরে'। কথাটা খুব ভালো লেগেছে—বাঁশি তো শূন্যই। শূন্য মহাশূন্যে একাকার হয়ে যাচ্ছে। শিঙা শিবের হাতের বাঁশি। শিব যখন আনন্দে উন্মত্ত হয়, শিঙাতে ফুৎকার দেয়। শিবের আনন্দ-উন্মাদনা কিসের? প্রেমে তিনি উন্মাদ হয়ে যান। আর কিসে উন্মাদ হবেন? প্রেমে তিনি উন্মাদ হচ্ছেন। একটা কথা আছে-'উন্মত্ত ভৈরবং যত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়কম্'। ভৈরব যেখানে উন্মত্ত, সেখানে সর্বসিদ্ধি প্রদান করেন। এসব তন্ত্রের মন্ত্র। তিনি উন্মাদ হয়ে যেন জগতের কাছে মহাজ্ঞান আর মহাপ্রেমের ঝাঁপি খুলে দেন। সেই রামপেসাদের তবিলদারি। মনে কর তো, হিমালয়ে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ আর মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি শিঙাতে

ফুৎকার দিচ্ছেন। তার-ই স্পন্দনে চারিদিক থেকে খসে খসে পড়ছে যত জড়তার বরফ। আর সেই ধ্বনি, গুহাতে গুহাতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছোট ছোট সব শিবজীদের ধ্যান-নিথর হৃদয়ে মন্দ্রিত হচ্ছে-তৎ-ত্বমসি। চারিদিক থেকে উঠছে এই মহাস্পন্দন। ওঙ্কারের জয় যাত্রা। রূপের মাঝে অরূপের খেলা—এই ভাবতে হবে।

শিবের উপাসনা

যখন আমরা বলি শিবলিঙ্গ, তখন পরম মঙ্গলের কারণ। সেই শিব তত্ত্ব, পরম তত্ত্ব, তাকে নির্দেশ করি। শিব অর্থ মঙ্গল। কেন? তিনি সব অমঙ্গল বিনাশ করেন। সমস্ত অমঙ্গলের কারণ যে মায়া, তাই দূর করেন। জীব মায়াবদ্ধ হয়ে আছে, এই মায়া থেকে তিনি মুক্তি দেন, চির-শান্তি-বিধান করেন।

এখন, এই যে পরমতত্ত্ব, পরম স্থান, তাকে আমি উপাসনার মধ্যে বা সাধনার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করছি আমার সামনে। কেন? সোজাসুজি সেই পরমতত্ত্বের ধ্যানে আমার মন নিবিষ্ট হয়নি, তার হদিশ পাইনি বলে তাতে স্থিতি হয়নি। যেদিন স্থিতি হবে, সেদিন এই প্রতীক জগত থেকে ছুটি। পরম তত্ত্ব তাই তিনি শিব লিঙ্গ। 'লিঙ্গতে ইতি লিঙ্গ ম্'। কি প্রতীক হিসেবে নিয়েছি? একটি অগ্নিশিখা অথবা একটা ছোট্ট পাথর। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে আগুনের শিখা উপাসনার মাধ্যম ছিল, অনেকে মনে করেন জ্যোতির্লিঙ্গ কথাটা এর থেকেই চলে আসছে।

পরবর্তীকালে আমাদের দেশে পাহাড়ে কন্দরে তপস্যারত বৈরাগী সাধকরা পাথরের নুড়িকে নিয়ে তাদের উপাসনা প্রতীক গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে এখন যাকে বাণলিঙ্গ বলা হয়, সেই শিব লিঙ্গই প্রচলিত হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে মানুষ তার ভাবনা অনেক তত্ত্বনিষ্ঠ করেছে, গৌরীপট স্থাপন করে তার উপর শিবজীকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখানে পরম তত্ত্বকে আর একটু বিস্তার করা হয়েছে। অর্থাৎ গৌরীপটরূপী মহাশক্তির আবর্তন। তার মধ্যে স্থিরবিন্দু শিব বিরাজ করছেন। শিব লিঙ্গের উপাসনা সম্বন্ধে এতটা কথা বললাম, শিব রাত্রিতে শিব পুজোর ভূমিকা বিস্তার।

শিব রাত্রিতে চার প্রহরে চার বার পুজো করে কেন? এটা সম্বন্ধে একটা কথা, আমাদের সারা দিনে আট প্রহর বলা হয়। বলে না, অষ্টপ্রহর হরিনাম? দিনে চার প্রহর, রাত্রে চার প্রহর। শিবের যে উপাসনা করে, রাত্রে চার প্রহরে চার বার। যখন থেকে অন্ধকারের সূচনা, তখন থেকে শুরু, আর যখন অন্ধকার শেষ হয়ে আলো ফোটে তখন শেষ।

আমাদের মুনি-ঋষিরা প্রাচীনকালে প্রার্থনা করতেন, যখন সূর্য উঠত অন্ধকার ভেদ করে।' তমসো মা জ্যোতির্গময়। আমাদের তমসা, অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে চল। কারণ, আমরা অজ্ঞান অন্ধকারে আছি, জ্ঞানের আলোয় নিয়ে চল। সুতরাং সাধনার আধারে, অন্ধকার ছড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে তার মধ্যে থেকে আলোর উপাসনা হচ্ছে। সেজন্য সেই সময়টাই বেছে নিয়েছেন কালোর মধ্যে আলোর উপাসনার জন্য। কবিতায় বলা যায়—

'রাত জপে সারা রাত হাতে লয়ে তারাদের মালা,
ভোরের আলোর মাঝে কবে আমি হয়ে যাব হারা।'

উপনয়নের বা গায়ত্রীর সময় তিন দিন সূর্যের মুখ দেখতে নেই, অন্ধকারে বসে

আলোর উপাসনা। আর, এই চার প্রহরে চারবার অন্ধকারে বসে আলোর উপাসনা। সাধক অন্ধকারে আছে, এটা বাস্তব। উপাসনা শুরু হ'ল যখন থেকে অন্ধকার শুরু হচ্ছে। মধ্য পর্য্যায়—যখন গভীর অন্ধকার। আর পূজো তখন শেষ হ'ল আলো ঘিরে ফেলছে অন্ধকারকে, অন্ধকার পালাবার পথ খুঁজছে কোথা দিয়ে পালাবে। এই হ'ল শিবের উপাসনা। যবে থেকে অন্ধকারের সূচনা, অন্ধকার গাঢ় হয়ে গেল, তার মধ্যে অন্ধকারের সঙ্গে প্রচণ্ড ভাবে দ্বন্দ্ব চলছে, তারপর সফল হ'ল; আলো। আলোর মধ্যে দিয়ে উপাসনা শেষ হ'ল। এই চার প্রহরে চারবার উপাসনা।

এরপর চারটে মন্ত্র। প্রথম মন্ত্র—'ঈশানায় নমঃ', দ্বিতীয় মন্ত্র—'অঘোরায় নমঃ',তৃতীয় মন্ত্র—'বামদেবায় নমঃ', চতুর্থ মন্ত্র—'সদ্যজাতায় নমঃ'। শিবের চারটি রূপের মধ্যে চারটি ক্রম আছে। 'ঈশান'—ভগবানের বিপুল সম্ভাবনা মূর্তি, বলে ঈশানের মেঘ। 'অঘোর' মূর্তি হচ্ছে শিবের অত্যন্ত ঘোর ভাব, যেখানে তিনি গভীর গহন হয়ে আছেন। 'বাম' অর্থে সুন্দর, মনোহর। তাই 'বামদেবায়'—প্রসন্ন দেবায়। আর 'সদ্যজাতায়', তিনি সদ্য প্রকাশিত, তিনি নিত্য প্রকাশিত।

এরপর আসছে পূজোর উপাচার দুধ, দই-এর কথা। এর মধ্যে সাধনার ক্রম আছে। প্রথমে দুধ। দুধের থেকে দই আসছে, দই মন্থন করে ঘি। এই তিনটে যে ক্রম, এই ক্রম হচ্ছে বাইরের ক্রম। এর একটা গভীরতর উপলব্ধির ক্রম আছে। তা হ'ল ভগবানের করুণার ক্রম।

নারায়ণ ক্ষীর সমুদ্রে শুয়ে আছেন। শুনেছেন তো? সত্যিই কি কোন ক্ষীর সমুদ্র আছে, তাতে শুয়ে আছেন? আসলে এটা ভাবগত গভীরতম ভাব, আনন্দের ও অবস্থার পরিমণ্ডল, যার প্রতীক ক্ষীর। যে সত্যে, যে তত্ত্বে উনি বিলাস করছেন, উনি স্থিতি করছেন।

যারা শিব তত্ত্বে বা নারায়ণ তত্ত্বে অবগাহনের অধিকারী হয়েছে, তারা চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই দুধ, দই বা ক্ষীর, এইগুলো প্রতীকের আড়ালে যে সত্য, সেই সত্যে অবগাহণ করে বা বিলাস করে, স্থিতি লাভ করে। এই সাধনার ক্রম, পুজোর ক্রম, পূজা উপলব্ধির ক্রম।

শেষে আছে মধু। মধু আর ক্ষীর একই ভাবনার মধ্যে আসছে। শাস্ত্রে দেখবেন কালী, তারা দুর্গা প্রমুখ দেবীরা মধু পান করছেন, মধু পান করে মত্ত হচ্ছেন। গান আছে—'আসব আবেশে লোহিত লোচনী'। আবার ঠাকুর গাইছেন—'সুরা পানে ঢল ঢল'। সাধনার উদ্দেশ্য কারণানন্দ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। তার প্রতীক হচ্ছে মধু। মধু এক হিসেবে ফুলের মধু, আর এক হিসেবে মধু-কারণ। তন্ত্রে যা কারণ, শৈবে তাই মধু, সব কিছুর কারণ। কারণ পান করে মানুষ মত্ত হয়, পরম তত্ত্ব আস্বাদনে সাধক মগ্ন হয়। এজন্য রামকৃষ্ণদেব কারণের ফোঁটা মাথায় দিতেন। আর বৈষ্ণব বা শৈব মতে মধু কারণানন্দের প্রতীক। এজন্য দেবতারা মধু পান করে, অর্থাৎ কারণানন্দরূপী। তাই পুজোর শেষ প্রহরে মধু। পুজোর পূর্ণতায়— ''মধুবাতা ঋতায়তে''।

সদ্যজাত

শিবের সারারাত্রি ব্যাপী পুজোর চতুর্থ প্রহরে সাধনার পরিণতিতে হচ্ছেন 'সদ্যজাত'। এখানে হচ্ছে বড় ধরনের পরিণাম। চতুর্থ প্রহরে যখন আলো ফুটে উঠছে, আলোর

আভাস পাওয়া গেছে, তখন এই যে পরিণাম, একে বলা হচ্ছে জাত্যান্তর পরিণাম, যেমন শুঁয়োপোকার গুটি কেটে প্রজাপতির উড়ে যাওয়া। তখন শিবের নাম হ'ল সদ্যজাত। আমাদের সাধনার ভূমি তখন সফলতার পর্যায়ে এসে গেছে—আর আমি চান করাচ্ছি মধু দিয়ে।

এইবার মধুর তাৎপর্য কি শুনুন। ফুল ফুটছে, আমরা বলি প্রজাপতি বা মৌমাছি মধু খেয়ে যাচ্ছে। আচার্যরা বলছেন, না, মধু কোথায় খাচ্ছে? খাচ্ছে পুষ্পরস। ফুলের মিষ্টি মিষ্টি রসটা খাচ্ছে। এইবার মধুকরের মধ্যে একটা বিশাল পরিণতি লাভ করছে। শুধু পুষ্পরসকে ঘনীভূত করছে না, এমন একটা কিছু করছে, যাতে তার বিনাশ নেই, যত দিন রেখে দাও। এই অবিনাশী পরিণাম, তার মধুকোষে সেটা সঞ্চয় করছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে কি বলছে? মানুষ তার জীবনব্যাপী নিষ্ঠা, তপস্যা, একাগ্রতার সাধনার মধ্যে দিয়ে এবং আচার্য নিষ্ঠ উপায় অবলম্বনে গভীরতর সাধনায় ডুবে যাচ্ছে। এই সাধনার মধ্যে দিয়ে যে সাধন-সম্পদ বা তেজ সঞ্চিত হচ্ছে, এই হচ্ছে পুষ্পরস। সিদ্ধাচার্য নির্দেশিত, শক্তি সঞ্চারিত বিধি ও উপাসনা সকলই মধুকর। এই যে পুষ্পরস বা তেজ বিকীরণ হ'ল, এ যাচ্ছে সূর্যালোকে। সূর্যালোক যেন একটি মৌচাক, সেখানে এই পুষ্পরস গিয়ে রূপান্তরিত হয়ে মধু রূপে সঞ্চিত হচ্ছে। সূর্য আমাদের উপাস্য, সূর্যকে আমাদের ইষ্ট ভাবনায় রাখা হয়। এই পুষ্পরস শ্রীভগবানের অসীম করুণায় তার কৃপা সিঞ্চিত মধু হয়ে শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছেই ফিরে আসে। যেমন মৌমাছির বাচ্চা সেই মধুতেই পূর্ণতা লাভ করে, বড় হয়ে ওঠে, তেমনি ঐখান থেকে মধু ক্ষরিত হয়, যাতে আমাদের অন্তরদেবতা পূর্ণতা লাভ করে। এইজন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয়—ভগবান তুমি আমাদের মধু দাও, মধু দিয়ে আমাদের পূর্ণ কর, আমরা যেন সেই মধু আস্বাদন করে মধুময় হয়ে যাই, সমস্ত মধুময় দেখি। এইজন্য উপনিষদে বহুতর মন্ত্রে দেখা যায় মধুর উল্লেখ।

সোজা কথা এই, আমাদের সমস্ত শুভ কর্ম ভগবানের কাছে গিয়ে, ভগবানের করুণা তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে, ভগবানের করুণায় অভিস্নাত হয়ে আমরা আমাদের সাধনার পূর্ণতায় সেই বাঞ্ছিত ফল লাভ করি। উপনিষদের শান্তি মন্ত্রে বলছে—

'মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধব
ওঁ মধু ওঁ মধু'।

এই যে মধু আমাদের কাছে ফিরে আসছে, আমরা সেই মধু পান করে মধুময় হয়ে যাচ্ছি। এইজন্য চতুর্থ প্রহরে আমি সাফল্যের পাদপীঠে এসে গেছি, আমি শিবজীকে চান করাচ্ছি, আমার অন্তরে যে শিব তাকে বাইরে এনে চান করাচ্ছি। আবার পুজোর অন্তে অন্তরে নিয়ে যাব, —এই তো সাধনার ভাবনা। তাঁকে আমি চান করাচ্ছি কি দিয়ে? না মধু দিয়ে। যে ক্রম পরিণাম দুগ্ধ, দধি, ঘৃত-র মধ্যে দিয়ে হচ্ছে, সেই পরিণামের স্তর অতিক্রম করে আমি চলে এলাম জাত্যান্তর পরিণামে। সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে। আমার মানব জীবন, দিব্য জীবনে রূপান্তরিত হ'ল। "এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম- জনমান্তর"।

শিব-শক্তি

☆ ঠাকুর তো বলেছেন, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, তাহলে আগে শক্তির কৃপা লাভ করে পরে ব্রহ্ম লাভ হয় কেন?

☆☆ যখন অভেদ বলছে, তখন আগে পরে প্রশ্ন নেই। যখন কৃপা পাচ্ছ, প্রতি স্তরেই কৃপা পাচ্ছ। মনে কর, আমি এক পেয়ালা চা খাচ্ছি, এই এক পেয়ালা চা খাওয়ার মধ্যেই আমার পুরো তৃপ্তি। তাহলে দশ চুমুক যদি খাই, দশ চুমুকের মধ্যে পুরো তৃপ্তি আছে। এক চুমুক খাচ্ছি—শক্তি, এক চুমুক তৃপ্তি পেলাম, সেটাই ব্রহ্ম। খাচ্ছি,আস্বাদন করছি, শক্তির এলাকা। আর, তৃপ্তিটুকু ভেতরে পৌঁছে যাচ্ছে, থিতু হচ্ছে, সেটা ব্রহ্ম। শিব বলি আমি। আর দশ চুমুক আস্বাদন করছি, সেটা যদিও শেষ পর্যায়ের শক্তির এলাকা, তবু বড্ড বেশী তৃপ্তি বা শিবাবস্থার মাখামাখি। আর পরিপূর্ণ তৃপ্তি এসে গেলে সেটা পূর্ণ শিবাবস্থা।

তবে প্রতি স্তরে আস্বাদনের এলাকাটা বা স্থিতিটা পাল্টে যায়। যে যতটুকু এগুচ্ছে,সে ততটুকু সেই অবস্থা, শিবাবস্থা পেয়ে যাচ্ছে। তাকে ব্রহ্ম বল বা শিব বল, সেই পরিপূর্ণ তৃপ্তি, পরিপূর্ণ শিবাবস্থা। সেখানে শক্তি নেই, আবার আছে, কারণ তা শিবময় বা শিবস্বরূপ পরিণতি লাভ করেছে। শক্তির অবগুণ্ঠিত অবস্থা শিব। আর শিবের প্রকাশাত্মিকা অবস্থা শক্তি।

☆ মা ছাড়া গতি নেই; সেটা কি ক্রিয়াশক্তি?

☆☆ কঠোপনিষদের কথা—

'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নে মা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।'

শক্তি যেখানে সংগুপ্ত, প্রকাশ সেখানে অর্থহীন। প্রকাশের পথেই আস্বাদনের এলাকা। প্রথম চুমুকে যতখানি অধীর ব্যাকুলতা, শেষ চুমুকে ততখানি নেই। সেখানে আমার আস্বাদন এবং তৃপ্তি মেশামেশি হয়ে যাচ্ছে। এই পুজো-পাঠ, তারপর জপ, শেষ হচ্ছে ধ্যান। সত্যিকারের ধ্যান, যা করা যায় না, হয়। সেই আনন্দের স্বরূপে বসে থাকা।

☆ যখন পরিপূর্ণ তৃপ্তি, তখন শক্তি নেই?

☆☆ আছে, অন্তর্লীন। সিঁড়ির প্রতি ধাপেই অধিকতর ছাদের আভাস। শেষে সিঁড়িটাই ছাদ হয়ে যায়। সাধক তার সাধনাবস্থায় যতই সেই শক্তির স্তর পার হচ্ছে, ততই শিব-এর স্তরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ছোট-খাটো আধারে শ্রীঘ্রই তৃপ্তি এসে যায়—এসব অনেক করেছি। ছোট আধার যেখানে তৃপ্ত হচ্ছে, বড় আধার সেখানে থামে না, মোটেই পৌঁছই নি, কিছুই করিনি, এখনো অনেক এগোতে হবে। তার মধ্যে অনেক খাঁই আছে, তার দু-চার চুমুকে হবে না, তার পুরো দশ চুমুকের দরকার। এর একটি কারণ, প্রত্যেক স্তরের মধ্যেই সেই অবস্থার কম বেশী মেশামেশি আছে।

☆ আপনি একদিন বৃত্ত আর কেন্দ্রের তুলনা দিয়ে বলেছিলেন, যতই পরিধি থেকে কেন্দ্রের দিকে এগোচ্ছে, ততই শিব ভাব এসে যাচ্ছে।

☆☆ যতই দূরতম পরিধির দিকে যাও, ততই শক্তি ভাব, তার অধিকতর গতি--চঞ্চলতা-বহির্মুখ বৃত্তি, যাই বল; তার দূরত্বের অধিক্যের জন্য কেন্দ্রের আভাস সে পায় না। আর যতই কেন্দ্রের দিকে যাও, শিব ভাব। শেষে যেতে যেতে এমন একটা স্তরে এসে যাচ্ছে, সেখানে পার্থক্য নির্ণয় করা মুশকিল। শেষে একেবারে স্থিরতা। কেন্দ্রাভিমুখী গতির মধ্যে প্রতি স্তরেই যে আবর্তনের নূন্যতা, তাই তার মধ্যে শিব জাগ্রত করে দিচ্ছে।

☆ শিবকে আমরা কি নির্গুণ ব্রহ্মের সাকার রূপ বলতে পারি? ব্রহ্ম তো নিরাকার, তাঁর সাকার রূপকে শিব মনে করি?

☆☆ খুব ভালো উত্তর। আমি একবার দক্ষিণেশ্বরে, শান্তিকুঠির সামনে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছিলাম, শিব-এর রূপ কি? তখন কেউ বলল—'শিব রূপ হচ্ছে অদ্বৈতের দ্বৈত প্রকাশ'।

☆ হিন্দু ধর্মেই শক্তিবাদ আছে, খ্রিস্টান বা ইসলাম ধর্মে স্বীকার করা হয় না। কোনটা ঠিক?

☆☆ যেটা তুমি অনুভব করবে, সেটাই ঠিক। বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন রকম কথা বলেছে, সবগুলোই পড়, জানো কে কি বলছে। পাঁচজন বর্ষা নিয়ে পাঁচটা কবিতা লিখেছে, কিন্তু বর্ষা একটাই। কবিতা বর্ষা নয়, বর্ষা কবিতা নয়। এখন তুমি যদি জিজ্ঞেস কর, কোন কবিতাটা ঠিক, তাহলে আমি বলব, পাঁচটাই ঠিক। এখন আবার যদি তুমি জিজ্ঞেস কর কোনটা ঠিক, তাহলে বলব, তুমি যেটা অনুভব করবে, সেটাই ঠিক।

প্রত্যেক দর্শনের একটা নির্দিষ্ট এলাকা আছে, সেই এলাকার মধ্যে সেটাকে প্রকাশ করছে। যে বলছে ভক্তিই সব, ভক্তির মাধ্যমেই ভগবানের কাছে পৌঁছান যায়, সেখানে সে বলতে পারবে না, 'আমি ব্রহ্ম'। পারবে সে? পারবে না। সে তো ভক্তির কথা, ভক্তের কথা বলেছে, সে বলবে, আমি তার নিত্য দাস। আবার যে যোগের পথ অনুসরণ করেছে, সে বলছে আমার অন্তরে যে আত্মা আছে, তাকে অনুভব করি, সেই গুহাহিত পরম বস্তু। সে বলতে পারবে না 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস'। ভক্তিমার্গের সিদ্ধপুরুষ যিনি, তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের কথাই প্রকাশ করছেন, সেই পথের কথাই বলবেন। কেন? পথটা তো ঠিক রাখবে। আবার জ্ঞানমার্গী যে সিদ্ধপুরুষ, তিনি তাঁর পথের কথাই বলবেন। কেননা, সেটা ধরেই তো সে পৌঁছেছে। কিন্তু দুজনের যদি দেখা হয়, তাহলে দুজন দুজনের পিঠ চাপড়াবে, তুই ঠিক বলেছিস, তুই ঠিক বলেছিস। যারা উপলব্ধিবান মহাপুরুষ, তাঁরা এসবের উপর। কিন্তু মানুষকে পথ দেখাবার সময় একটা নির্দিষ্ট পথ দেখান।

☆ শক্তিকে আমরা স্ত্রী রূপে কল্পনা করি কেন?

☆☆ তোমার প্রশ্নের মধ্যেই তোমার উত্তর আছে। কি রকম? তুমি নিজে বলছ 'কল্পনা'। যখন কল্পনা করছি, তখন একটা রঙ নিয়ে তো আঁকতে হবে? যদি কল্পনা না করি, তাহলে তো মেয়ে পুরুষের প্রশ্নই নেই। যখনই আরোপ করছি, তখনই; পুরুষ কি নারী, একটা কিছু ভাবতে হবে। যদি আস্বাদনের ব্যাপারটা পুরুষ ভাব, তাহলে তৃপ্তি ব্যাপারটাকে নারী ভাবতে হবে। দুটোই পুরুষ বললে ব্যবহারিক বুদ্ধিতে বুঝতে অসুবিধে হবে। যখন স্থূল উদাহরণ দিচ্ছি, তখন জাগতিক ভাবেই কথা বলতে হবে। এ শব্দ বিন্যাস মাত্র, উদ্দিষ্ট বস্তু বা উপমেয় একই আছে। আগম শাস্ত্রে পথটাকে নারী বলছে আর পৌঁছনটাকে পুরুষ বলছে। নিগম শাস্ত্রে পথটাকে পুরুষ বলছে, পৌঁছনটাকে নারী বলছে। আগম শিবকে শেষ কথা বলেছে, আর নিগম দুর্গাকেই শেষ কথা বলেছে, তাই শিব মায়ের দুয়ারে ভিখারী। মা অন্নপূর্ণা।

আমি আর একটা কথা বলছি। শীতের দেশে দারুণ শীত, ঐ দেশে গরমটা ভালো লাগে লোকের। আমি গেলাম সেখানে আপনার বাড়ী, আপনি আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করলেন। আমি কি বলব? Warm reception, উষ্ণ সংবর্ধনা। আবার আমাদের দেশে গরম, গরমের দেশ, এখানে ঠাণ্ডা হলেই ভালো হয়। সেইজন্য বৈষ্ণব কবি কি বলছেন? 'যুগল চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি'। আমি একদিন দারুণ শীতের মধ্যে রাধা-গোবিন্দকে দর্শন করছি, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, ভাবলাম, এখন যদি ঐ গানটা গাই, তাহলে বলব—'তোমার চরণ গরম জানিয়া শরণ লইনু আমি'। ভাষার ফারাক।

নিগমে মা-কেই চরম বলেছে, শিবজী শুয়ে আছেন, তাঁর উপর মা বসে আছেন। শিবাবস্থাকে আসন করা হয়েছে। যখন রূপ কল্পনা করতে হচ্ছে, তখন নারী বা পুরুষ একটা কল্পনা করতে হবে। কোন বাড়ীতে কর্তা প্রধান, কোন বাড়ীতে গিন্নি প্রধান। দুজনেই প্রধান হলে গণ্ডগোল হয়ে যাবে। একবার আমাকে এক বন্ধুর মা ডেকে পাঠিয়েছে, বন্ধুর নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কেন? 'কি বলে শোন'। 'কি বলিস রে'? হাসছে। বলল, 'আমি মাকে বলেছি, আমার চেয়ে দু বছরের বড় মেয়েকে বিয়ে করব। বয়স্ক গুরুজন, তার কথা শুনে চলব, তাহলে আর গণ্ডগোল হবে না'। বললাম, 'মা, এটা পুরনো মত, এ নিগমের মত'।

★ মায়ের গণের কথা বলুন।

★★ গণ হচ্ছে অনুচর-শিব এর গণ, মা-এর গণ শিবানুচর, মাতৃ-আনুচর, গণ। মায়ের সঙ্গে ঘোরে, শিব-এর সঙ্গে ঘোরে। যেমন বলা হয়, সারদানন্দ মা-এর গণ। মা বলছেন, 'শরৎ না থাকলে আমি বাপু কলকাতায় যাব না'। সব সময় মাকে আগলাচ্ছেন। গণেরা মায়ের ভাব চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়, মায়ের লীলা পুষ্টির সহায় হয়। তবে এরা মায়েরই সত্তা সম্ভূত। আর আছে ক্ষেত্রপাল, তারা শিব-এর স্থান, মা-এর স্থান রক্ষা করে।

★ মা কি এক সঙ্গে শক্তি এবং মায়া?

★★ মা-এর শক্তির যে আবরণাত্মিকা দিক, সেটা তো মায়া। এই ফ্যান-টা চলছে-বিদ্যুৎটা শক্তি, আর যে কাজ হচ্ছে, সেটা বলতে পার শুভ অর্থে যোগমায়া।

★ আমরা যে মোহগ্রস্থ হচ্ছি, তাকে তো মায়া বলি?

★★ জল তো ভারী আর নিম্নগামী। একটা অবস্থায় জলটা উষ্ণতা প্রাপ্ত হয়ে হালকা হয়ে উপর দিকে উঠে যায়। যদি একটা লাইন টানি,-এটা হচ্ছে মায়া, ওটা হচ্ছে যোগমায়া। যখন সে মোহগ্রস্থ, ভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে- তাই মায়া। আর যখন সে মুক্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে তখন মহামায়া।

একটা মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। একদিন আসনে বসে দেখি মেয়েটা ছুটছে কালীবাড়ীর দিকে। খুব ভদ্র ঘরের মেয়ে। এরকম দেখলাম কেন? তারপর মেয়েটা আসল, বলল—আমি সারদা মঠে চলে যাচ্ছি। সে তখন যোগমায়ার আশ্রয়ে এসেছে।

কৃষ্ণচন্দ্র গীতায় বলছেন, আমার শরীরটা বিদ্যা আর অবিদ্যা দিয়ে তৈরী। মায়া আর যোগমায়া দিয়ে। যে একান্ত ভাবে আমার শরণ নেয়, আমিই তাকে পার করে দিই।

সেই একই জিনিস, তিনি একজনই। খ্রিস্টানদের মধ্যে, মুসলমানদের মধ্যে ভগবান একজন, শয়তান একজন, কিন্তু হিন্দু ধর্মে একজনই। একই শক্তি, কেউ মঙ্গলের ভজনা করছে, কেউ অঙ্গলের। এদিক দিয়ে বিজ্ঞানের সঙ্গে মিল।

অন্নপূর্ণা

কাশীতে মা অন্নপূর্ণা। শিবজীকে মা অন্নপূর্ণা ভিক্ষে দিচ্ছেন। একটা পরমতত্ত্ব, আর একটা তার অনুসারী। আগম আর নিগম। আগমে পুরুষ পরমতত্ত্ব আর আদ্যাশক্তি তার অনুসারী। নিগমের মতে মা-ই পরমতত্ত্ব আর শিব হচ্ছেন অনুসারী। এই যে কুমারী পুজো করে বা

মায়ের পুজো, এসব নিগম, অর্থাৎ মা-ই প্রধানা। এই আদ্যাশক্তি মায়ের কাছ থেকেই জগতের যত বৈরাগী, তপস্বী, সন্ন্যাসী—পরম অন্ন লাভ করছে, অমৃত লাভ করছে।

পরম অন্ন। মানুষ যা খেয়ে পবিত্র হয়। স্থূল অন্ন, স্থূল পুষ্টি হয়। উন্নত ভাবনার অন্ন—উন্নত জীবনের অন্ন, যাতে আমাদের সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহের পুষ্টি হয়। তেমনি সূক্ষ্মতর ভাববাহী, আধ্যাত্মিক অন্ন, যা খেয়ে আমাদের আত্মা পুষ্ট হয়। সেই পরম অন্ন মা শিবকে দান করছেন। রামপ্রসাদের গান আছে-'অন্ন দে মা অন্নদা' / মোক্ষ প্রসাদ দাও অম্বে / এ সুতে অবিলম্বে / জঠরের জ্বালা আর সহে না তারা — —'।।

সাধকের মনে-প্রাণে এই জ্বালা জেগে ওঠে, পরম প্রাপ্তির জন্য—তাকেই বলছেন 'জঠরের জ্বালা আর সহে না তারা'। কেননা তার আগেই বলেছে তো-'মোক্ষ প্রসাদ দাও অম্বে এ সুতে অবিলম্বে'। তিনি কারণানন্দ বা পূর্ণানন্দ স্বরূপ। পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অন্ন বিতরণ করছেন নিত্যকাল। তাই তিনি অন্নপূর্ণা। অন্ন প্রাপ্তির পূর্ণতা যেখানে। এদেশের বাতাসে সেই গান ভেসে বেড়ায়—অন্নদে, অন্নদে গো, অন্নদা।

শিব কোন অন্ন চাইতে পারেন? শিব কোন অন্নের ভিখিরি হয়ে অন্নপূর্ণার দ্বারে এসেছেন? মা স্থূল অন্ন বিতরণ করছেন, সূক্ষ্ম অন্ন-জগতের যত সদ্‌ভাব তা বিতরণ করছেন, আবার তিনি কারণ-অমৃত দান করে সাধকের অন্তর পূর্ণ করছেন। অন্নপূর্ণা পুজো সেই অর্থেই নিতে হবে—যেখানে শিব প্রত্যাশী হয়ে আছেন মায়ের কাছে। মূর্তিটা তো তাই। সেটাই মানুষ পুজোর আসনে বসিয়েছেন। ভারতবর্ষের এটা একটা আধ্যাত্মিক ভাবনার চরম।

ইদানীংকালে রবীন্দ্রনাথ এরকম ভাব প্রকাশ করেছেন। খুব সুন্দর একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন—'গভীর উপবাস'। উপবাস যেখানে গভীরতম পর্যায়ে চলে গেছে, সেখানেই মোক্ষ অন্ন আসছে।' জেগে রব গভীর উপবাসে, অন্ন তোমার আপনি যেথায় আসে- -বসে রব সেথায় অন্ধকারে'। নিরন্ধ্র প্রতীক্ষার অন্ধকারে সেই আলোর প্রসাদ আসবে।' 'নাইবা ডাক রইব তোমার দ্বারে'-আবদারের সুর। ভাবনাটাকে জাগাতেই হবে।

কামাখ্যাধাম

উপনিষদের মন্ত্র আছে-এক নির্বিশেষ ব্রহ্ম ছিলেন, তিনি কামনা করলেন, আমি নিজেকে বহু ভাবে বিকশিত করব। এই তাঁর বিলাস, আস্বাদন। তৈত্তরীয় উপনিষদের- 'সোহ কাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি'। তিনি বহু ভাবে নিজেকে বিকাশ করলেন। এই আদি কাম। কাম বলতে আমরা যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অর্থ বুঝি সেই অর্থে নয়। ঘটনা হিসাবে বিজ্ঞানও তাই বলছে-বিগ ব্যাং-এক কৃষ্ণ বিন্দু ছিল তার থেকে বহু ভাবে এই সৃষ্টি বিকাশ লাভ করল। কি দরকার ছিল, কি করে হল, তারতো উত্তর নেই, কিন্তু হয়েছে, এটা বিজ্ঞান বলছে। সৃষ্টির আগে কি ছিল-মহর্ষি শ্বেতশ্বতর বলছেন-তাকে সৎও বলা যাবে না, অসৎও বলা যাবে না, বলা যেতে পারে শিব।

এইবার তন্ত্রে কি বলছে? এই যে নির্বিশেষ নিজেকে বহুভাবে বিকাশ করলেন, এটা হচ্ছে ব্রহ্মের বা শিবের নিগ্রহ শক্তি। নিগ্রহ করলেন নিজেকে। এক স্বরূপ ছিল, তিনি নিজেকে প্রচ্ছন্ন করলেন, আবরিত-বিক্ষেপিত করলেন-নাহলে তো বিকাশ হয় না নানা ভাবে। মুণ্ডক উপনিষদে, চৈতন্য চরিতামৃতে এসব কথার বিস্তার।

এরপর দ্বিতীয় শক্তির খেলা শুরু হল। অনুগ্রহ শক্তি জেগে উঠল ব্রহ্মের মধ্যে। অনুগ্রহ শক্তিতে এই সৃষ্টি আবার স্রষ্টার দিকে ফিরে চলল। তাতে চিৎশক্তির অধিকাধিক আবির্ভাব শুরু হল। ফিরে চল আপন ঘরে। এই অনুগ্রহ শক্তি, এই হচ্ছে দ্বিতীয় কাম। কি কামনা জেগে উঠছে? এই সৃষ্টি আবার স্রষ্টার স্বরূপে ফিরে যাচ্ছে। তিনিই সব হয়েছেন, তিনি ছাড়া তো আর কিছু নেই। না, এইভাবে নয়, আবার নিজের স্বরূপে ফিরে পাব, ফিরে যাব। এই তন্ত্রের ভাষায় মহাকাম। আর, যা পরম তত্ত্ব অনুভবের কথা, সাধকরা এই সৃষ্টির মধ্যেই তার সব কিছুর বিকাশ দেখছে। অন্তরে এই সৃষ্টির মধ্যে যে নিগ্রহ, অনুগ্রহ শক্তি, প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে শুদ্ধ-অশুদ্ধ-তুলসী গাছ, নিম গাছ পবিত্রতার আস্পদ। এদের মধ্যে আবার পবিত্রতার স্বরূপগত ভাব জেগে উঠেছে। আমাদের অন্তরে গঙ্গা আর বাইরের গঙ্গা। বাইরের গঙ্গাকে পুজো করছি অন্তরের গঙ্গার বোধ জেগে উঠছে। সাধকদের অনুভবের মধ্যে সচেতনভাবে সেই পরম কামকে জাগাবার এবং সেই কামনাকে পূর্ণ করার তপস্যা। এই গোটা সৃষ্টির মধ্যে সেই এক ছন্দ, এক তপস্যা এবং সাধকদের অন্তর ক্ষেত্রেও সেই অনুগ্রহ জাত কামনার শক্তি জেগে উঠছে, স্পন্দিত হচ্ছে, বিবর্ধিত হচ্ছে। সৃষ্টির মধ্যেও মহাপুরুষরা দেখেছেন সেই ভাবনার স্পন্দন আর সাধকদের অন্তর ক্ষেত্রেও সেই ভাবনার স্পন্দন জেগে ওঠে। সাধক তার সাধনার চরমে আবার স্রষ্টার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

যে মাকে পুজো করি অন্তরে, সেই মাকে বিগ্রহ করেছি। তেমনি মহাপুরুষরা সেই সব স্থান নির্দেশ করে গিয়েছেন, সেখানে সৃষ্টির মধ্যে ও সেই পরমের প্রতি আকুতি, কামনা স্ফুরিত হয়। এই ভাবে অধ্যাত্ম ভারতবর্ষের দিকে দিকে কতই না সতীপীঠের প্রকাশ হয়েছে এবং তার মধ্যেও শাস্ত্র নির্দেশিত নির্দিষ্ট তন্ত্রের আধিক্যে বিভিন্ন বিচিত্র মাতৃ-তীর্থের প্রকাশ-বিকাশ। তখন তো লোকালয় ছিল না, তীর্থ ছিল না, মন্দির ছিল না, গভীর অরণ্য, পাহাড়, ঋষি-অধ্যুষিত স্থান। সেইসব জায়গা তাঁদের ইচ্ছেয় স্ফুরণ হয়েছে। এখন তীর্থ হিসাবে গড়ে উঠেছে।

গোটা সৃষ্টিটাই আবার স্রষ্টার কাছে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু অচেতন ভাবে, চিৎশক্তি কম আছে তো। কিন্তু সাধকের উন্নত পবিত্র আধারে এই ফিরে যাওয়াটা হচ্ছে সচেতন ভাবে। সচেতন ভাবে সে ফিরে যাচ্ছে তার তপস্যার মধ্যে দিয়ে-তারা শুদ্ধতম আধার, তারা সেই অনুগহ শক্তির উজান স্রোতে ভাসছে। আমার কামনা, আমি আবার ফিরে যাবো আমার স্রষ্টার কাছে, একীভূত হব। এই কামাখ্যাধাম এই সব কিছুরই প্রতীক। মা আবার কামেশ্বরী। শিবের নাম কামেশ্বর। আবার তিনি শুদ্ধতমা, সেই অর্থে কুমারী। তাই ওখানে কুমারী পূজা।

বামদেব তারানাথকে—তাঁর প্রিয়তম শিষ্য, বহু জন্মের তপস্যা সঞ্চিত করে এসেছেন, তাই অনেকসময় ভালোবেসে বলেছেন, দাদা সেই তারানাথকে বলছেন-'যান দাদা, কামরূপ জয় করে আসুন'। এ তো লাঠিসোটা নিয়ে নয়। ওঁনাদের কথা ওনাদেরই জন্য।

কেমন সুন্দর কথা আছে দেখ। সেই অধ্যাত্ম সূর্যের একশত এক রশ্মি চারদিকে বিকীর্ণ হয়ে আছে। এই অনুগ্রহ শক্তির একটা রশ্মি সাধককে টেনে তুলছে বা সাধক তাকে আশ্রয় করছে। বিশ্বপ্রসবিনী মা এখানে আত্মজ্ঞান প্রদায়িনী। তাকে বলছে-ফিরে চল। আত্মশক্তির 'ইক্ষন আত্মস্বরূপের প্রতি। যে খবর পায় সে ব্যাকুল হয়। এক শত রশ্মির বন্ধন ছিন্ন করে সে এক রশ্মির আশ্রয় করে সেই পরমের সঙ্গে পরম কামনায়

মিলিত হয়। তন্ত্রাচার্যগণেরা বলছেন-শিখর দেশে আছে এ বিদৃতি দ্বার, সাধনার চরমে তা উচ্ছলিত হয়ে উঠে পরমশিব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

অকালবোধন

শ্রীরামচন্দ্র অকালবোধন করেছিলেন। তার মানে কি?- প্রত্যেকটা সাধকই অকালবোধন করছে। স্বাভাবিক প্রগতিতে কোন না কোন জন্মে সবাই তো ব্রহ্মলীন হবে। সৃষ্টিই ব্রহ্মলীন হবে, অধিক কথা কি। কিন্তু তর সয় না। তাই-শ্রীরামচন্দ্র অকালবোধন করছেন, আর রামের ভক্ত যাঁরা, তারাও অকালবোধন করছেন- তীব্র তপস্যা। হনুমান—যে অমন বিশাল শক্তিমান, সেই হনুমান পর্যন্ত যোগাড় করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। আর লক্ষণ তো আছেই। সাধকের ক্রিয়া বা সাধক শক্তি আর শরণাগতি।

এত কাণ্ড করে পুজো করতে গিয়ে দেখলেন তাও একটা পদ্ম কম—হিসেবটা মিলছে না, মা লুকিয়েছেন? শেষে মনে করলেন, লোকে বলে আমার চোখ পদ্মের মত, আমার চোখই উঠিয়ে দেব। তার মানে-কি কঠিন, কঠোর তপস্যা। —মা জেগে উঠলে বিশাল যুদ্ধ জয়। তেমনি প্রত্যেক সাধক, সাধক বলতে, ধর্মাচরণ কারো জীবনে অবসর বিনোদন, আর কোন কাজ নেই, চল যাই ধর্মাচরণ করি, ধর্মাচরণ কারো জীবনে নিয়মমাফিক ব্যাপার- যেমন বাথরুমে যাচ্ছে, কি অফিস যাচ্ছে তারাই যাদের ধর্মাচরণটা হচ্ছে জীবনধারার মধ্যে, জীবনে যেমন নিশ্বাস, তেমনি, মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচে না, সেই রকম, তাদের সমস্ত সত্তার মধ্যে সেই এষণাটা জেগে আছে—সেই সাধকদের কথাই বলছি, যথার্থ অর্থে তারাই সাধক, আর কেউ সাধক নয়, প্রবর্তক মাত্র। সেই সাধক যারা, তারা তীব্র তপস্যার মধ্যে দিয়ে অকালবোধন করছেন। এক্ষুনি, এই জন্মেই আমাকে অন্তর ক্ষেত্রে যুদ্ধ জয় করতেই হবে। এটা অকালবোধন বলেই তীব্র পুজো, তীব্র তপস্যা। বলে না, একেবারে দশভূজা। রামচন্দ্র সেই বিশাল পুজোর আয়োজন করেছিলেন। সমস্ত বিরূপতা উজিয়ে প্রত্যেককে সেই তীব্র তপস্যার মধ্যে দিয়ে মায়ের প্রসন্নতা লাভ করে যুদ্ধ জয় করতে হবে। বাইরের বিশাল আয়োজন-আড়ম্বর একান্ত-গভীর তপস্যার বিরোধী।

কুম্ভকর্ণ বধ, রাবণ বধ, বিভীষণের প্রতিষ্ঠা-এ সব তীব্র তপস্যা ছাড়া হবে না। আমাদের গভীর তপস্যার মধ্যে দিয়ে নিম্নতর উপাদানের যে সব পরমাণু আছে, সেইগুলো শরীর থেকে গেটআউট হয়ে যাবে। শরীরটা দেখতে এরকমই থাকছে, কিন্তু সেইগুলো বেরিয়ে যাবে একের পর এক। বাঁচা-মরা এক হাতে। মনে মনে নয়, সাক্ষাৎ ভাবে সেই পুঞ্জিতভূত তমো রাশি। যেমন চণ্ডীতে আছে, ব্রহ্মার স্তবে নারায়ণের মুখপদ্ম থেকে, বাহু, নেত্র, উদর থেকে বিপুল তামসিক শক্তি বেরিয়ে যাচ্ছে। বস্তুতপক্ষে সাধকের তামস, রাজস, সবরকম অপশক্তি বেরিয়ে যাচ্ছে-তামসিক একটা কথা বলেছে। বিপুল পরিমাণ উপাদান, যেগুলো আমাদের চিন্ময় জগতে চিরপ্রতিষ্ঠিত করার সহায়ক নয়, সেই সমস্ত শক্তি। তীব্র সংঘাত সৃষ্টি হয় স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক শরীরের প্রতি অণু-পরমাণুতে ঈশ্বর চিন্তার মধ্যে দিয়ে! তাহলে সেই ঈশ্বর চিন্তা কত গভীর হতে হবে চিন্তা কর। দেখতে পাওয়া যাবে-চোখের সামনে- সেই পুঞ্জিতভূত অপ শক্তিগুলো শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর, শরীর আরও দিব্য উপাদান, দিব্য তেজ, দিব্য জ্ঞান ধারণ করবে। নারায়ণের স্তব শুনেছ তো! 'সত্ত্বগুণাকর দেহী পদম্।' সত্ত্বগুণাকর—সত্ত্বগুণের আকর। পরম শুভ সত্তার পরমাণুগুলো শরীরের

মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে। সৃষ্টির অনু-পরমাণু তে যে শুদ্ধতর পরমাণু আছে, সেইগুলো সাধক শরীরে আকর্ষণ করে। শরীর সত্ত্ব বা দিব্য গুণাশ্রিত হয়। কুম্ভকর্ণ মারা গেল, রাবণ মারা গেল মেঘনাদ বধ হ'ল—চিন্তা কর। সবই এই ভেতরেই হচ্ছে। রামচন্দ্র তীর নিয়ে নিজের চোখটাকে বার করে দিতে গেল। সেই সংকল্পশক্তি—আমার শরীর যাক আর থাক। শরীর-মন কাঁপছে, আসন টলমল হয়ে যাচ্ছে। ভয়, পাগল হয়ে যাব না কি? সারদা মা বলছেন, 'বাবা, তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? আমার কোন্ ছেলেটা পাগল হয়েছে?' ব্যস, মনে সাহস এসে গেল। ভয়ানক তপস্যা। এই অকালবোধন করে রামচন্দ্র ত্রিভুবনবিজয়ী হয়ে আছে। আর যারা ত্রিভুবন জয়ী, তারা সব ত্রিকালজয়ী হয়ে আছে।

রামনবমী

একটা মজার দিক এই যে, রামচন্দ্র শরৎকালে শ্রীশ্রীদুর্গা পুজো শুরু করেছিলেন, আর প্রাচীন যে পুজো, বাসন্তী দুর্গা পুজো, তার সঙ্গে কিন্তু রামচন্দ্রের জন্মের, অর্থাৎ রামনবমী যোগ থেকেই গেল। অর্থাৎ, রামের সঙ্গে দুর্গাপুজোর যোগ থাকছেই, আলাদা করা যায় না। বলা হয় রামচন্দ্র পরব্রহ্মের শক্তি অবতার। জগতের ভগবত বিরোধী অশুভ শক্তিকে দমন করার জন্য তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এর পাশাপাশি আমাদের মনে পড়ে যায়—ত্রেতা যুগাদ্যা ধনুর্বাণধারী শ্রীজগদ্ধাত্রী ঠাকুর, সারদা মায়ের পুজো চাইছেন। ত্রেতা অবতার শ্রীরামচন্দ্র। কবীরদাসজীর দোঁহা আছে-

'যো রাম দশরথ কা বেটা,
ওহি রাম ঘট ঘট মে লেটা।
ওহি রাম জগত পসেরা,
ওহি রাম সবসে নিয়ারা।।'

দর্শনে বা পুরাণে চারটি জিনিস প্রতিষ্ঠিত করা হয়—জীব তত্ত্ব, জগৎ তত্ত্ব, ঈশ্বর তত্ত্ব, আর নির্বিশেষ। 'যো রাম দশরথ কা বেটা-ঈশ্বর তত্ত্ব-সগুণ ব্রহ্ম আর এক ধাপ নেমে এসেছেন। যখন 'দশরথ কা বেটা' বলছে, তখন তিনি অবতার শ্রীরামচন্দ্র।

জীব তত্ত্ব—প্রত্যেক জীবের মধ্যে তাঁর অধিষ্ঠান আছে। তাই 'ঘট ঘট মে লেটা' ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অনু চৈতন্য হয়ে প্রতি জীবে অধিষ্ঠান করছেন। জীব তাঁর অংশ সম্ভূত তিনি পূর্ণ। এই অংশ কিসের? ঈশ্বরে তো অংশ হয় না? এই অংশ উপাধি, মায়িক। আবার তিনি জগৎ তত্ত্ব। শ্রীরাম জগৎ রূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন আর এক রূপে। 'জগৎ পসেরা'-এই বিশ্ব ব্যাপার তাঁর লীলা, তাঁর প্রকাশও বটে। তাঁর একটা দেহ।

আর, 'সবসে নিয়ারা?' শ্রীরাম সবার অন্তরালে নির্বিশেষ স্বরূপে বিরাজ করছেন, সব তত্ত্বের অতীত স্বরূপে বিরাজ করছেন। এই জগৎ প্রপঞ্চ তাঁর বিলাস, আবার জগৎ, প্রপঞ্চাতীত হবে, বিলীন হবে তাঁতেই। শ্রীরাম নামে সব নামের আসা যাওয়া।

পদ্মপুরাণে বলছে, "রমন্তে যোগীনোহন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনসৌ পরমব্রহ্ম অভিধিয়তে।।"

সাধকরা, যোগীরা আত্মশক্তির উদ্‌বোধনের মধ্যে দিয়ে পরব্রহ্মের রমণ করেন, আস্বাদন করেন। তাই 'রমন্তে ইতি রাম। সেই রাম।

রাম তোমাকে বলতেই হবে। যেখানে ওঁকার বলছে, সেখানেও রাম। সেই আকার

ম'কার এসে যাচ্ছে। ওঁকারের মধ্যে রাম আছে। আদি, অন্ত সেখানে ধরা আছে, সৃষ্টি আর লয়। সৃষ্টি আর লয় বললে স্থিতিও এসে যায়। সৃষ্টি আর লয়ের মধ্যবর্তী হচ্ছে স্থিতি। কাজেই ওঁকার ভজছে সেখানেও রাম 'অ', 'ম'। ওহি রাম সবসে নিয়ারা। নির্বিশেষ তত্ত্ব। সব রাম, রাম ছাড়া কোন কাম নেই।

অনেক ছোট ছোট শ্লোক আছে রাম নিয়ে। প্রত্যেকটার মধ্যেই সুন্দর অর্থ আছে। যেমন বলে, জীব বারবার এই জগতে আসছে, ভাবছে, এটা পেলে শান্তি, ওটা পেলে শান্তি, কিন্তু শান্তি অনেক দূরে থেকে যাচ্ছে, মায়া মরীচিকার মত। শ্রীভগবানের কাছেও নানা ফর্দ চাইছে। এই ভাবে জীব জন্ম-জন্মান্তর ধরে দৌড়চ্ছে, তার বিরাম-বিশ্রাম নেই। জীব যখন বুঝতে পারবে, সচেতন হবে-ঈশ্বরেই সব কিছুর সমাধান, তখনই সে শান্ত হয়ে যাবে। যখন বুঝবে ভগবানের আনন্দই আমার জীবনে একমাত্র শান্তি দিতে পারে, তখন সে সেই খোঁজাটাকেই বলবতী রাখে। তাই একটা পদ আছে—'যাঁহা রাম ওহি আরাম, যাঁহা আরাম ওহি রাম'। রামায়েত সাধুদের দেখেছি তো, তাঁদের জীবন দেখেছি, কতই না রামানন্দে থাকেন।

আবার যেমন কৃষ্ণচন্দ্র বলেন, 'ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র'। যোগীরা বলছেন, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র হচ্ছে আমাদের এই শরীর, যেখানে ভালো-মন্দের যুদ্ধ চলছে, ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র যখন সারথী হচ্ছেন, তখন জয় হচ্ছে তাঁর কৃপা কটাক্ষে। সেইরকম অযোধ্যা সম্বন্ধেও বলে, এই শরীর হচ্ছে অযোধ্যা। তবে কেন রামচন্দ্রের দর্শন পাই না? না, অযোধ্যায় নানা কোলাহল, নানা অশান্তি, যখন এই শরীরে যথার্থ অযোধ্যা প্রতিষ্ঠিত করতে পারব, রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারব, তখনই শ্রীরামচন্দ্রের দেখা পাব আমাদের হৃদয় সিংহাসনে। তাই 'রাম বিনা দুঃখ কৌন্ হরে'। 'যাঁহা রাম ওহি অযোধ্যা, যাঁহা অযোধ্যা ওহি রাম।' এটা যেমন ওটাও তেমন।

পরশুরাম না আসলে এই রামের প্রকাশ হয় না। ছোট একটা সূত্র দিচ্ছি। ক্ষাত্র শক্তি কেন? ক্ষাত্রশক্তির প্রয়োজন কি সমাজে? না, ক্ষাত্র শক্তির প্রয়োজন এখানেই সত্ত্বগুণাশ্রিত ব্রাহ্মণ্য শক্তিকে রক্ষা করা-প্রকাশ করা। রজোগুণ না থাকলে প্রকাশ হয় না। রজোগুণের এক প্রান্ত হচ্ছে সত্ত্বগুণাশ্রিত প্রান্তিক ব্রাহ্মণ্য শক্তি। সেই শক্তির আর এক দিক তমোগুণাশ্রিত হীন শক্তি। ক্ষাত্র শক্তির কর্তব্য হল সত্ত্বগুণাশ্রিতকে রক্ষা করা, তমোগুণাশ্রিতকে বিনাশ করা। আরও নীচে নামলে, সবলের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করা।

সমাজে যখন তমোগুণাশ্রিত ক্ষাত্র শক্তি প্রকাশ হল, পরশুরামের আবির্ভাব হল। একুশবার তিনি ক্ষাত্রশক্তিকে নিপাত করেছেন। কোন ক্ষাত্রশক্তিকে? তমোগুণাশ্রিতশক্তিকে রজোগুণাশ্রিত ক্ষাত্রশক্তিকে বিনাশ করেন। নাহলে রামচন্দ্র এলেন কি করে পৃথিবীতে? নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন সেই ক্ষাত্রশক্তিকে যে ক্ষাত্রশক্তি তমোগুণাশ্রিত হয়েছিল। সত্ত্বগুণাশ্রিত ক্ষাত্রশক্তির মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাকে নিয়ে ফিরছিলেন, তখন সামান্য পরীক্ষার পরই স্বীকার করে নিলেন শ্রীরামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করে। তিনি সেই শুভশক্তিকে প্রকাশ করতে পারবেন, এটাই পরশুরাম বলতে চাইছেন। যে মুহূর্তে রামচন্দ্রকে স্বীকার করে নিলেন, সেই মুহূর্তেই পরশুরামের কাজ শেষ।

'শক্তি যেখানে নিজের মদমত্তায় ভুগছে সেই সেই প্রভাব থেকে শ্রীরামচন্দ্র শুদ্ধ ক্ষাত্র শক্তিকে উদ্ধার করেছিলেন। যেখানে ক্ষাত্র শক্তি তমোগুণাশ্রিত হয়েছিল, তাদের বিনাশ

করেছেন। আবার সত্ত্বগুণাশ্রিত ক্ষাত্র শক্তি বিভীষণকে রক্ষা করেছেন। দুজনেই তো রাক্ষসকুলে ছিলেন, আলাদা কূলে তো ছিলেন না। দুজনেই ক্ষত্রিয়, কিন্তু একজন সত্ত্বগুণাশ্রিত ছিলেন, আর একজন তমোগুণাশ্রিত। এজন্য রামচন্দ্রকে শক্তির অবতার বলা হয়। শুরু থেকেই বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠাদি ঋষির কাছে শিক্ষা-দীক্ষা নিয়েছিলেন। এঁরা সবাই শক্তিবাদী। সেই কাজ আগে থেকেই শুরু করেছিলেন পরশুরাম, শেষ করেছিলেন শ্রীরাম।

মানুষ তপস্যা করে, তপস্যার মধ্যে দুটো দিক আছে—যে কোন সাধকই বুঝতে পারে—একটা আমি, একটা তুমি, এছাড়া তো সাধনা হয় না। একটা প্রান্ত আমি, একটা প্রান্ত তুমি। আমি সাধনা করে ঈশ্বর লাভ করব, আবার তুমি ছাড়া গতি নেই, একশোভাগ ঠিক। সাধারণ সাধকের মধ্যে যখন খুব বেশি তুমি বেড়ে যায়, তখন সাধনার ভাব কমতে শুরু করে। আবার যখন আত্ম-কর্তৃত্বের বলে প্রচণ্ড ভাবে সে সাধন-ভজন করছে, তখন আবার আমি'টা বেড়ে যেতে থাকে, তুমি-টা কমে যেতে থাকে। আমি তোমাকে পাবো। সাধারণ সাধকের মধ্যে এই সংঘাত চলতে থাকে, ভারি কঠিন রাস্তা—আমি-তুমি'র সংঘাত। দুটোর সাম্য করেই সাধনা করতে হবে। নিরন্তর বিড়াল ছানার মিউ মিউ ডাকটিও চাই, আবার মা এসে উদ্ধার করবে-সেখানেই সফল হয়। আগুন আর জল এক-সঙ্গে। সাধক মাত্রেই এটা অনুভব করে। আবার যখন সাধনা বাড়তে বাড়তে যথেষ্ট এগিয়ে যায়, তখন সাম্য হয়। দুটোর সাম্যের মধ্যে দিয়েই সুস্থ আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ। যেখানে কর্তৃত্বাভিমানে তপস্যার তীব্রতা, শরণাগতি যেখানে দিনের পর দিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না, এই অসুর শক্তি। দেব শক্তি যেখানে, সেখানে তুমিকে বড় করে রেখেছে। যখন দৈবাৎ দেবতারা ভুলে যাচ্ছে, তখন মা এসে দেখা দিচ্ছেন। উমা-হৈমবতীর উপাখ্যান আছে—দেবতারা যখন খুব বলদর্পে গর্বিত, তখন মা এসেছিলেন। দেবতারা তখন স্বধর্মচ্যুত হচ্ছে, এটা তো উচিত নয়। মা দেখা দিলেন। অগ্নি বলল, আমি সব জ্বালতে পারি, বায়ু বলল, আমি সব উড়িয়ে দিতে পারি, বরুণ বলল, আমি সব ভাসিয়ে দিতে পারি। মা একখণ্ড তৃণ দিয়ে বললেন, দাও তো পুড়িয়ে, উড়িয়ে, ভাসিয়ে দাও তো। তারা সেই এক খণ্ড তৃণের কিছুই করতে পারল না। অধোমুখে তখন মায়ের স্তব করলেন। তখন মা বললেন, আমি সবার মধ্যে অধিষ্ঠিত আছি, আমার শক্তিতেই সব কিছু হচ্ছে। বেদের মাতৃ তত্ত্ব এখানে প্রতিষ্ঠিত।

দেবতারা তুমি-কে রেখেছে আগে, পরে আমি-তপস্যা। শরণাগতি, তারপর তপস্যা। তা রাবণ-রাক্ষস কিছু নয়, যেখানে সে যত বড় তপস্বীই হোক, আমি-টাকে এত বাড়িয়ে দিয়েছে যে, তুমি-টাকে পাওয়া যাচ্ছে না।। রাবণ আর বিভীষণ। শত শত বৎসরের কঠোরতম তপস্যায় ভগবান দেখা দিলেন, বললেন, কি চাও? রাবণ চিন্তা করল, আমি বড় বুদ্ধিমান, চিন্তাভাবনার পর বর নিতে হবে ভগবান যখন এসেছেন। মানুষের ভয় হচ্ছে মৃত্যুভয়, সুতরাং মৃত্যু যাতে না হয় তারই ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষ তো কীট, আমার সামনে আসতেই ভয় পায়। দেবতা বা অন্তরীক্ষচারী কেউ হয়ত ক্ষতি করলেও করতে পারে। বলল, আমার বিচারে এই বর দাও, তারা কেউ যেন আমাকে মারতে না পারে। ভগবান দেখলেন খুব সুবিধে হল। বললেন, তথাস্তু। বিভীষণকে বললেন, কি বর চাও? বিভীষণ দেখল, জগতের সব কিছুই অনিত্য, একমাত্র নিত্য ভগবান, একমাত্র চির নির্ভয়, চির শান্তি ভগবানের পাদপদ্ম। তাই বলল, সুখে, দুঃখে, সম্পদে-

বিপদে, জীবনের যে কোন পরিস্থিতিতেই আমার যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে অচলা ভক্তি হয়, কখনও কোন অবস্থায় যেন সেখান থেকে চ্যুত না হই। তখন নারায়ণের আসন টলে গেল। তিনি বললেন, তথাস্তু। আমি চিরতরে তোমার কাছে বাঁধা পড়লাম। তা, এই দেখ রাবণের বধের কথা, সব জানেন নারায়ণ, মানুষের রূপ ধারণ করে তাকে বধ করেছিলেন। তাই মৃত্যুকালে রাবণ নারায়ণের স্তব করছেন। এখানেই বিভীষণ আর রাবণের ফারাক। দুজনেই তপস্যা করেছিল, কিন্তু তপস্যার মধ্যে দুজনের যে মানসিকতার ফারাক ছিল, তাতেই একজন অসুর আর একজন ভক্ত হল। দুজনেই পেল, কিন্তু একজন যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে, আর একজন আনন্দের মধ্যে। অসুর রাবণ সাধক বটে। রাবণের মত তপস্বী কি আছে?

শক্তি কথাটা নিরপেক্ষ বটে, কিন্তু শক্তিমান যখন বলি, তখন শুভ-অশুভ দুটি দিকই থাকতে পারে। তাই দেব ভাব আর অসুর ভাব, দেব ভাবে পেয়েছে বিভীষণ, আর অসুর ভাবে রাবণ। একজন দেবতা, আর একজন রাক্ষস হতে পারে না, দু ভাই তো! ভাবনাতেই দেবতা আর রাক্ষস। মানসিকতার ফারাক। আর এই ফারাকের মধ্যে দিয়েই রামলীলা চলছে নিত্যকাল।

দোল

আজকে ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমা। শুধু আজকের তিথিটা নয়, এই মাসে এবং এই তিথিকে ঘিরে আরও অনেক আগের দিন থেকে আমাদের দেশে রঙের উৎসব শুরু হয়। এই রঙের উৎসব—বিশ্ব প্রকৃতি যে শীতের জড়তা কাটিয়ে ওঠে, প্রাণ এখানে নতুন করে, পূর্ণতার রূপে সঞ্জীবিত, স্ফুরিত, বিকশিত হয়। সেই প্রাণের প্রকাশ শুধু গাছ, লতা-পাতা, ফুলে-ফলে নয়, প্রতিটি মানুষের মধ্যে, প্রতিটি প্রাণের মধ্যে নব জীবনের সঞ্চার করে। মানুষ এখানে উদ্দীপিত হয় তার প্রাণের গরিয়সী মহিমায়। দেখা যায় পাখীর কণ্ঠে নতুন সুর আবেগ লাভ করে। মানুষের প্রাণেও নতুন জীবনের ছোঁয়া। এই থেকে অনেকে মনে করেন, এই বসন্ত উৎসব বস্তুতপক্ষে প্রাণের উৎসব, যৌবনের উৎসব।

কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি অধ্যাত্মমুখী, আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই চরম সার্থকতা খুঁজে পায়। তাই আমরা দেখি ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র এই ফাল্গুন মাসে দোল উৎসবকে ঘিরে তাঁর প্রিয়জনের সঙ্গে রঙের উৎসবে মেতেছিলেন, আনন্দ উৎসবে মগ্ন হয়েছিলেন, এটাই যথার্থ কথা। ভক্তি ভাবনায় ভগবানকে নিয়ে যে আনন্দ উৎসব তা খুবই মর্যাদাসম্পন্ন, খুব বড় করে দেখা হয়। ভগবান যখন এই পৃথিবীতে, এই ধূলার ধরণীতে নেমে এসেছিলেন, তাঁকে পাওয়ার জন্য যুগ-যুগান্ত ধরে যেসমস্ত মুনি-ঋষিরা কঠোর সাধনায় মগ্ন ছিলেন-বলা হয়, ৬০ হাজার বাল্যখিল্য ঋষিরা তাঁর আগমন সংবাদ জানতে পেরে বৃন্দাবনের ব্রজবালক এবং ব্রজগোপী রূপে জন্ম নিয়েছিলেন তাঁকে ঘিরে আনন্দ করবেন বলে। এবং, এই বসন্ত ঋতুতে চতুর্দিকে প্রাণের প্রকাশের মধ্যে তাঁরা তাঁদেব ভক্তিপ্লুত প্রাণের আবেগে মেতে উঠেছিলেন পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে নিয়ে। এটাই খুব বড় করে আমরা দেখি, জানি, মানি।

বৈষ্ণব কবিরা আবেগ-আপ্লুত বহুতর কবিতা, গান লিখে গিয়েছেন এই সম্বন্ধে। যা

আমাদের ভাব-সম্পদকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। ভারি সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকেছেন। ব্রজগোপ এবং গোপীরা কৃষ্ণচন্দ্রের অঙ্গে ফাগ এবং বিভিন্ন ফুলের মালা বা ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছে। এবং তাতে কৃষ্ণচন্দ্রের সারা শরীর সেই ফুলে সজ্জিত শুধু নয়, ভক্তের ভক্তির আতিশয্যে, ভক্তির ছোঁয়ায় রোমাঞ্চিত, কম্পিত, হর্ষযুক্ত হচ্ছে এবং তাঁর আনন্দে-তাঁকে ঘিরে আনন্দ করছেন যারা, তারাও অধিকাধিক আনন্দিত হচ্ছেন। উপনিষদের যে ভাবনা, তিনি রস স্বরূপ তাকে আস্বাদন করে এই পৃথিবী অধীর আনন্দে আনন্দিত। এই যে সব কথা- রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ংলবদ্ধানন্দী ভবতি, তিনি রসের রস স্বরূপ এবং তাঁকে আস্বাদন করে এই চরাচর আনন্দে মগ্ন হয়ে আছে। এই কথা বৃন্দাবনের মাটিতে নতুন করে বাস্তবায়িত হয়েছে, বিশেষ করে এই দোল উৎসবের মধ্যে দিয়ে। দোলের উৎসবের মধ্যে দিয়ে উত্তাল হয়ে, রাসের মধ্যে দিয়ে তা বিলীনের পথ নিয়েছে।

এমনও বর্ণনা আছে যে, এই কালে কাঁটা ভরা শিমুল গাছে যে থোকা থোকা লাল ফুল ফুঠে ওঠে, বস্তুতপক্ষে এই লাল ফুল কাঁটা ভরা শিমুল গাছে শুধু নয়, বসন্তে আরও বহুতর গাছে—অশোক, পলাশ, জীবন, এই ধরনের রঙের প্রকাশ দেখা যায়। বৈষ্ণব কবি কি সুন্দর বলছেন যে, এই গাছটা তো কণ্টকিত এতে থোকা থোকা ফুল ফুটে আছে আকাশে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে যেন কৃষ্ণচন্দ্রের গা ভক্তের ভক্তির ছোঁয়ায় কণ্টকিত হয়ে আছে, যেন শিহরিত হচ্ছে, আর সর্ব্বব্যাপ্ত রক্তিমাভ ফুলের সমারোহ, ফুল নয়, বুঝি বা ভক্তের দেওয়া অনুরাগ-রঞ্জিত আবীর তিনি প্রেমভরে ধারণ করে আছেন। অর্থাৎ যে ভক্তি ভগবানের প্রতি নিবেদিত হয়েছে, তা প্রসাদ রূপে ভক্তের কাছে সর্ব্বব্যাপ্ত হয়েছে। বৈষ্ণব কবি আকাশে-বাতাসে-সর্বত্রই সেই ভক্তির-ভগবানের প্রকাশ দর্শন করে বিহ্বল হচ্ছেন।

'আজকের এই তিথিতে আমাদের জীবনে আর একটা মহা তিথি যুক্ত হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন আমাদের বাংলার মাটিতে। এটা আমাদের কম আনন্দ, কম গৌরবের কথা নয়। এই প্রাচীন মহা তিথিকে তিনি আরও মহত্তর, আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত, গৌরবান্বিত করেছেন। সেদিন ছিল এই দোল পূর্ণিমার সঙ্গে গ্রহণ। এই গ্রহণে নবদ্বীপ গ্রাম হরি নামে মুখরিত, এমন সময় শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়েছেন।

এখানে গৌড়ীয় মহাজনরা ভারি সুন্দর সব মহৎ ছবি এঁকেছেন। বলছেন, এই দোলপূর্ণিমা এবং গ্রহণ, তাই চারিদিকে নাম-কীর্তনের জোয়ার, তার মধ্যে তিনি আবির্ভূত হলেন কেন? না, তিনি নাম প্রেমময়, নাম ভালোবাসেন তিনি, নাম ছাড়া থাকতে পারেন না, তাই এই সুযোগটাকে নিয়ে নামের আসরেই তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। আবার অন্যভাবে বলা হয়, গোটা নবদ্বীপবাসী নামের সাগরে ভাসছিল, এর মাঝে তিনি অবতীর্ণ হলেন। কেন না ভক্তের হৃদয়ে নাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা শুধু নয়, তিনিই তো নাম স্বরূপ। ভক্তের হৃদয়ে যেমন নাম রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, নবদ্বীপের মাটি আলো করে সেই নাম-বিগ্রহ স্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হয়েছেন।

আরও বহুতর সুন্দর বর্ণনা আছে। সেই বর্ণনার কোন শেষ নেই। আপনারা অবশ্যই এসব পড়বেন, আনন্দ পাবেন। আমি শুধু ভূমিকাই বলে যাচ্ছি।

এমনও বলা হয়, সেদিন নবদ্বীপে পথে-ঘাটে, গঙ্গার ধারে ধারে এত লোক নাম করছে, সবাই অবাক হয়ে গেছে—নবদ্বীপে তো এত লোক ছিল না, কোথা থেকে এসেছে। বৈষ্ণব মহাজনরা ভারি চতুর। বলছে, বুঝেছি, ভগবান অবতীর্ণ হচ্ছেন, তাই শুধু মর্তের

মানুষই নয়, স্বর্গের দেবতারাও অবতীর্ণ হয়েছে। নবদ্বীপের পথে-ঘাটে-মাঠে আনন্দ কীর্তন করছেন। কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই, মহা কোলোহল হল স্বর্গ-মর্ত ব্যেপে।....কেমন সুন্দর কথা। সবগুলোই সুন্দর, সবগুলো পড়লেই প্রাণ ভরে যায়।

বসন্ত আমাদের জীবনে চির-বসন্তের আভাস নিয়ে এসেছে। যখন এমনি এক বসন্তের দিনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম স্পর্শ করেছিলেন এই পৃথিবীর মাটি। পৃথিবী তার অযুত বছরের সূর্য প্রদক্ষিণের সাধনায়, অনন্ত বসন্তের আয়োজনে, বুঝি এই দিনটির জন্যই বার বার উজাড় করে ঢেলেছে তার বাসন্তি ফুলের অঞ্জলি।

আজকের ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের একটা গান খুব ভালো লাগে—'জীবনে পরম লগন করো না হেলা।' এতে ফাল্গুন মাসের কথা আছে-' ফাগুন যখন যাবে গো নিয়ে ফুলের ডালা, কি দিয়ে তখন গাঁথিবে তোমার বরণ মালা'। এই যে কথা, জীবনের বসন্ত এসেছে, একে তুমি পূর্ণ কর তোমার জীবনে এ যেন ফিরে না যায়, ব্যর্থ না হয়। তেমনি আমাদের জীবনের প্রতিটি সৎ মুহূর্ত প্রতিটি সুযোগ যেন ব্যর্থ না হয়। আমরা যেন এই জীবনের গভীর সম্ভবনাময় সোনার দিনগুলো সৎ ভাবনায়, ভাগবত চিন্তায়, মঙ্গল কর্মে অতিবাহিত করতে পারি, আমরা যেন ব্যর্থ না হই।

এই ভাবনা আর একজন মহাত্মাও তাঁর শিষ্যকে বলছেন শুনতে পাই। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি যোগানন্দজীকে বলছেন তাঁর যৌবনে, 'দেখ, জীবনে বসন্তে যদি তাঁকে ডাকতে না পার, শীতে কি করে ডাকবে? কেমন সুন্দর কথা। জীবনের পূর্ণতায় যদি তাকে ডাকতে না পারি, জীবনের শীর্ণতায়, শূন্যতায় কেমন করে কোন লজ্জায় ডাকবো? এই কথার কোন তুলনা নেই।

'জগতে তুচ্ছ গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত। ধন্য মনে করছি, সার্থক মনে করছি, কিন্তু যেদিন এই বসন্ত, এই সুযোগ, সম্ভবনাময় দিনগুলো জীবন থেকে চলে যাবে, সেদিন আর আমাদের গৌরবের কিছু থাকবে না; সেই আপসোস যেন না করতে হয়। আমাদের জীবনের সব সম্ভাবনা সেই মহা সম্ভাবনায় যেন সফল হতে পারে।

এরপর রমন মহর্ষির একটা কথা আমার খুব ভালো লাগে-বসন্তের কথায়। বলছেন, 'অনন্ত প্রাণের স্ফুরণ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হচ্ছে, অনন্ত শক্তির স্ফুরণ চারিদিক ঘিরে ফেলছে। তোমরা তো ভাবতে পার, এই শক্তি স্ফুরণ কোথা থেকে আসছে, কোন অতল, নিথর থেকে। কোন অব্যক্ত থেকে স্ফুরিত হচ্ছে নিত্য-নতুন উচ্ছল প্রাণের ধারা? সেই অব্যক্তের কথা ভাব। যেখান থেকে অনন্ত প্রাণ স্ফুরিত হচ্ছে, আর যেখানে এই অনন্ত প্রাণ নির্বাপিত হচ্ছে, সেই স্তব্ধতার কথা তোমরা ভাব।

বেদ-পুরাণ

বেদ মার্গে মানুষ তপস্যার মধ্যে দিয়ে ব্রহ্ম স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আর পুরাণ মার্গে ভগবান মানুষ হয়ে আসেন মানুষকে উদ্ধার করতে। শেষ পর্যন্ত মানুষ তাঁর পবিত্র পার্ষদ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈরাগ্য আর বিরহ, দুটো পথ সেই পরম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য। এই দুটো মার্গ আমাদের ভারতীয় ভাবনায়। বেদ মার্গ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অতটা প্রতিষ্ঠিত নেই, পুরাণ মার্গই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপে প্রচলিত।

তবে, পুরাণ মার্গের যে শুদ্ধতর রূপ, তা আমাদের ভারতবর্ষে আছে। পুরাণ মার্গের যে বিভিন্ন রূপ পৃথিবীতে বিভিন্ন দিকে প্রচলিত হয়েছে, তা মূলগত ভাবনা থেকে অনেক সহজকৃত করা হয়েছে। মানুষকে সহজ-সুলভ পথের প্রলোভন দ্যাখাবার প্রয়োজনে। এখানে তাঁর দায়টাই বিশেষ, আর সব গৌণ। তাই ওদের ভাবনায় ওরা অনন্তকাল শুয়ে থাকে ক্ষমা পাবার আশায় আর নিশ্চিন্ত স্বর্গ বাসের আশ্বাসে।

বেদ মার্গ আছে বলেই বেদান্ত মার্গ। পৌরাণিক মার্গে মানুষ স্ব-সামর্থে স্বরূপ হতে পারে না, তাই ভগবান নেমে এসেছেন, ধরা দিয়েছেন, মানুষকে উদ্ধার করছেন। পথের সাথীর ভাবনা পথের প্রান্তেও কিছুটা সঞ্চারিত হয়। এখানে দ্বৈত ধর্ম। যদিও সবকিছু মিলেমিশে শেষে সচ্চিদানন্দ স্বরূপই প্রোজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। তবুও মার্গের ভাবনায় অদ্বৈত ধর্ম আর দ্বৈত ধর্ম। এই দ্বৈতবাদ-ই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আরও তরলীকৃত ভাবে ধরা দিয়েছে। অথবা বলা যায় মানুষ সেই ভাবে সাজিয়েছে। তাই, অন্যান্য দেশে পুরাণ মার্গকে সরিয়ে নিয়ে গেছে ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার জায়গায়। কিন্তু মানব জাতির মহত্ত্বর উত্তরণের দায় বড় ক'রে দেখতে হবে।

বেদ মার্গের ব্রহ্ম ভাবনা পরিণতি লাভ করেছে তন্ত্রের শিব স্বরূপতায়। শিব-এর রূপ আমাদের কাছে এত মহিমান্বিত, কেননা, প্রত্যেক জীব-এর মধ্যে সেই শিব লুকিয়ে আছেন। ইদানীং কালের ভাবনায় সব ভাবনার সমন্বয় আছে। শিব-এর রূপ, বুদ্ধের রূপের কথা বললাম। আর আজকের দিনে রামকৃষ্ণ।

'শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম দেখ-কত অসহায় শিশু,অসহায় বাবা-মা'র কাছে এসেছেন, বন্দী জীবনের মধ্যে। কেন? তুচ্ছতার কারাগারে বন্দী, আমাদের হাত ধরবেন বলে। দুর্বল, অসহায় মানুষকে ধরবেন বলে, সেই হাত বাড়ানোর ছবি। কিন্তু সেখানেই আমরা থেমে থাকিনি, চলে গেছি সেখানে, যেখানে তিনি নিত্য দিনের রাজার রাজা। সেখানে তিনি তীরবিদ্ধ অসহায় নয়, সেখানে তিনি আপন মহিমানিলয়ে। প্রথম ছবি এই অসহায়, দুর্বল মানুষের ছবি, কিন্তু শেষ ছবি আমরা এটা মানি না, সেখানে তিনি গোলক, বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর, তাঁর দিব্য-স্বরূপে তিনি আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন। স্থির ছবি বৃন্দাবনে বাঁশি বাজাচ্ছেন, নিত্যকৃষ্ণ আর আমরা, আমাদের পূর্ণতায় তাঁর গুণমুগ্ধ পরিকর। শুধু নেমে আসার মধ্যে সহজ লোভের প্রশ্রয় আছে। কিন্তু তোমাকেও যেতে হবে, এখানেই যথার্থ সফলতার, সার্থকতার কথা।

(গড অফ ফিয়ার থেকে ওরা গড অফ লাভ বলছে,—এই কথা উঠলে বললেন।)

ওরা ঐখানে রেখেছে ধর্মটাকে, তিনি এসে হাত ধরবেন। আরে, গড অফ লাভ যদি সত্যি সত্যিই মানত, তাহলে কি এই ক্রুশ এর ছবি প্রধান ক'রে রাখতে পারত? ভাষাটাকে সরিয়ে নিয়েছে মাত্র। বেদ মার্গ বলছে জীবের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্ব সে একদিন স্ব-মহিমায় উপলব্ধি করবে। সেই বোধে একদিন পৌঁছবে। এখানেই অরিজিন্যাল ডিভাইনিটি। এখানে চরম অদ্বৈত তত্ত্ব। তৎ-ত্বমসি। এই ভারতবর্ষের মাটিতেই উৎসারিত হয়েছে এই ঋষি ধর্ম। আর একটা হচ্ছে পুরাণ মার্গ। ভগবান আসেন মানুষের মত মানুষের কাছে, তাদের পাশে এসে দাঁড়ান, তাদের উদ্ধার করতে, তাঁর যে আনন্দ-নিলয়, চিরশান্তি-নিলয়, সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তিনি মানুষের উদ্ধার কর্তা। এখানে ভক্তিবাদের বীজ আছে, ভক্তিবাদ এখানে আনন্দ-স্বরূপতায় অদ্বৈত ভূমি লাভ করেছে।

দুর্বল, অসহায় ভাবে তিনি নেমে এসেছেন, এখানেই শেষ নয়, তিনি মানুষকে তাঁর যে মহিমা-নিলয় আছে, সেখানে মানুষের সাথী হয়ে মানুষকে নিয়ে যাচ্ছেন, সেটাই বড় কথা। এই যে অদ্বৈত-নির্ভর এবং দ্বৈত-নির্ভর ভাবনা, তাকে আশ্রয় ক'রে বিভিন্ন শাস্ত্র এবং পুরাণাদি গড়ে উঠেছে। এবং দ্বৈত-নির্ভর যে অধ্যাত্ম ভাবনা, তাই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে বিস্তৃত হয়েছে। তবে ভারতবর্ষে এর যে পবিত্রতর, শুদ্ধতর রূপ দেখা যায়, বস্তুতান্ত্রিক পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তা স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-দুষ্ট।

অনেককাল আগে পঞ্চবটিতে একজন সাধু থাকত। জন্মাষ্টমী তিথি তো রাত্রে, আমি সকালে গেছি, আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি ঐ দূর থেকেই হাত নাড়ছে 'জলদি চলা আইয়ে, চলা আইয়ে'। খুব সিরিয়াস চোখ, মুখ। কাছে এলে বলছে, 'জলদি চলা যাইয়ে, আর সমুচা খবর কাগজমে খবর নিকাল দিজিয়ে কি কিষণজীকা জনম্ হুয়া'। সত্যি সত্যিই সে ভাবছে রাত্রে কিষণজীর জন্ম হয়েছে, খবরের কাগজে খবরটা দেওয়া উচিত। বারবার বলছে, 'যাও, খবর দে দেও কিষণজীকা জনম হুয়া'। সত্যি সত্যিই জিনিসটা আস্বাদন করছে। তাড়াতাড়ি চলে গেলাম, দেরী দেখলে যদি রেগে যায়, খবরের কাগজে খবর দিতে যদি দেরী হয়।

পরদিন যাচ্ছি, সাবধানে যাচ্ছি, আবার হয়ত ধরবে-'খবর দিয়ে হুয়া'? দেখি, না আপন মনে বসে আছেন। কালকের ঘটনাটা কালকের মত চলে গেছে, আজ নিজের মত বসে আছেন। তা, আমি ভাবলাম, কি ভাবের জগতে সাধুটা বাস করছে। তাঁর কাছে এটা কত বড় খবর। কিষণজীকা জনম্। একটা ন্যাকড়া পরা, মাটিতে বসে আছেন, রৌদ্র, বৃষ্টি কিছু ব্যাপার নয়। সে জানে যে, প্রতি জন্মাষ্টমিতে কৃষ্ণের জন্ম হচ্ছে, সেটাই তাঁর কাছে বড় সত্য হয়ে গেছে।

আসলে যে সত্য বলে বুঝতে পেরেছে, তার কাছে সত্য, সে সত্য বলে জানতে পেরেছে। অমিত সম্ভাবনার স্ফূরণ আর চেতনার আরোহিনী ক'জনের ভাগ্যেই বা ঘটে?

জন্মাষ্টমী

জন্মাষ্টমীর সবচেয়ে বড় মহিমা—সমস্ত বিরূপতা, বিরোধিতা ভেদ করে তাঁর আবির্ভাব। দেবকী, বসুদেব রাজবংশজাত। কংসের বোন দেবকী, আর সম্ভ্রান্ত রাজন্যবংশের একজন ছিলেন বসুদেব। দৈবচক্রে তারা কারাগারে বন্দী হ'ল। এই কারাগার কিরকম ভয়ঙ্কর ছিল তার বর্ণনা আছে অনেক। ভারী কঠিন জীবন। বসুদেব, দেবকী সেখানেই নারায়ণের ধ্যান-ধারণা করত। সেই অন্ধকারে বসে তারা আলোর উপাসনা করেছে। কাজেই যিনি আসবেন জগত-জীবের বন্ধন-মোচনকারী, তাঁর আবির্ভাবের পূর্ব মুহূর্ত থেকেই তাঁর বাবা, মা কারাগারে অতি কষ্টে দিন কাটিয়েছেন। দুঃখটা কত গভীর। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, প্রাণ যায়, সেটা একটা, কিন্তু এখানে তাদের বন্দী করেছে তাদেরই আত্মীয় একজন। এ কতখানি হৃদয়বিদারী ঘটনা। আর ওনাদের যাঁরা ভালোবাসতেন, ওনাদের যারা মঙ্গলাকাঙ্খী, তাদেরও কারাগারে বন্দী করা হয়েছে। শুধু আমি মরছি আমার যন্ত্রণা নিয়ে। তা নয়, আমাদের যারা ভালোবাসে, তাদেরও বন্দী করা হয়েছে। খাবার বলতে দিনান্তে একমুঠো ছাতু। কেন তাদের বন্দী করা হয়েছে? কংসের অহমিকায়। তারাও তো রাজন্যবর্গের আত্মীয়-স্বজন। কারাগারে শৃংখলবদ্ধ।

সকালবেলা খোলা জায়গায় দাঁড় করানো হয়, কংস সেখানে দিয়ে হেঁটে যায়। বন্দীদের বলা হয়, রাজার স্তব করতে—এই কংসই তোমাদের প্রভু, সেই নারায়ণ ভগবান। কেউ করার ভঙ্গি করে, কেউ জোরে করে। করেনা শুধু উগ্রসেন, কংসের বৃদ্ধ পিতা। সে তো করেই না, আবার বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এত উদ্ধত, কংসের ভাষায়। দেবকী, বসুদেবকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। কেন একটা নিরপরাধ দম্পতিকে বিয়ের পরমুহূর্ত থেকেই বন্দী করেছ? সে বসুদেব-দেবকীকে বন্দী করার বিরুদ্ধে ছিল। সে তো কংসের পিতা, রাজা। তাকেও বন্দী করল। সেই কারাগারে হাত দুটো বাঁধা, সেই অবস্থায়ও বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এক একদিন রাগের চোটে কংস দু-এক ঘা দিয়েও দেয়। তবুও সেই অশীতিপর বৃদ্ধ হাসে। একদিন রাগের চোটে কংস তরোয়াল বের করেছে—আজ মেরেই ফেলব, এর জন্যই বন্দীরা এত উদ্ধত হতে সাহস পায়! মন্ত্রী বলে—না, এরকম করবেন না, হাজার হোক উনি আপনার পিতা। মন্ত্রী, উগ্রসেনকে আড়ালে বলে—কেন এত দীপ্ত হও, তোমাকে চাবুক মারে, পিঠ ফেটে রক্ত বার হয়, কত যন্ত্রণা পাও। কেন এরকম কর, উগ্রসেন বলে আমাকে যত চাবকায়, যত মারে, যত রক্ত ঝরে, আমার তত আনন্দ হয়, কেন জান—যত সে অত্যাচার করবে, তত সেই দর্পহারী নারায়ণের আগমন ত্বরান্বিত হবে, তিনি থাকতে পারবেন না, যিনি হেঁটে আসছেন তিনি ছুটে আসবেন, এই ব্যথার পৃথিবীতে তিনি নেমে আসবেন। তাঁর আগমন আরও মঙ্গলময় হবে।

দেখা যাচ্ছে জন্মের আগে থেকেই, শুধু বাবা, মা নয়, তাঁকে যারা ভালোবাসত, যেসব রাজন্যবর্গ, তাদের উপরেও অসীম অত্যাচার করেছে। অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণ। যে গর্ভে কৃষ্ণ জন্মেছে, সেই গর্ভজাত সাতজনকে মেরে ফেলেছে। কি ভাবে? আছড়ে মেরে ফেলেছে। তাহলে আসার আগে থেকেই কি যন্ত্রণা, কি কষ্টের ভূমিকা। বসুদেব, দেবকী নারায়ণের স্তব করে যান আর চোখের জল ফেলেন। কারাগার ভেসে যাচ্ছে তাঁদের চোখের জলে। জন্ম হ'ল যে মুহূর্তে, গোটা বিশ্বপ্রকৃতি মহাকৃপণ হয়ে গেল। দিন নয়, দিনের সৌন্দর্য নেই, আলো নেই, ফুল নেই, পাখীর গান নেই, ঘোর রাত্রি। রাত্রেও আকাশে চাঁদ থাকে, আলো থাকে, তারা থাকে আকাশ ছেয়ে, সে সব কিছু নেই। বলা হচ্ছে ঘোর শ্রাবণ মেঘের রাত্রি, নিকষ রাত্রি, সমস্ত পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে ছেয়ে গেছে, আর ঘন ঘন বিদ্যুৎ যেন আরও বিদ্রূপ করছে, আরও রহস্য করছে। সেই ক্ষণপ্রভা ঘোর অন্ধকারকেই প্রকট করছে। তাহলে, শুধু আত্মীয় নয়, গোটা বিশ্বপ্রকৃতির মহা-কৃপণতার, মহা-বিরুদ্ধতার মধ্যে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছেন।

কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করলেন। বসুদেব, দেবকী দেখছেন অন্ধকার কারাগার আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। কে এই শিশু? চতুর্ভুজ শিশু—নারায়ণ। ওনারা দরবিগলিত নেত্রে স্তব করছেন—প্রভু, তুমি এই কারাগাররে কেন এলে? সারাজীবন আমরা তোমার উপাসনা করেছি, ফুল-ফল-ধূপ-দীপ দিয়ে শ্রেষ্ঠ উপাচারে তোমার পূজো করেছি, আর তুমি এই পুতিগন্ধময় কারাগারে আগমন করলে? আবার তাদের মন উজানে বইছে। বলছে—প্রভু, নিজের আত্মীয়রাই আমাদের এই দীর্ঘ কারাগারে ফেলেছে, এই দীর্ঘ কারাগারের যন্ত্রণা, আর তুমি আসার আগে আমাদের সাতটা সন্তানকেই বিনষ্ট করেছে, সেই যন্ত্রণাও আজকে ধন্য হয়ে গেছে, সার্থক হয়ে গেছে, কেননা এই যন্ত্রণার পথ বেয়েই তো তোমাকে

পেয়েছি। আমাদের এই যন্ত্রণা সফল। যদি সারাজীবনও যন্ত্রণা পেতাম, তবুও আনন্দের হোত, কেননা সমস্ত যন্ত্রণার পারে তোমার আবির্ভাব। এই যে স্তব করছেন, তার পরও ঘটনার বিস্তার হয়েছে। ক্ষণ পরেই আবার চিন্তা করছেন—কংস মেরে ফেলবে এই নারায়ণ রূপ দেখে। তখনই আবার ছোট্ট শিশু হয়ে গেলেন।

সেই শিশুকে নিয়ে গেলেন ঘোর রাত্রিতে যমুনা পেরিয়ে। জগতের যিনি রাজা, তাঁর পিতৃপরিচয়, মাতৃপরিচয় সেখানে নেই, তাঁকে নিয়ে পালিয়ে যেতে হচ্ছে চোরের মত অন্ধকার রাত্রিতে। সমস্ত পরিচয় মুছে, সমস্ত বংশ গৌরব মুছে তাঁকে পালিয়ে যেতে হচ্ছে দুর্যোগময় রাতের অন্ধকারে। কতখানি দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, অপমানের পথ বেয়ে তাঁর আবির্ভাব। সে অন্যের ঘরে প্রতিপালিত হবে। বসুদেব-দেবকী সম্ভ্রান্ত বংশের, আর যেখানে রাখা হ'ল, তারা তো যাদব বংশ পরিচয়ে। সামন্ত প্রজা মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বলগ্নে আবির্ভাবের লগ্নে এবং তার পরবর্তী লগ্নে, তিনটে পর্যায় বিশ্লেষণ। এই পরপর তিনটে অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ করলে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের একটাই বিশেষত্ব আমাদের চোখের সামনে আসে যে, কি ভয়ানক বিরূপতার মধ্যে তাঁর আবির্ভাব সফল হয়েছে। জীবনের, জগতের সমস্ত বিরূপতা, বিরোধিতা, কৃপণতা চুরমার করে মঙ্গলময় শ্রীভগবানের আবির্ভাব। সমস্ত অশুভ শক্তিকে ভেঙে ফেলে শুভ শক্তির আবির্ভাব। সমস্ত কালিমা, ক্লেদ, মালিন্যকে ঠেলে ফেলে শুভ, শুচি, সুন্দরের আবির্ভাব। এটাই বাঞ্ছিত অভিপ্রেত এবং এটাই চিরকাল হয়ে আসছে। যখনই পৃথিবীতে যুগান্তকারী মহৎ মানুষের আবির্ভাব হয়, তখনই দেখা যায় সমস্ত বিরোধিতাই তাঁর আগমনী রচনা করে। এটাই আমাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কথা।

শুভ তিথি

প্রভাব যদি না থাকে তাহলে আবার কিসের শুভ তিথি? আগুন আছে তার তাপ নেই, সেটা কি হয়? তিথি আছে তার প্রভাব নেই, তাও কি সম্ভব। গঙ্গায় বান আসার আগে মাটি যেন কাঁপতে থাকে, তারপর যখন এসে যায়, তখন হুড়হুড় করে জোয়ারটা চলতে থাকে। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের সন্নিবেশে শুভ তিথি যেমন সত্য, তেমনি একই সঙ্গে সত্য সাধকের সাধনায়, অনুভবে তাঁর আবির্ভাব। সেটা অনুভব না হলে তো বিজ্ঞানের গ্রহ-নক্ষত্রের সন্নিবেশ, সেটা তো শুভ তিথি হ'ল না। শুভ তিথি বলছি এইজন্য যে, সেটা নির্দিষ্ট মহত্তর অনুভব দিয়ে যাচ্ছে। সে ক'জন? বিরল ব্যাপার।

সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধাবশত সেই কথার অনুগমন করে। পরের কথা হ'ল, এই তিথির পথ বেয়েই তিথি একদিন চিরন্তন হয়।

শ্রীকৃষ্ণ

লীলা কৃষ্ণ আর যোগীকৃষ্ণ রূপ এক, ভাব আলাদা। লীলা বিস্তার করছে বাঁশি, আর যোগীদের কাছে বাঁশি ষটচক্র। আর শেষের ফুটো, সপ্তম দ্বার, সহস্রার। ছটি ফুটো বন্ধ করলে শুধু সপ্তমে। কৃষ্ণের দর্শন পেলে কি হ'ল? না, দেহের ৬টি চক্রে তার ফুৎকার বেজে উঠল, সপ্তমে তা অনন্তে বিস্তার করল। যোগীরা এইভাবে ধ্যান-ধারণা

করেছে। যোগী কৃষ্ণ। কৃষ্ণের ঐ ত্রিভঙ্গ রূপ- প্রেমে তিনি তরল হয়ে যাচ্ছেন। ললিত ত্রিভঙ্গ—লীলাবাদীদের ভাষায়। আর যোগীদের ভাষায়—ওঁকারের রূপ। কৃষ্ণ কথার মানেতেই লীলাবাদীরা বলছে—শ্যাম সুন্দর, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। তাদের মতে অর্থবাদ অপরাধ। আর যোগীদের কৃষ্ণ হচ্ছে কর্ষয়তি ইতি কৃষ্ণ। তিনি পরমাত্ম স্বরূপ, তিনি যোগীদের মনকে পরমাত্ম বস্তুতে আকর্ষণ করছেন, তাই তিনি কৃষ্ণ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কৃষ্ণের লীলার ভাবনা এক, আর যোগীদের কৃষ্ণের ভাবনা এক। মাথায় যে ময়ূরপুচ্ছ, লীলাবাদীরা বলছে—জগৎ প্রপঞ্চের যে কাম শক্তি, তাকে লীলায় প্রেম শক্তিতে রূপায়িত করেছেন, তারই চিহ্ন । বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদন। আর যোগীদের কাছে কৃষ্ণের মাথার ময়ূর-পেখম হচ্ছে ওঙ্কারের অর্ধমাত্রা। অর্ধমাত্রা চিদানন্দ।

নীলাচল ধাম

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য ভাবে ছিলেন। তখন রুক্মিণী, সত্যভামা, এরা রোহিণী মার কাছে তাঁর বৃন্দাবন লীলা, সেখানে যে মাধুর্য ভাবে বিরাজ করছিলেন,. সেই লীলা জানতে চেয়েছিলেন।

সুভদ্রাকে দ্বারী রেখে রোহিণীমা যখন বৃন্দাবনের সেই মাধুর্যলীলা তাঁদের কাছে বর্ণনা করছিলেন, সেইসময় আচমকা শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম সেখানে এসে গেলেন। সেই বৃন্দাবন লীলা শ্রবণ করে ওঁনাদের অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের গভীর বিকার হয়েছিল। হস্ত-পদাদি সংকুচিত হয়েছিল, দাঁতে দাঁত লেগে গিয়েছিল এবং চক্ষু বিস্ফারিত। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা—এঁদের তিনজনেরই এক অবস্থা।

বলা হয়, সেই রূপ প্রকাশ হয় সেই বিকার, এটাই ওঁনার বিগ্রহের ভাব। তিনি ঐশ্বর্য-লীলায় বিরাজ করছেন, কিন্তু মাধুর্য-লীলা শ্রবণে গভীর ভাবে আবিষ্ট। ঐশ্বর্য ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান, কিন্তু মাধুর্য আস্বাদন, ভাবের মধ্যে ভাব।

যদিও গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা বলেন, চৈতন্য-লীলার মধ্যে মাধুর্যের প্রকাশ। বাস্তবিক পক্ষে তিনি ঐশ্বর্য-লীলাও প্রকাশ করেছেন। এই নদীয়ায় কাজী দলন। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের গর্ব নাশ, ইত্যাদি কার্যে ঐশ্বর্য লীলার প্রকাশ করেছেন। নবদ্বীপে থাকতে থাকতে আচার্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং অন্যান্য আচার্যরা, বৃদ্ধ পণ্ডিতরা ওঁনাকে দেখে পালাত, তিনি তাদের দেখলেই তর্কে আহ্বান করতেন ও পরাভূত করতেন। যার চরম শ্রীবাস অঙ্গনে বিষ্ণুখট্টায় বসে 'মুঁই সেই, মুঁই সেই' বলেছেন।

এ হেন নবদ্বীপ ছেড়ে জগন্নাথ ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করলেন। বৃন্দাবনে গেলেন, আবার চলে এলেন। অধিষ্ঠান করলেন জগন্নাথ ধামে, কিন্তু স্মরণ করলেন বৃন্দাবন লীলা, 'হা প্রাণনাথ, দীন-দয়াল ব্রজনাথ হে'। এ তো ব্রজগোপীদের কথা। যদিও তিনি নীলাচলে অধিষ্ঠান করছেন, কিন্তু স্মরণ করছেন বৃন্দাবন লীলা। জগন্নাথদেবের ভাব, ঐশ্বর্য ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান, কিন্তু মাধুর্য ভাব আস্বাদন। লীলার মাঝে কোন ঐক্যতান আছে।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র সিদ্ধান্ত এবং পরবর্তীকালে সারদা মায়ের কথা, এর সমর্থন করছে ব্রহ্মযামলের কথা—এটা সতী পীঠ। বিমলা সেখানকার মা এবং জগন্নাথ শিব। উৎকল খণ্ড স্কন্দ পুরাণে আছে—'উৎকলে নাভি দেশশ্চ বিরাজ ক্ষেত্রমুচ্যতে'। বিমলা

সা মহাদেবী, জগন্নাথস্তুভৈরব'। এই মতের সমর্থক গবেষকরা বলছেন, বেদী আসলে একটি কক্ষ, যার নিভৃত স্থানে উড্ডীয়ান কুরুকুল্লা বা ত্রিপুরা-সুন্দরী যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। বর্তমানে তার দ্বার রুদ্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে মাত্র। সারদা মা বলছেন, 'দেখলাম জগন্নাথ শিব'। পরবর্তীকালের পণ্ডিতজনের প্রমাণ বলছে, এটা ছিল বৌদ্ধ তীর্থ। এবং তারপর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সময় থেকে রাজারা বৈষ্ণব হয়েছে। সেদিক থেকে অনেকে মনে করেন যে, বিগ্রহগুলো ঐরকম রচনা করার বিশেষ কারণ এই যে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে দাঁড় করাতে হয়েছে, তাই বিগ্রহগুলো ঐরকম হয়েছে। আগেকার দিনে এ ধরনের পুতুলের চল ছিল। বলত গালার পুতুল। লোকমাতা নিবেদিতার সংগ্রহে এরকম পুতুলের কথা জানতে পারি।

যদি অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকারের দিক না ধরি, আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত আছে, মূর্তির পূর্ণাবয়ব থাকতে হবে। অর্ধাবয়বের পূজা শাস্ত্রবিরোধী। আবার অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকারের দিক ধরলে তার সঙ্গে ঐশ্বর্য-প্রধান রথযাত্রা উৎসব মানায় কি? লীলার আদ্যপান্ত সুরটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই।

এই সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য সিদ্ধান্ত আছে। লক্ষ শালগ্রামের বেদীর উপর জগন্নাথদেব বিরাজ করছেন। কিন্তু শালগ্রাম নিজেই বিগ্রহ। ভাবনার মধ্যে একটা বিরোধ আছে। শালগ্রাম স্বয়ং ভগবান, সেটা চেপে তার উপর আবার ভগবান। তাই অনেকে মনে করেন, শালগ্রাম বলছে এই জন্য যে, বৌদ্ধরা সিদ্ধ, অর্হৎ বা বৌদ্ধাচার্যদের দেহভস্ম একটি গোল কালো শিলার মধ্যে গর্ত করে ভরে রাখতেন, যাকে ধাতুগর্ভ বলা হয়— সেইরকম লক্ষ ধাতুগর্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন জগন্নাথদেব। হয়ত তার উপর বুদ্ধদেবের কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

আমি একটা মত বলছি। মনে করবেন না এটা আমার মত। অসংখ্য স্থানে বৌদ্ধরা এই রকম ধাতুগর্ভের উপর বৌদ্ধস্তুপ করেছে, প্যাগোডা করেছে।

আপনারা একটা জিনিস দেখলে অবাক হয়ে যাবেন, এখনও দেখা যায়, মাসীর বাড়ীতে মাসীর মূর্তি বলে যা দেখান হয়, সেটা কিন্তু বুদ্ধ মূর্তি।

আমি রাত্রিতে কোন এক দিন বেশ পরিবর্তনের সময় দেখে নিয়েছি। এমন কি বদ্রীনারায়ণে নারায়ণ বিগ্রহ বলে যেটা দেখানো হয়, সেটাও অনেকে মনে করেন বুদ্ধ মূর্তি। বৌদ্ধ বিগ্রহ আচমকা হিন্দু বিগ্রহে রূপান্তরিত করা হয়। মানা গ্রামে দেখেছি—হিন্দু-বৌদ্ধ মেশামেশি। সেখানে বৌদ্ধ-তন্ত্রের পূজা। এই কাছেই বৈদ্যনাথ মন্দিরে ভৈরবজীর বিগ্রহ বলে সকালে সকলে ঘটি ঘটি জল ঢালে। সেটা চার ফুট উঁচু ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ মূর্তি।

তবে এটা ঠিক, শ্রীচৈতন্যদেব ঐ তীর্থ এবং বিগ্রহ নতুন করে এবং প্রবল ভাবে সঞ্জীবিত করেছেন এবং এখন পর্যন্ত সেই ভাবটাই চলছে।

১) রাধারানী

★ অনেক সম্প্রদায় রাধাকে মানে না, একক কৃষ্ণের পূজা করে। আবাব অনেক সম্প্রদায় একক কৃষ্ণ মূর্তি পূজো করা পাপ বলে মনে করে। এটা কেন?

★★ এর মধ্যে দুটো ভাবনা আছে। একটা মূলত ঐকান্তিক ভক্তি মার্গের ভাবনা— শ্রীভগবান, কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, তিনি তাঁর আত্ম-প্রতিবিম্ব নিয়ে লীলা করেছিলেন।

শিশু যেমন দর্পণে নিজের মুখ দেখে আনন্দ করে, তেমনি সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, সর্বকারণ কারণম্—এই যে শাস্ত্রে বলেছে—তিনি যেন আত্মস্বরূপ শ্রীরাধারানীর সঙ্গে লীলা করছেন। "রাধা-কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।

লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।।"

আর অষ্টসখী তারই বিকাশ বা বিস্তার। নিত্যলোকে যেমন নিত্য-লীলা-বিহার হচ্ছে। আমাদের বৃন্দাবনে সেই অপ্রাকৃত লীলার বিকাশ হয়েছে। ভৌম বৃন্দাবন, তার উপরে আছে দিব্য বৃন্দাবন, সেখানে দিব্যলীলা প্রকাশ হচ্ছে।

"চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম।।"

মানুষ যুগে যুগে সাধনা করে, ভগবৎ কৃপার অনুগামিনী হয়ে যদি সেই কৃপা লাভ করতে পারে, তবে এই যে বিচিত্র লীলার বিস্তার হচ্ছে, সেই লীলার দর্শন এবং আস্বাদন সামর্থ সে লাভ করে। আস্বাদন সামর্থ কেন? সেই স্বরূপতায় পৌছয় না কেন? এই মতে— "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য-দাস"। সুতরাং জীব তার স্বরূপ আস্বাদন করার মধ্যে দিয়ে—শ্রীকৃষ্ণের নয়, রাধারানীর সখী, তস্য তস্য কোন একটা স্থান লাভ করে নিত্যলীলা আস্বাদনের অধিকার লাভ করে। এই তার মুক্তির স্বরূপ। এই মতে রাধা ছাড়া কৃষ্ণ তো নেইই, এমন আছে—"রাধা কৃষ্ণস্য প্রণয় মহিমা"। কৃষ্ণ যে বিহার করছেন আত্মানন্দে আনন্দ আস্বাদন দ্বারে সেই প্রণয় মহিমা রাধা। তাই আগে রাধা বলে। বলে রাধাকৃষ্ণ। এই হচ্ছে একটা মত। একান্তই ভক্তি মার্গের এই ভাবনা।

আর একটা ভাবনা আছে। সাধক জন্ম-জন্মান্তর ধরে সাধনা ক'রে তার আস্বাদনের স্তরে স্তরে অগ্রাধিকার লাভ করে এবং যেখানে আস্বাদনের পূর্ণতা, সেখানে সে রাধা স্বরূপ। এখানে রাধা হচ্ছে আরাধিত অর্থে। রাধা, যিনি কৃষ্ণকে পরিপূর্ণ আস্বাদন করেছেন, তিনি পরিপূর্ণ আস্বাদন সামর্থ। যার জন্য ভাগবতাদি শাস্ত্রে তাঁকে রাসেশ্বরী বলা হয়েছে। ভাগবতে দুটোই সমর্থন করেছে। রাধারানীকে বলা হয় রাসমনি। রাস মণ্ডলে সখীদের মধ্যে তিনি অন্যতমা। যার মধ্যে রস আস্বাদনের পূর্ণতা এসেছিল, সেই মনি। বলে মুকুটমনি মুকুটের শ্রেষ্ঠ মনি অর্থে। আস্বাদন সামর্থ হচ্ছে স্ত্রীবাচক। এই সখীর সখী থেকে সখী, চরমে বিকাশ হয়েছে রাধা—পরিপূর্ণ আস্বাদন সামর্থ। এই পরিপূর্ণ আস্বাদন সামর্থেই পরম তত্ত্বের বিকাশ। আর, পরম তত্ত্বের আস্বাদনের এমন একটা স্তর আছে, অচিন্ত্য স্তর, যেখানে আস্বাদন-আস্বাদ্য বস্তু একীভূত। সেখানে অদ্বয় রসতত্ত্ব। শ্রী হচ্ছে রসতত্ত্ব, তাই শ্রীকৃষ্ণ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে আনন্দ ব্রহ্মের কথা, আছে 'রসো বৈ সঃ। রসং হেব্যায়ং লবধ্বানন্দী ভবতি'। তিনি রস স্বরূপ, জীব সেই রস আস্বাদন করে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই রসব্রহ্মের অনুভূতি পর্যায়িত, বিতরিত, আস্বাদিত। সেইজন্য অষ্টসখী পরিবৃতা রাধারানীর মূর্তি দেখা যায়—সখীদের কারো হাতে ফুল আছে, কারো হাতে গন্ধদ্রব্য, কিন্তু মালা এক রাধারানীর হাতেই। কেননা মুণ্ডক ও কঠোপনিষদে আছে— 'যমেবৈষ বৃণুতে'-সেই অব্যক্ত পরম তত্ত্ব যাকে বরণ করে নেয়, সেই তাকে প্রাপ্ত হয়। এটার অন্য দিকেরও ব্যাখ্যা হয়, আত্মশক্তির উদ্বোধনের পরিপূর্ণতা তথা একাত্মতা। এটা অদ্বৈততত্ত্বনিষ্ঠ পরম তত্ত্বের দিক দিয়ে আত্ম-উদ্বোধনের চরিতার্থতা। দুটো দিক ধরলেও কোনটাতে বিরোধ থাকছে না। 'যমেবৈষ বৃণুতে'। যার পরিপূর্ণ সামর্থ তাকেই তো বরণের

প্রশ্ন আসছে। একীভূত আস্বাদনের পরিপূর্ণতা। এটা রাধা-কৃষ্ণের অদ্বৈত রসনিষ্ঠ বিশ্লেষণ। এইভাবেও অনেক মহাপুরুষ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণকে তথা পরম তত্ত্বের রস স্বরূপ আস্বাদন করে বিভোর হয়েছেন।

সচ্চিদানন্দ নিত্য বস্তু, তার একটা দিক হচ্ছে রসস্বরূপ আর একটা দিক হচ্চে চিদ্-স্বরূপ। বলা বাহুল্য রস -স্বরূপতার মধ্যে চিদ্-স্বরূপতা আছে, চিদ্‌স্বরূপতার মধ্যে রস-স্বরূপতা আছে। আকারের বৈশিষ্ট্য বা আস্বাদনের বৈচিত্র অনুযায়ী কেউ রস স্বরূপতা কেউ চিদ্-স্বরূপতায় পূর্ণ হয়ে আছেন। কিন্তু পরিপূর্ণ সামর্থ যেখানে সেখানে একটা অবিনা ভাব আছে। আস্বাদনের পূর্ণতায় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। এই মতে -আত্মশক্তির পরিপূর্ণ উদ্বোধনে সে কৃষ্ণ তত্ত্বে বিলীন হয়, একীভূত হয়। পদ্মপুরাণে বলছে—'রমন্তে যোগিনোহন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি ইতি রামপদেনাসৌ পরমব্রহ্ম অভিধিয়তে'। প্রাণ শক্তির পরিপূর্ণ উদ্বোধন -সংহত ও একীভূত করণের মধ্যে দিয়ে যোগী সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ পরমতত্ত্বকে আস্বাদন করে। 'রম্যতে ইতি.. রাসঃ'। রমণ করা অর্থ হচ্ছে আস্বাদন করা। সেই রসের মধ্যে রসত্তম পরমতত্ত্বকে আস্বাদন করা। সুতরাং লীলাতত্ত্ব এখানে অদ্বৈত-রস-তত্ত্ব-নিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে। তবে মনে রাখতে হবে—মতবাদ যাই হোক, বিরল অধিকার বা সামর্থের প্রশ্ন সবসময়ই সাধনার ক্ষেত্রে শেষ কথা। কথামৃতে ঠাকুর যেমন জ্ঞান-সূর্য ও ভক্তিচন্দ্রের কথা এবং বিরল অধিকারীর কথা মাস্টারমশাইকে বলেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা শুধুমাত্র যে একান্তই লীলাতত্ত্বনিষ্ঠ ছিলেন আর অপরপক্ষে যারা যোগী কৃষ্ণ ভজনা করেন তারা একান্তই যোগী হয়ে গেছেন, অথবা অদ্বৈত রসতত্ত্বস্বরূপ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণকে আস্বাদন করেন, এরকম ভাবলে ভুল হবে। কেননা শোনা যায় সনাতন গোস্বামী শুধু কৃষ্ণকে ভজতেন, সেখানে রাধা ছিল না। অথচ গৌড়ীয় মণ্ডলীতে রাধা ছাড়া কৃষ্ণ পুজো পাপ। অথচ রস আস্বাদনের সামর্থে সনাতন গোস্বামী তো চৈতন্যদেবের অতি প্রিয়পাত্র।

আর একটা দিক হল—এই অদ্বৈততত্ত্বনিষ্ঠ যে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, আর লীলা-পরমতত্ত্বের যে কৃষ্ণচন্দ্র-রাধাকৃষ্ণ—এই দুটোর মধ্যে এটা ভাবলে হবে না যে, যারা লীলায় আছেন তারা লীলা নিয়েই আছেন, আর যারা অদ্বৈতরসতত্ত্ব নিয়ে আছেন তারা তাতেই নিমজ্জিত। অদ্বৈতরসতত্ত্বনিষ্ঠ মহা অধিকারী যে সমস্ত মহাপুরুষ, দেখা গেছে কখনো লীলা আস্বাদনে তাঁরা বিভোর হয়ে যান। তবে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের দিক থেকে অনেক সময় তা প্রকাশ করেন না। কেননা এই যে অদ্বৈতরসতত্ত্ব, এর যে স্বরূপতা, তা এই জগতের মহাত্মাদের মধ্যেও বিরল অধিকার। একটা উদাহরণ দিতে হবে, উদাহরণ ছাড়া তো দাঁড়ায় না। রামদাস কাঠিয়াবাবা—একদিনও সেবার ত্রুটি হলে চেলাকাঠ দিয়ে পেটান। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল লীলাপর রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্বের কথা প্রসঙ্গে পরতত্ত্বের কথা। তিনি বলছেন—'কৃষ্ণ তো ষোড়শ কল থা, মগর ঔর এক হ্যায় সহস্রকল। উ কভি আতা নেহি যাতা নেহি'। লীলাবাদী, লীলানিষ্ঠ এক বিরল মহাপুরুষের মুখে সর্বাত্মক নির্বিশেষের কথা শুনে স্তম্ভিত হতে হয়। সেই নিত্যকৃষ্ণ, রসকৃষ্ণ, অদ্বৈত কৃষ্ণের কথারই আভাস দিয়ে গেলেন। আবার সেই কাঠিয়াবাবা, শ্রীবৃন্দাবনে রাধা গোবিন্দের যখন মিছিল হচ্ছে, তখন সন্তদাসজী বলছেন—দেখলাম তাঁর সমস্ত রোমকূপ খাড়া হয়ে গেছে আর সেইসমস্ত রোমকূপ থেকে অনর্গল কিছু বার হচ্ছে। লেখক, সমর্থ সন্তদাসজী ওঁনাকে

হাওয়া করছেন। কাঠিয়াবাবা বলছেন—'সামনে দেখছি রাধা-কৃষ্ণ অষ্ট সখী পরিবৃতা হয়ে লীলা করছেন, তারই জন্য প্রেমরস নির্গত হচ্ছে। তুমি হাওয়া করলে কি হবে? শোন, আর একবার হয়েছিল, তখন ৬ মাস এমন প্রেমজ্বরের অবস্থা ছিল। তখন একা ছিলাম। এখন তুমি দেখে নাও'।

সুতরাং, এই যে সহস্রদল কৃষ্ণ, তিনিই ষোড়শকল হয়ে লীলা করছেন, আর কাঠিয়াবাবা সেই লীলা আস্বাদন করে বিভোর-মশগুল হয়ে যাচ্ছেন। আস্বাদনের এই ব্যাপ্তি সামর্থের বিরল অধিকার সাপেক্ষ।

চৈতন্য চরিতামৃতে একটা কথা বলা হয়েছে। কৃষ্ণদাসজী জান্তে-অজান্তে এটা বলে গিয়েছেন—'তটস্থ হইয়া করে লীলা আস্বাদন'। এটা খুব ভালো লাগে আমার। এটা কেন বললেন তিনি? এটা আমাকে ভাবিয়েছে। আমার মনে হয় এখানে সেই আকর বা অধিকারের প্রশ্ন আছে। তবে এতই বিরল যে, এটা আলোচনা হয়নি বা হওয়া উচিত নয় বলেই হয়নি।

এবারে আমি আমাদের রামকৃষ্ণকে ধরব। তিনি তো রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম, এসব নিত্যলীলাবিহার দর্শন করতেন, খুবই আনন্দ করতেন। আবার কখনো নির্বিকল্পে স্থির। স্বামীজী লীলা মানতেন না। ঠাকুর গৌড়ীয়দের মত রাধা ছাড়া কৃষ্ণ। ছিঃ! এরকম বলেননি। তিনি বলেছেন—আহা, রাধা না মানিস, রাধার টানটুকু নে। তখনকার মত এদিকের কথা বলেছেন। স্মৃতির আলোয় স্বামীজী বইতে শরত মহারাজ লিখেছেন—'সিমলার বাড়িতে একদিন গিয়ে দেখি স্বামীজী আনন্দে ডগমগ হয়ে বসে আছেন। কি হয়েছে তোমার? না, আমি গতকাল রাধারানীর দর্শন পেয়েছি'। যিনি নিত্যের ভূমি থেকে নেমে এসেছেন, যিনি সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণকে জেনেছেন, তিনি আবার লীলায় মগ্ন হয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণতা নরেন্দ্রনাথেও প্রসারিত হ'ল।

২) রাধারানী

একবার দক্ষিণেশ্বরে রাধা-গোবিন্দ মন্দিরে আমি রাধা-রাধা কিছু একটা চিন্তা করছি রাধার কথা ভেবে। খেয়াল করলাম—পাশে একজন দাঁড়িয়ে আছে ধুতি পরা। তাকিয়ে আছে। তিনি বললেন—'শুধু রাধা বলিস নে, বল রাধারানী। তিনি ভক্তি সাম্রাজ্যের রানী, আমরা তাঁর প্রজার প্রজা, সেইজন্য রাধারানী'। রানী কথাটার মানে কোথায় নিয়ে গেলেন। ঐ কথাটা শুনে মন্দিরের পেছন দিকে একটা জায়গা আছে, সেখানে গিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

শক্তি মতে রাস

★ নবদ্বীপে রাস উৎসব হচ্ছে শক্তি মতে, দুর্গাপুজোর মত। বলছে পাঁচশো বছরের পুরনো। শান্তিপুরে রাসে কালী পুজো হয়। রাসকালী বলে।

★★ নবদ্বীপের চিরন্তন ঐতিহ্য হচ্ছে শক্তিবাদ। এখন যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বেশী দেখা যায়, তার বহু আগে, বহু প্রাচীন হচ্ছে পোড়ামা-তলা। পোড়ামা-তলার স্থান ধর্মের খুঁটি। এই পোড়ামা-তলার বট গাছের নীচে এখনো মায়ের পুজো হয়। অনেক বছর আগে এক সিদ্ধা ভৈরবী মা সেখানে বাস করতেন। তারও কত আগের যে ঐ স্থান

তা কেউ জানে না। পরবর্তী কালে বামদেবের নির্দেশে তারাখ্যাপা ভৈরবী মায়ের কাছে তন্ত্র শিক্ষা করেছিলেন।

পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ভাবধারা এবং শক্তিবাদ, দুটো ভাবধারাই এখানে প্রবহমান হয়েছিল। চৈতন্যদেব ওখানকার বৈষ্ণব ভাবধারা প্রবল করেন। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বৈষ্ণবদের এককাট্টা করেন। চৈতন্যদেবের অসামান্য প্রভাবে নবদ্বীপে ও অদ্বৈত প্রভুর প্রভাবে শান্তিপুর অঞ্চলে এই ভাবধারা প্রবল ভাবে প্রবহমান হয়। প্রবল শক্তিমান চৈতন্যের প্রভাবে যে ভক্তি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তা কিন্তু শক্তির ধারাকে চেপে দিতে পারে নি। কারণ, সেইসময় কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাতন্ত্রাচার্য সেখানে ছিলেন।

এটা মনে রাখতে হবে, রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের সময় মায়ের বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-পুজোর যে প্রচলন হয়েছিল, তারও অনেক আগে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সূচনা করেছিলেন মায়ের বিগ্রহ পুজোর। তার আগে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই যন্ত্র, মন্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মা-এর এই রূপের পুজো প্রচলন এবং ঘরে ঘরে জনপ্রিয় করে তোলেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। ওঁনার জীবনী ভারতের সাধক-এ আছে। অন্য দিকে প্রাচীনতম তন্ত্রাচার্য খ্যাপা ঠাকুরের সান্নিধ্য-আশীর্বাদ পেয়েছিলেন এবং তিনি যে শক্তি সাধনাকে প্রাণবন্ত করেছিলেন, এর পেছনে খ্যাপা ঠাকুরের বিশেষ অবদান আছে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে, চৈতন্যদেবের মত শক্তিমান মানুষ, অদ্বৈত প্রভুর মত শক্তিমান পুরুষ সেখানে যে বৈষ্ণব ভাবের প্রবল বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের মত শক্তিমান মহাপুরুষ থাকার ফলে তন্ত্র ধারার প্রাচীন ঐতিহ্য পাশাপাশি ধরে রাখতে পেরেছিলেন।

এখন অন্য একটা কথা আছে। বৈষ্ণব লীলা বাদ একটা আর শাক্ত লীলাবাদ একটা। দুটো বাদ আলাদা। বৈষ্ণবদের সাধ্য-সাধন পদ্ধতি উদ্দেশ্য, সব আলাদা। কোন কোন জায়গায় দেখা যায় এই ধারা কিছুটা ওতে প্রভাবিত করছে, ওই ধারা কিছুটা এতে প্রভাবিত করছে। শাস্ত্রেও এর কিছু কিছু সমর্থন আছে। চৈতন্য চরিতামৃতে বলছে-

'রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরমাণ।।'
'রাধা-কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।।'
'অগ্নি আর জ্বলনে যৈছে নাহি কভু ভেদ।
রাধা আর কৃষ্ণ তৈছে নাহি কভূ ভেদ।।'

এখানে শক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বৈষ্ণব শাস্ত্রে। এই লাইনগুলো টেনে নিয়ে পরবর্তীকালে অন্য একটা তন্ত্র সৃষ্টি হ'ল। স্বয়ং ভগবান রামকৃষ্ণ এবং বামদেব এই তন্ত্রকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, 'রাধা তন্ত্র'। অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি, চাঁদ আর চাঁদের আলো, সূর্য আর সূর্যের আলো। কৃষ্ণ পরম তত্ত্ব, নিগূঢ় তত্ত্ব, তাই কালো। আর তাঁর ইচ্ছা শক্তি, ক্রিয়া শক্তি, জ্ঞান এবং আস্বাদন শক্তির প্রকাশ হয়েছে রাধারানী। এই হচ্ছে রাধাতন্ত্র। আর একটা শ্লোক সমর্থন করছে। —

'রাধিকার নৃত্য গুরু, আমি মাত্র নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট।।'

শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে। এই ভাবে রাধাতন্ত্র সৃষ্টি হয়েছে। এখানে রাধা, কৃষ্ণ-আরাধিতা ইতি রাধা। প্রমাণ দিচ্ছে ভাগবতে রাধা বলে কিছু নেই, প্রিয় সখী আছে, রাসমণি আছে। কিন্তু রাধা বলে নেই। কাজেই রাধা একটি চরিত্র নয়। রাধা একটি তত্ত্ব, একটি পদ, একটি আস্বাদন। শ্রেষ্ঠ অর্থে, যিনি পরমতত্ত্ব পরিপূর্ণ আস্বাদন সামর্থ, তিনিই হচ্ছেন রাসমনি।

আস্বাদন অর্থ, যিনি পরমতত্ত্ব পরিপূর্ণ আস্বাদন করার সামর্থ্য রাখেন, তিনি জাগতিক ভাবে পুরুষ হতে পারেন, নারীও হতে পারেন, তিনিই রাধা। আর যারা সাধনার প্রথম অবস্থায় সখী, তস্য সখী। পরিপূর্ণ আস্বাদন সামর্থ তখনই, যখন তার মধ্যে একাকার হয়ে গেছে। বৈষ্ণব শাস্ত্র একে বলেছে ভাবারূঢ় অবস্থা। পরিপূর্ণ আস্বাদন সামর্থে আস্বাদক, আস্বাদন, আর আস্বাদ্য বস্তু, তিনটে কোন আলাদা থাকছে না, একাকার হয়ে যাচ্ছে। যেমন আগুন জ্বাললে, তার মধ্যে কয়লা দেওয়া হ'ল। তাহলে কয়লার অগ্নিকে আত্মসাৎ করবার ক্ষমতায়, কালো কয়লা লাল হয়ে গেছে। এখানে আস্বাদক এবং পরিপূর্ণ আস্বাদন অর্থে আস্বাদ্য তিনটে একাকার হয়ে গেছে। এই হচ্ছে রাই রাজা। বৈষ্ণব তন্ত্র, সেই দিক দিয়ে রাসলীলা, তখন রাস পূর্ণিমা, তখন রাধাতন্ত্র অনুসারে শক্তি পুজো, রাধা পুজো, রাই-রাজা পুজো করছে।

পরিপূর্ণ রস আস্বাদন সামর্থে রাস। রাস কি? সব সখী দেখছে, কৃষ্ণ আমার সঙ্গেই নাচছেন। তারপর সবাই দেখছে, একজন নারী আমাদের কাছে নেই। তারপর দেখল, দুজনের পায়ের ছাপ, বুঝতে বাকি রইল না কৃষ্ণের সঙ্গে গেছে, তারপর দেখল, দুজন না, একজনের পায়ের ছাপ।

রাধাতন্ত্র বলছে, এক হয়ে গেছে, একাকার হয়ে গেছে, দুই তত্ত্ব এক হয়ে গেছে। যেমন বললাম কয়লা আর অগ্নি এক হয়ে গেছে। এখানে মনে পড়ে গেল গোরক্ষনাথজীর বাণী—

'শিবাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ।
অন্তরং নৈব জানিয়াৎ চন্দ্রচৈন্দ্রিকয়োরিব।।'

ঠাকুরের কথা—চাঁদ আর চাঁদের আলো।

রাধাতন্ত্র শক্তিবাদকে আশ্রয় করেছে। তার জন্য বহু জায়গায় দেখবেন রাধাতন্ত্র কোন না কোন ভাবে বহু যোগী ঘরানার স্বীকৃতি পেয়েছে। তারা কৃষ্ণকে পরমতত্ত্ব ধরেছে। শ্যামাচরণ লাহিড়ীর ঘরানায় এরা শুধু কৃষ্ণকেই পুজো করে, এদের রাধা নেই, অন্য সখীও নেই। এর আর একটা উদাহরণ দিই, সনাতন গোস্বামী শুধু কৃষ্ণের পুজো করতেন। কিন্তু সনাতন গোস্বামী খুব গম্ভীর, সর্বজন শ্রদ্ধেয়, তাই কোন কথা তখন হয়নি। পরবর্তীকালে কথা হয়েছে, তিনি লীলাবাদের দিক দিয়ে না শক্তিবাদের দিক দিয়ে।

আবার তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলছে,—'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্দ্ধানন্দী ভবতী'। পরমতত্ত্ব যে পরিপূর্ণ ভাবে আস্বাদন করেছে, তার জীবনে নিত্য রাস হচ্ছে, তার মধ্যে কোন চ্যুতি নেই, নিরন্তর তার জীবনে রাসলীলা হচ্ছে। স্থির পূর্ণিমা।

ঠাকুর বাধাতন্ত্রের উল্লেখ সারদা মা'র কাছে করে রাধাতন্ত্রকে মর্যাদা দিয়েছেন। আবার গৌরী মা'র কাছে জানতে বলেছিলেন, অর্থাৎ সারদা মা এই তত্ত্বের পূর্ণ অধিকারী। মূল ঘটনা ছাড়া আর এক জায়গায় নির্দেশ দিয়েছেন। স্বামীজীকে তিনি বলছেন, 'রাধারানীকে মানিস না মানিস, তাঁর টানটুকু নে' এও সমর্থন করছে। কৃষ্ণের প্রতি, পরমতত্ত্বের প্রতি ব্যাকুলতা, এটাই টান।

সর্বজন মান্য, সর্বজন শ্রদ্ধেয় একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছে, এরা হচ্ছে রামানুজ সম্প্রদায়। তাদের বলা হয় শ্রী বৈষ্ণব সম্প্রদায়। এদের ইষ্ট হচ্ছে নারায়ণ। পরবর্তীকালে বিভিন্ন মঠে এদের পূজিত বিগ্রহ, রাধা-কৃষ্ণ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে দুটো পন্থি আছে। একদল দেখবেন কপালে ত্রিপুণ্ড্র করে সাদা চন্দন দিয়ে দুদিকে, মধ্যিখানে একটা হলুদের দাগ টানে। আর এক দলের দেখবেন মধ্যিখানে লাল রক্ত চন্দনের দাগ দেয়। ভারী মজার জিনিস হ'ল, এদের দুজনের উপাস্যই বিষ্ণু হলেও যারা লাল চন্দন দিয়ে করে তারা শক্তিবাদী। অথচ এরা ভীষণ গোঁড়া বৈষ্ণব। ভাত রান্নার সময় যদি বাইরের কেউ দেখে ফেলে, তাহলে ফেলে দেয়। দেখেছি, পায়ের বুড়ো আঙুলে মাটি দিচ্ছে। অথচ শক্তিবাদী।

এই হ'ল নবদ্বীপে শক্তিমতে রাস উৎসব বা রাসকালী পূজোর ভাবনার দিক। বৈষ্ণবদের মধ্যে শক্তিবাদ বা বৈষ্ণব তন্ত্র এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

বলিদান

* বকর ঈদ্ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

** বকর ঈদ্ বলতে আমরা ভারতীয়রা যা বুঝি, সেটা হচ্ছে বলিদান। এই বলিদান, অর্থাৎ উৎসর্গ, আত্মোৎসর্গ ছাড়া পৃথিবীতে কোন মহৎ কাজ কোনদিন সম্পন্ন হয়নি। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মেই, কোন না কোন প্রকারে এই বলিদানের ব্যবস্থা আছে। আমাদের সমাজে ধর্মীয় চেতনা আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ। আমরা মহত্তর অর্থে বলিদানের ব্যবস্থা করি। শ্রীগীতায় কৃষ্ণচন্দ্র অর্জুনকে ব্যাপক নরবলি দানে উৎসাহ দিয়ে বলছেন—ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্য পরিত্যাগ কর।

ইসলাম ধর্মেও এই বলিদানের ব্যবস্থা আছে। আমরা যেমন একটা ছাগলকে বলি দেওয়ার আগে সেই ছাগলটার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ইষ্ট-ভাবনা করি এবং মনে করি সর্ব জীব ভগবত স্বরূপ হলেও স্থূলত সেই কালো ছাগলটা যেন আমাদের তুচ্ছ নিম্নতর বোধের প্রতীক, সেই নিম্নতর বোধকে যেন আমরা মায়ের কাছে উৎসর্গ করি, বলিদান করি, জয় মা বলে। এই বলিদান করার আগে তার সর্ব অঙ্গে মায়ের পুজো করি। এই নিম্নতর বোধগুলো যেন উচ্চতর বোধে প্রতিষ্ঠিত হয়,—এই ভাবনায় আমাদের বলিদান। বস্তুত ধর্মে যদি বলিদানের শিক্ষা না থাকে, সমাজের মানুষ শিখবে কোথায়!

খ্রিস্টানদেরও আগেকার দিনে এমনতর ভাবনা ছিল। এখন তো ওদের ধর্ম অনেক পোশাকি এবং প্রচারমূলক হয়ে গেছে। কিন্তু কোন এক সময় ওরা যিশুর স্মরণে এক বিরাট কাঠের ক্রুশ কাঁধে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বার হোত। হাত, পা রক্তাক্ত হোত, কোনরকম জলপান বা কিছু করত না। ভীষণ ভাবে এটা তাদের মহৎ আদর্শের প্রতি ত্যাগ, উৎসর্গের প্রতীক হয়েছিল। একটা কথা, ভগবান যিশু পরমার্থের জন্য সর্বস্ব দিতে কুণ্ঠিত হননি, প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছিলেন। যিশু মহৎ, উচ্চতর আদর্শের জন্য তৎকালীন কায়েমি অশুভ স্বার্থের বিরোধিতা করেছিলেন—যথার্থ অর্থে বিরোধিতা তিনি করেননি, তিনি যে মহৎ আদর্শ, যে শিক্ষা, ব্যক্তির যে পরম মর্যাদার কথা বলে গিয়েছিলেন, তাতে তৎকালীন শাসক, শোষক সম্প্রদায় বুঝেছিল, এই আদর্শ প্রচারিত হলে আমাদের আসন হালকা হয়ে যাবে। পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের মত সেই দেশেও শাসকবর্গ পুরোহিতবর্গের

সঙ্গে একাঙ্গীভূত ছিল। তারা বুঝেছিল, এই যিশুর শিক্ষায় আমাদের বিপদ আছে, সমাজে আমাদের স্বার্থের-শোষণের ভীত নড়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত তারা যিশুকে এমন ভাবে হত্যা করেছে যাতে আর কোন মানুষ এপথে না এগোয়। আর দ্যাখ, যিশুর এই আত্ম-বলিদান যুগে যুগে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ন্যায়, সত্য ও পরার্থ-পরতার জন্য চরম আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত করছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মেই এই বলিদান বা উৎসর্গের কথা আছে। শুধু ধর্ম চেতনাই নয়, যেখানেই কোন মহৎ প্রাণ একক বা সামগ্রিক ভাবে কোন হীনতার উর্ধ্বে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে, সেখানেই বৃহত্তর ত্যাগের, বলিদানের, আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন হয়েছে। পৃথিবীর যে সমস্ত দেশের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম, সেখানে সর্বত্রই এই ধরনের ত্যাগ, আত্মোৎসর্গের ছবি আমরা দেখতে পাই। পৃথিবী জুড়ে যেখানে যেখানে মহত্তর আদর্শ মাথা তুলেছে, তাকে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, বলিদানের মধ্যে দিয়েই দাঁড়াতে হয়েছে। সুতরাং, শুধু ধর্মীয় নয়, পৃথিবীর মহত্তর আদর্শের প্রকাশের সর্বত্রই এই সর্বস্ব-পনের কথা।

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ঠিক একইরকম আছে। এই আত্মোৎসর্গের কথা যে বলি, ওদের ধর্মীয় কথা হচ্ছে 'জেহাদ'। ইসলাম ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়— কোন সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইসলাম ধর্ম প্রসারলাভ করেছিল। সেই পরিবেশ-পরিস্থিতি থেকে একটা বৃহত্তর অগ্রগতি হয়েছে, বিরাট ভাবে সামনের দিকে পা বাড়িয়েছে। কেননা, তখনকার আরবিয় সমাজ একটা যুদ্ধ-লোলুপ দস্যু জাত। তারা সবসময় চেষ্টা করত এক দলকে মেরে, খুন করে তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করা। সেই সমস্ত বর্বর আদিম আরবিয় জাত,—যাদের পেশাই ছিল বর্বরতা। সেই ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতিতে আমাদের হজরত মহম্মদ—সেই প্রেক্ষাপটে—যতখানি উচ্চতর সমাজব্যবস্থা এবং ধর্মীয় চেতনার চেষ্টা করেছিলেন, তা বৈপ্লবিক সন্দেহ নেই। কাজেই, এই উচ্চতর ধর্ম এবং সমাজ-সভ্যতার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁকে নিরন্তর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়েছিল। স্বয়ং হজরত মহম্মদকে তাঁর জীবিতকালের সমস্তটাই প্রায় যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে রক্তাক্ত জীবনযাপন করতে হয়েছে। তাঁর বংশধররা প্রায় সকলেই নিহত হয়েছে। তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা একাধিকবার তাঁকে ভুল বুঝেছে। এমনতর পরিস্থিতিতেই হজরত মহম্মদের দেহত্যাগ। মক্কা থেকে মদিনায় চলে গেছেন, পরে আবার ফিরে এসেছেন। সেই যুদ্ধে যে ক্ষত হয়, তা থেকেই মনে হয় তার দেহত্যাগ হয়েছিল। এই ধর্ম-যুদ্ধ, জেহাদ। এই জেহাদের নামে আজ পর্যন্ত তারা বুক চাপড়ে হায় হায় করে। তাঁর বংশধর হাসান, হুসেন তো কারবালায় দেহত্যাগ করেছিল। এই ধর্মের নামে আত্মোৎসর্গের প্রতীক হিসাবে ওরা এক ধরনের প্রাণী বলি দেয়। তাকে যত্ন ক'রে পালন করে,—সন্তানবৎ স্নেহে ধীরে ধীরে পালন করে—তারপর এই ঈদের দিন তাকে আড়াই প্যাঁচে কাটে। একটা কোপে ঝপাং ক'রে কেটে দিল, তা নয়, ধীরে ধীরে কাটে। সারা বছর যাকে সন্তানবৎ পালন করেছিল, তাকে আজকের দিনে ধীরে ধীরে কাটল। কেননা ধর্মের পথে মায়া-মমতার স্থান নেই। ধর্মের নামে তাকে উৎসর্গ করে, তারপর তার মাংস সবাইকার মধ্যে বিতরণ করে। 'বকর' কথাটা আমরা মনে করি 'বকরি'। কিন্তু বস্তুতপক্ষে আরব দেশের এক ধরনের জানোয়ার, যার মাংস ওরা খায়। এই 'বকর ঈদ্'। এটা ছাড়াও ঈদ আছে। কিন্তু সবটার মধ্যে একটাই কথা—আত্মত্যাগ, আত্মোৎসর্গ।

* তাহলে আমরা একবারে কাটি কেন?

** ভাবনার ব্যাপার। দৃঢ়তার প্রশ্ন আছে। আমার হাত যেন না কাঁপে, পা যেন না টলে, সঙ্কল্পে কঠিন হয়ে থাকা—ঝপাং ক'রে কাটি। ঠাকুর যোগানন্দজীকে বললেন, আরশোলাটা বাইরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেল। কিন্তু যোগানন্দজী না মেরে ছেড়ে দিয়েছেন। ঠাকুর বললেন, মেরেছিস? বললেন,—না, বাইরে ছেড়ে দিয়েছি। তাকে বললেন—'তোকে যে বললাম মেরে ফেলতে? অত দয়া দেখাতে কে বলেছে?' তা, ধর্মের পথে ভীরু-মায়ার স্থান নেই। আমরা জানি, স্বামী বিবেকানন্দ পরমার্থের জন্য বরানগর মঠে পাঁঠা বলি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। তবে ইদানীং বলিদানের বাড়াবাড়ি দেখে বোঝা যায়, হীন স্বার্থ লোলুপ এবং মাংস লোলুপ কিছু মানুষ বলিদানের মহত্তর তাৎপর্য অস্বীকার করে ধর্মের নামে অধর্মের আয়োজনে মেতেছে। আবার কিছু দুর্বল হৃদয়, অতি কোমলপ্রাণ মানুষ গভীর ঐতিহ্যগত এই দিকটিকে পুরোপুরি অস্বীকার করে আধুনিকতার পরিচয় দিচ্ছে।

নর্মদা

শাস্ত্রে পড়েছিলাম নদীর কানে কানে কোন ঋষি বুঝি মন্ত্র দিয়েছিলেন—তোমার গন্তব্যস্থল সাগর, সাগরেই তোমাকে যেতে হবে। তখনি নদী ছুটে চলল কারো কথা না শুনে। কেউ তাকে ভোলাতে পারল না, তার তরঙ্গ-ভঙ্গে শুধু সেই মন্ত্রের অনুরণন—'সাগরে যেতেই হবে।'

আবার যখন বই-এ নর্মদার কথা পড়লাম। তখন ভাবনা আমার আরো এগিয়ে গেল—জানলাম বিপ্রসহস্র সেবিতে, মুনি জন আরাধিতে এক নদী আছে যে শুধু ছুটেই চলেছে নয়, বিপুল বেগে রব করে ছুটে চলেছে তার লক্ষ্যাভিমুখে, তাই তার নাম রেবা—ডাক নাম নর্মদা।

ছুটে গেলাম অমরকণ্টকে সেই প্রতিফলিত আদর্শকে নয়ন গোচর করতে। দেখে কিন্তু আমার নিরস তত্ত্বসন্ধানী মন ভরল না—এ যে এক ছোট্ট পার্বত্য নদী। ছোট্ট পাহাড়ী নৃত্য পরায়ানা মেয়ের মতই ছুটে চলেছে আপন উদ্দেশ্যহীন খেয়াল খুশীতে। দুপাশে ফুটে থাকা অজস্র বুনো ফুল ঝরে পড়ছে তার জলে আর চলার পথের বাঁকে বাঁকে সেগুলো জমে আছে বুঝিবা তার কানের কুণ্ডল হয়ে। উচ্ছলিত জলের শব্দে বুঝিবা তারই চঞ্চল নূপুরের কানাকানি। ঘন ঘাসবনের অঙ্গনে তার এই উদ্দেশ্যহীন আপনমনে আঁক কাটা, বুঝিবা সুখস্বপ্নের মতো নেহাতই সুন্দর।

ওঁকারেশ্বরে এসে দেখি সেই নর্মদার অন্য পরিবেশে এক অন্য রূপ। দু-পাশে উঁচু পর্বত শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে গভীর খাতে প্রবল গর্জন করে সেই অপাপবিদ্ধা ছুটে চলেছে। দু পাশের উঁচু পর্বত প্রাচীর কি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে বিশ্বের সমস্ত মলিনতা থেকে অতন্দ্র প্রহরায় তাকে সযতনে রক্ষা করছে? পর্বতের বুঝি মনে পড়েছে তার পর্বত নন্দিনীর কথা। তাই বুঝি লুকিয়ে থাকা সমস্ত স্নেহ আজ এমনি করেই প্রকাশিত।

আবার দেখি দু-পাশের উঁচু পাললিক শিলাময় পর্বতশ্রেণী স্তরে স্তরে নেমে এসেছে পুণ্যসলিলা তটিনীকে স্পর্শ করতে। বুঝি অজস্র মানুষের অনন্ত আকুলতা এমনি করেই স্তরীভূত হয়ে আছে। এই রুক্ষ কঠিন, ধূসর পর্বত শিলার প্রতি স্তরে কোন অ-পঠিত

প্রাচীন দুর্বোধ্য ভাষায় লেখা আছে, সাধক মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ইতিহাস। লেখা আছে, কেমন করে সে একদিন স্পর্শ করেছে তার সর্ব পবিত্র মঙ্গল আদর্শকে।

নিশীথ রাতে যখন কেউ কোত্থাও নেই। চারিদিক নিস্তব্ধ, চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ে নর্মদার জলে, পাথরে পাথরে বাতাস বহে যায় ধীরে ধীরে। তখন বুঝি, কোন এক নাম না জানা, রাত জাগা পাখীর ডাকে, পাখীর কাছে, এই মৌন, মুখর হয়ে ওঠে বাতাসের ফিস্‌ফিসানি আর জলের কলরোলে, জলকলস্বরে।

শাস্ত্রে যখন পড়েছিলাম নর্মদা নদী বিপুল বেগে গভীর রব তুলে সাগরের পানে ছুটে চলেছে। তাই এর অপর নাম রেবা। পড়েছিলাম—

'ভিত্ত্বা শৈলঞ্চ বিপুলং প্রযাতেব্যংমহার্ণবম্
ভ্রাময়ন্তী দিশঃ রবেন বহতা পুরা।
প্লাবয়ন্তী বিরাজন্তী তেন রেবা ইতি স্মৃতা।।'

অমরকণ্টকে আমার মন মিল খুঁজে পায়নি শাস্ত্র আর তার সাধনায়। এখানে এসে শাস্ত্রের সততা আমার দিগ্‌দর্শন হলো। সত্যই তো রেবা রব করেই ছুটে চলেছে এক বন্য প্রেম-উন্মাদিনী মেয়ের মতো। ছুটে চলেছে তার সকল শক্তি নিয়ে সেই নিঠুর-দরদী মানুষটির কাছে, যে সর্ব চঞ্চলতার আড়ালে গভীরতম প্রশান্তিতে প্রতিষ্ঠিত আছে।

নদীর ধারে বসে, মনে পড়ে যায় একটি গান—

'অনেক দিয়েছ নাথ
বাসনা তবু মিটিল না।...'

সত্যিই তো—বাল্যের ঘাসের বনে বনে লুকোচুরি খেলা, কৈশোরের নগরে নগরে প্রদক্ষিণ করা, কিছুই তো তাকে ধরে রাখতে পারেনি। তাই বুঝি আজ জল-শব্দে ঝংকৃত হচ্ছে বিশ্বকবির গানের শেষ কথা—তোমারে না পেলে আমি
ফিরিব না ফিরিব না।

রেবা রব করে ছুটে চলেছে দূরে বহু দূরে, যেখানে আকাশ আর নদীর মেশামেশি। আমি জানি অনুমানে, অত দূরে ছুটে গিয়ে, কি গোপন কথা ওরা কানাকানি করে। নদী শুধিয়েছিল আকাশকে, 'তুমি কি তাকে দেখেছ?' আকাশ বলেছিল, 'তাই তো আমি আকাশ হয়ে গেলাম। তুমি কি যাবে তার কাছে?' নদী ছুটে যেতে যেতে লজ্জানত মুখে গেয়েছিল সেই গান—

('শুধু) নামের শ্রবণে যার ঐছন্ করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।'

প্রতিদিন যখন আমি সেই সর্বপবিত্রমঙ্গলা সরিদ্বরের কাছে যাই, স্নান তর্পণ করি, তখন অদূরে উজানে ঘাটের কাছে মেয়ে, বৌয়েরা ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে আবিরে-কুমকুমে নানান ব্রত করে ভাসিয়ে দেয় অনেক কামনায় গাঁথা বাসনায় রঙিন তাদের মালা, মা নর্মদার উদ্দেশে।

জলের স্রোতে আমার পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে দুলে দুলে যখন ভেসে চলে যায় সেই মালা, আমার অন্তর আকুল করে ওঠে গান—

'যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে।'

আবার যখন সন্ধ্যা নেমে আসে। একটি ছোট সে মেয়ে পাতার ঠোঙায় প্রদীপ জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দেয় নর্মদার কাজলা জলে। জলের স্রোতে, বাতাসের দোলায় ধীরে ধীরে ভেসে চলে যায় সেই আলোর বিন্দু দূরে, অনেক দূরে কোন অজানা উদ্দেশে।

ছোট্ট মেয়ের কালো চোখের তারা বুঝি ব্যথায় আরো কালো হয়ে ওঠে। গাল বেয়ে ঝরে পড়ে কবোষ্ণ অশ্রুধারা। পিছনে বসে থাকা পিতাজী উদ্‌গত অশ্রু চেপে রেখে পাষাণ হয়ে বসে থাকে। চারিদিকে অখণ্ড নীরবতা।

একসময় মেয়েটি স্বপ্নোত্থিতের মত বলে ওঠে, 'পিতাজী, মাতাজীর নামে এমনি, এমনি আরো অনেক আলো জ্বালিয়ে দিলে হয় না?'

তখনো আমার অন্তরে ধ্বনিত হয়ে ওঠে সেই গান—

'ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা
প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।'

ফুলদোল

হিন্দুদের একটা বড় তিথি, শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের সঙ্গে, রাধারানীর সঙ্গে ফুল নিয়ে আনন্দ উৎসব করেন।

বিভিন্ন বৈষ্ণব তীর্থে, বিশেষ করে বৃন্দাবনে সাজায় ফুল দিয়ে। সমস্ত কিছুই ফুলের। জামা, কাপড়, ঘাগরা, এমনকি মুকুট, গয়নাগাটি সব কিছুই ফুল দিয়ে, তার পাপড়ি দিয়ে তৈরি করে। ভক্তেরা সে সব অপরিসীম ধৈর্য, নিষ্ঠা, ভক্তি নিয়ে সারাদিন ধরে তৈরি করে। বহুদিন ধরে ভেবেছে, কেমন করে সাজাবে রাধা-কৃষ্ণকে, কেমন করে সাজালে রাধা-কৃষ্ণকে আরো ভালো লাগবে, আর লীলা চিন্তার মধ্যে দিয়ে বৈষ্ণব সাধকরা পথ করে নেন।

দারুণ বৈশাখেও এই ফুলের সজ্জা, রাধা-গোবিন্দকে নিয়ে, ভগবানকে নিয়ে ভক্তের আনন্দ বিলাস। চারিদিকে যখন মরুভূমির মত অবস্থা, তখন এসব দেখে অবাক লাগে। একটা গান মনে পড়ে যায়, 'তবু প্রাণ নিত্য ধারা'। বাইরের সমস্ত বিরূপতার মধ্যেও ভক্তের প্রাণের প্রকাশ, আনন্দধারা সেখানে অটুট, অক্ষুণ্ণ, অমলীন হয়ে আছে। সমস্ত বিরূপতার মধ্যে ভক্ত এই যে ভগবানকে নিয়ে আনন্দ করছেন, নিকষ পাথরে পাহাড়ে কল কল ঝর্ণার মত প্রাণের ধারা সেখানে নিত্য প্রকাশিত হচ্ছে। আর এটাই ভক্তের চরিত্র।

ভক্তের সঙ্গে ফুলের একটা ভারী সুন্দর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ সেই ছবি এঁকেছেন, '....নেই ধূলা মোর অন্তরে'। আমাদের অন্তরে তো ধূলা নেই। ভক্ত এই সংসারের হাজার পঙ্কিলতার মধ্যে, আবিলতার মধ্যে জন্ম নিয়েছে, সমস্ত দৈন্যতার মধ্যে জন্ম নিয়েছে, বেড়ে উঠেছে। কিন্তু তার অন্তর পবিত্রতার, শুচিতার, ভগবত প্রেমের পূর্ণতায় টলমল করে। ভগবত প্রেমের, ভগবত ভক্তির সৌন্দর্য ছড়িয়ে যায়, ফুলের সৌন্দর্য আর তার সুগন্ধের মত। তার মনে এই ফুল ফুটে ওঠে। বাউল গানে আছে, 'ও তুই ঘুমের ঘোরে থাকবি কত আর'। আমরা, আমাদের অন্তরে যে ভক্তি ফুল ফোটবার সম্ভাবনা আছে তা বুঝতে পারছি না। যে কুঁড়ি আমাদের জীবনের আড়ষ্টতায় আড়ষ্ট হয়ে আছে, কবে তার খবর নেব? এটার খবর নেওয়া হয়নি, নিতে হবে। এটাই আমাদের জীবনের পবিত্রতম কর্তব্য, দায়িত্ব, কবে সেই ফুল ফোটাব। গানটি হ'ল—

'ও তুই ঘুমের ঘোরে থাকবি কত আর,
চেয়ে দ্যাখ ভোরের আলোয় নেই কো অন্ধকার।
তোর এই মনেতে ফোটে যে ফুল
কবে তুই খবর নিবি আর,
ঘুমের ঘোরে থাকবি কত আর।'

এ কালের রবি-কবি গেয়েছেন, 'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে, গো ফুল ফুটবে। আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।' এই জীবনের সমস্ত কাঁটা, ব্যথা ধন্য করে ফুল ফুটবে। তার জন্য এই জীবনের পথ চাওয়া। এই ফুল যেদিন ফুটবে, সেদিন ভগবান তুলে নেবেন, আমার অন্তর ভগবানের আনন্দের উপকরণ হবে।

সহস্র ভক্তের অন্তরের আকুলতায় ভগবান নেমে আসবেন এই মাটিতে, ভগবান আবার ফুলদোল খেলবেন। তার জন্যই পথ চাওয়া। সহস্র ভক্তের অন্তরে সহস্র রঙের ফুল নিয়ে তিনি লীলা করবেন, তবেই সেটা ফুলদোল। নিত্য ভক্তের অন্তরে নিত্য লীলা। অনন্ত ভক্তের আধারে অনন্ত ফুল ফুটে আছে, ভগবান তাদের অন্তরে নিত্য ফুলদোল করছেন, ভক্তের হৃদয়-কুসুম নিয়ে ফুলদোল। আর অনন্ত ভক্ত-কুসুমে অনন্ত, স্বাতন্ত্রের সমৃদ্ধি।

শুধু আমার নয়, সমস্ত ভক্তের অন্তরে সেই রঙের আগুন ছড়িয়ে পড়ুক। 'সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে'। আর মনে রাখতে হবে—'ফাগুনের কুসুম ফোটা হবে ফাঁকি, আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি'।

মা কালী

বলা হয় 'উনপঞ্চাশৎ বর্ণ'। আমাদের যে বর্ণ, এই বর্ণগুলো সমস্ত মন্ত্র। মহামন্ত্র থেকে সমস্ত মন্ত্র বেরিয়েছে। যেহেতু মা আদ্যাশক্তিরূপিনী, কাজেই সৃষ্টির সমস্ত অভিব্যক্তি তাঁর মধ্যে। মন্ত্রের যে স্পন্দন, সেটা সৃষ্টি হয় অনুস্বার দিয়ে, শক্তির এলাকায়। এই সৃষ্টির মধ্যে অভিব্যক্ত মায়ের শব্দময় রূপ আর কি। এই সমস্ত মন্ত্র মায়ের মালায় ধৃত হয়ে আছে। মন্ত্রকে আত্মসাৎ করেন মহামন্ত্রের মধ্যে। মা হচ্ছেন মহা-মন্ত্রময়ী। সমস্ত মন্ত্রকে আত্মসাৎ করে তাঁর আবির্ভাব। এটা যদি অনুলোম ক্রমে দেখ:

মহামন্ত্র 'ওঁ' শিব-শক্ত্যাত্মক। অ-উ-ম, সৃষ্টি স্থিতি-লয় শক্তির খেলা। তারই একদেশে শিব স্বরূপতায় তিনি সংহত হয়ে আছেন নাদ-বিন্দু তথা অর্ধমাত্রার মধ্যে।

আবার যদি তুমি পৌরাণিক গল্প-কাহিনীর মধ্যে দিয়ে দেখ, তুমি দেখবে সমস্ত অসুরকে তিনি নাশ করছেন। যা সুর নয়, তাই অসুর। এই অসুর নাশ ক'রে তাদের মুণ্ডুগুলো পরেছেন, তাদের হাত দিয়ে কাঞ্চি-আবরণ করেছেন। সাধকের অন্তরে-বাইরে অসুর-বিনাশিনী রূপ তাই এরকম।

ঠাকুর বলেছেন—কালী ব্রহ্মময়ী, আদ্যাশক্তি। শক্তি যদি বল, তাঁর মধ্যে ভালো-মন্দ দুটো দিকই আছে। 'বিদ্যাবিদ্যে মম তনু'-শুভ, অশুভ। কিন্তু যখন তুমি মাতৃভাবে আদ্যাশক্তির উপাসনা করছ, তখন সেখানে শুভ শক্তিরই উপাসনা। প্রসন্ন হচ্ছেন তিনি, তাই অশুভ শক্তিকে বিনষ্ট ক'রে শুভ শক্তি-বিদ্যাশক্তি রূপে প্রকাশিত হচ্ছেন। সেইজন্য তাঁর হাতে খড়্গ এবং তা অসুর-শোণিত-লিপ্ত। অসুরকে তিনি নিয়ত বধ করছেন।

করেছেন শুধু নয়,—উদ্যত, মানে নিয়তই বধ করছেন। সদা উদ্যত। আর, যেটা বিনাশ করেছেন, হাতে তাঁর মুণ্ড। এখন বা পূর্ব পূর্ব কল্পে যেগুলো বিনাশ করেছেন, সেইগুলো তাঁর মুণ্ডমালায়। অশুভ শক্তি যখন বশীভূত হয়, তখন তা মূলগত শুভ শক্তির অনুগত।

সেসব রূপ ছাপিয়ে তিনি বরাভয় দিচ্ছেন। একটা হচ্ছে অভয়। তিনি অভয় দিচ্ছেন যারা সংগ্রামে রত অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে,—তা সে ব্যক্তিগত সাধনার ক্ষেত্রে হোক বা সামাজিক কি রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে হোক,—সর্বক্ষেত্রেই তাদের অভয় দিচ্ছেন। আর, যারা বিজিত, তাদের বর দিচ্ছেন। বলা হয়—বরাভয়দাত্রী।

সৃষ্টির বিরাট বিচিত্র বিকাশ আর তার অন্তরালচারী বিপুল শক্তি সাধকের অন্তরে আত্মসাৎ করছেন, নিজের মধ্যে সংহত ক'রে মহাশক্তি মহামন্ত্রের বিকাশ—তাই কালী। আর শক্তির অন্তরালচারী যে পরম আনন্দ, প্রশান্তি, তত্ত্ব অনুভূতি, তাই শিবস্বরূপ, তাঁকে আশ্রয় করেই মায়ের যা কিছু প্রকাশ।

তিনি কারণানন্দময়ী, তিনি কারণানন্দদায়িনী। সেই কারণানন্দে, মহানন্দে তিনি টলমল করছেন। এটাকে কমলাকান্ত বলেছেন, 'আশব আবেশে লোহিত লোচনী'। আর, মায়ের প্রাচীন স্তবে তাঁর চোখের বর্ণনায় বলছে, 'বালার্ক মণ্ডলাকার'। সূর্য যখন ওঠে তখন লাল আর উজ্জ্বল। টলমল করছেন নিজের আনন্দে, আর সেই আনন্দ তিনি সবাইকে দান করছেন। মায়ের এসব ভাবগুলো তো ঠিক ঠিক আনতে হবে। ভেতরটা গরগর করলে মুখটা থমথম করবে না? মা তেমনি নিজের ভাবে টলমল করছেন। লক্ষ্মী পুজোর দিন মায়ের পুজো হয় তারাপীঠে। ঐ সময় মায়ের রূপ দেখবে একেবারে টলমল করছেন। ভয়ানক ভিড় হয় সেই সময়, রাসমঞ্চে মাকে বের করে। তা, মা কালীর রূপও তাই, টলমল করছেন করুণায়।

মা যেমন করুণায় টলমল করছেন, 'আশব আবেশে লোহিত লোচনী'। আর ভৈরব শিব যেখানে, সেখানেও বলছে—'উন্মত্ত ভৈরবং তত্র সর্ব সিদ্ধি প্রদায়কম্'। ভৈরব শিব সেখানে উন্মত্ত হয়ে গেছে। কিসে উন্মত্ত হয়ে গেছে? আত্মানন্দে। যেখানে ভৈরব আত্মানন্দে উন্মত্ত, নিজের আনন্দে টলমল করছেন, সেখানে সাধকও সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মায়ের রূপ যেমন, টলমল করছেন—'আশব আবেশে লোহিত লোচনী', তেমনি বাবার রূপ—'উন্মত্ত ভৈরবং তত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়কম্'। সেই উন্মত্ত চিদানন্দের অধীরতা ছড়িয়ে পড়ে—ভরিয়ে দেয় উন্মুখ সাধকদের অন্তর। কেমন সব বর্ণনা আছে শাস্ত্রে।"

এখন তো বেনারসী পরাচ্ছে। মা যে ন্যাংটা, তার ভাবটা কেমন সুন্দর বলেছে। 'মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীং'। যখন আকাশ জুড়ে কালো মেঘ এসে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলে, তাকে কেউ আবৃত করতে পারে? কিসেই বা আবরণ করবে? সর্বব্যাপ্ত। তেমনি মা আমার সর্বব্যাপ্ত স্বরূপিনী, তাঁকে কে বা আবৃত করবে, আর কিই বা আবৃত করবে? মা তো সমস্ত ব্যাপ্ত হয়ে বিরাজ করছেন। 'তথাচৈব দিগম্বরীং'। মহামেঘ যেমন সমস্ত আকাশ জুড়ে বিরাজ করছে, মা-ও তেমনি সর্বব্যাপ্ত হয়ে বিরাজ করছেন। সেদিক দিয়ে দিগম্বরী। দিগ্ অম্বর যাহার—দিগম্বরী। কত সুন্দর দেখ।

আবার যে ভয়ঙ্করী রূপ, (করালবদনাং ঘোরাং) সাধকের অন্তরের পাপ তিনি বিনাশ করার জন্যই ভয়ঙ্করী রূপ ধারণ করেছেন। অন্তরের কলুষ তিনি নাশ করছেন। কিন্তু তার মধ্যেও তাঁর কল্যাণ ইচ্ছাটাই প্রবল।

মায়ের মুখে কিন্তু হাসি আছে। প্রসন্ন হাসি। মারব, ধরব বলছে কিন্তু ছেলে জানে, মা তো, যতই মারব-ধরব বলুক, মনে তো ভালোবাসে আমাকে। তেমনি, যত রুদ্র রূপই থাকুক না কেন, মুখ তাঁর প্রসন্ন, মুখে তাঁর প্রসন্ন হাসি ছড়িয়ে আছে। যত যাই করুন, সব মঙ্গলের জন্যই, কল্যাণের জন্য করছেন। শেষে কল্যাণ তিনি করবেন, কল্যাণ ভাবনাই প্রধান। সেইজন্য বলছে—'সুখপ্রসন্ন বদনা'। স্মেরাননা। ঈষৎ হাস্যযুক্তা তাঁর মুখমণ্ডল। সব কিছু দুঃখকষ্ট, ব্যথা-বেদনার আড়ালে তাঁর প্রশান্তি, তাঁর কল্যাণ ভাবনাটাই প্রবল, প্রধান।

হিন্দু দেবদেবী

মানুষের ভাব, রুচি, প্রবণতা অনুযায়ী এক একটা রূপের সৃষ্টি হয়েছে ও তাদের ভাব এবং তাদের সব কিছুর নিখুঁত বর্ণনা শাস্ত্রে আছে এবং শাস্ত্রসম্মত ভাবেই তাঁদের আরাধনা করার বিধান আছে।

রূপ বহু হ'তে পারে, কিন্তু স্বরূপ তো একই। আমার গুরুদেব বলতেন, 'যে রূপই আসুক, তাই-ই ঈশ্বরের রূপ ভাববি'। যে এক রূপের ধ্যান চিন্তা করে, তার কাছে অন্য রূপ প্রকাশিত হতে পারে। বা, যারা রূপের ধ্যান করে না, তাদের কাছেও কখনো কখনো বিভিন্ন রূপ প্রকাশিত হ'তে পারে। কিন্তু যার কাছে যে রূপই প্রকাশ হোক না কেন, তাকেই সেই এক ঈশ্বরের রূপ ভাবতে হবে। কারণ, জগতের যা কিছু, যত রূপ, যত শক্তি, সবই সেই পরমেশ্বর ভগবানেরই। সুতরাং, যাঁরই আরাধনা করা হোক না কেন, সেই পরমেশ্বরেরই আরাধনা করা হয়। যে কোন রূপেরই উপাসনা করতে করতে শেষে পরমেশ্বরের কাছে পৌঁছবে। তবে যে একটি রূপকে ইষ্ট বলা হয়, তার কারণ একৈক নিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সাধক তার মনের গভীরতা খুঁজে পাবে।

এই যে মানুষের বিভিন্ন ভাব, রুচি, প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন রূপের সৃষ্টি হয়েছে, তা কি সব এক? তাদের মধ্যে কি কোন পার্থক্য নেই? আছে। এদের দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। এক—ভাবস্বরূপ বা মাধুর্যস্বরূপ, আর দুই—তত্ত্বস্বরূপ।

যারা ভাবস্বরূপ বা মাধুর্যস্বরূপ আস্বাদন করতে চান, তাদের কাছে প্রকৃষ্ট রূপ হ'ল রাধা-কৃষ্ণ রূপ। সেখানে লীলা আস্বাদনের, মাধুর্য আস্বাদনের চরমতা দেখান হয়েছে। যেমন—চৈতন্যদেব ভাবাবেশে ব্যাকুল, জগন্নাথ দর্শনের জন্য ছুটে চ'লেছেন দুই হাত প্রসারিত করে। এই ছবি অনেকেরই ঘরে আছে। এই রূপ ভক্ত আরাধনা করতে পারে ব্যাকুল ভাব আনার জন্য।

তত্ত্বস্বরূপের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ হ'ল শিব-শক্তি। মা কালী শবরূপী শিবের বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছেন—কালো রং, চোখ দুটো লাল, বালার্ক, অর্থাৎ প্রথম সূর্যের মত উজ্জ্বল লাল। (হেসে) সংসারে মা খুব জড়িয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে। আসলে দিব্য ভাবাবেশে, করুণায় স্পন্দিত হচ্ছেন। এই বিশ্বপ্রকৃতি মায়া দ্বারা আবৃত, তাই কালো। তাঁর পারে আছেন পরমতত্ত্বস্বরূপ শিব। তিনি নির্বিকার, শান্ত, মায়ার অতীত, তাই তিনি শব হয়ে আছেন। তাঁর গায়ের রং জ্যোতির্ময়—সাদা। মায়ার অতীত কিনা, আর তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তাই জ্যোতির্ময়। মায়াময় বিশ্বপ্রকৃতির পারে গেলে তবেই তাঁকে জানা যায়। সেখানে

আর তিনি শব নয়। জেগে উঠেছেন পরম বোধে। আসলে ঈশ্বরের চেতনায় আমাদের দেখা নয়। আমাদের চেতনায় ঈশ্বর দর্শন।

তারও নিখুঁত বিবরণ শাস্ত্রে আছে। তিনি শব, কারণ জগৎ ব্যাপার তাঁর কাছে প্রপঞ্চ। তাই প্রপঞ্চিভূত দৃষ্টিতে তিনি শব। মিথ্যে নয়, যেন খেলার পুতুল, যা একরূপে অনিত্য, যার স্থায়িত্ব নেই। জগতব্যাপার বিলীয়মান ছিল, আছে, থাকবে না। অনিত্য, তাই গায়ে শ্মশান ভস্ম। তিনি মহা যোগীশ্বর, তাই নাগ-উপবীত। নাগেশ্বর। সমস্ত অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত তাঁর নখদর্পণে, তাই তিনি পরম বৃদ্ধ। পার্বতী বলছেন, শাশ্বত, চিরন্তন তুমি, অথচ আমি কেন বারবার মরি, আবার তোমার কাছে বারবার আসি, কেন এই বিস্মৃতি বিচ্ছেদ? তুমি কি আমাকে ভালোবাস না? শিব বললেন, 'খুব ভালোবাসি। আমার গলায় এই যে হাড়মালা দেখছ, প্রত্যেকবার তুমি মারা গেলে ঐ দেহের একটা করে হাড় এই হাড়মালায় জুড়ে দিই। তা আমার কণ্ঠভূষণ। বুক জুড়ে শোভা পাচ্ছে।

প্রতি কল্পে পার্বতীর মৃত্যু হয় অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতি বিলীন হয়। তারই নিদর্শন স্বরূপ এক একটি হাড়। শিবজীর সব কল্পের স্মৃতি থাকে। পার্বতীকে এখানে বিশ্বপ্রকৃতি বলা হচ্ছে। লীলা আর তত্ত্বের অপূর্ব সমন্বয়। আবার অন্য দিক দিয়ে দ্যাখ—ঈশ্বরকোটি মহাজনদের পূর্ব-পূর্ব জন্মের তপস্যার স্মৃতি থাকে তো। এই স্মৃতিই হাড়মালা।

তিনি জগত ব্যাপারে উদাসীন, তাই নিভৃত গুহায়-শ্মশানে ধ্যানমগ্ন। তিনি আত্মানন্দি, তাই যোগ সমাহিত। শ্মশানে-মশানে তপস্যারত—তাই জটাজুট সমন্বিত। আর, শিব ঢুলু ঢুলু চোখে বসে আছেন। ঐ অবস্থা হ'ল অর্ধবাহ্যদশা। আত্মানন্দি, আবার করুণা-পরবশ। নইলে ভক্তজনার চলে কি করে।

আর একটা কথা—গুরুমূর্তির ধ্যান। গুরুমূর্তি সহজেই মনে আসে। কারণ, তিনি প্রত্যক্ষ, তাঁর সান্নিধ্যে আসছি। অন্যান্য রূপ কল্পনা করতে যত অসুবিধে হয়, এই রূপ তত সহজ। আর, সবচেয়ে ফলদায়ী। কারণ, মন সহজেই নিবিষ্ট হ'তে পারে।

আবার গুরুমূর্তির ধ্যান সবচেয়ে কঠিন। কারণ, লৌকিক ভাবে তাঁর সান্নিধ্যে আসার ফলে তাঁর মনুষ্য রূপের ভাবের পশ্চাতে যে ভগবদ্‌স্বরূপে তিনি বিরাজ করছেন, ঐ ভাব আনা কঠিন। যারা সাধনার মধ্যে দিয়ে ঐ স্তর পার হয়ে শ্রীগুরুর মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ অনুভব করেন, তারাই ঐ মূর্তি ধ্যান করার যোগ্য। নাহলে ততটাই কঠিন। একটি কথা এই যে, শিষ্য যখন শ্রীগুরুর সংস্পর্শে আসে, তখন নিরন্তর একটা সূক্ষ্ম সংঘর্ষ এবং উত্তরণের মধ্যে দিয়ে সে সাধনার পথে এগিয়ে চলে। এক্ষেত্রে শ্রীগুরুমূর্তিতে নিরন্তর অবিচল নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধা রাখা অনেক সময়ই কঠিন হয়ে পড়ে। অনেকটা এগিয়ে গেলে অবশ্য এ সমস্যা থাকে না। এই জন্যই শাস্ত্রে ইষ্ট ভাবনার কথা আছে। এজন্য ঐ অবস্থা প্রাপ্ত না হলে বা সংস্কার না থাকলে, ও শিষ্যের বিশেষ আগ্রহ না থাকলে কোন গুরুই তাঁর মূর্তি-ধ্যানের অনুমতি দেন না। গুরুমূর্তি ধ্যান যত সহজ, যত ফলদায়ী, ততই কঠিন ও ব্যর্থ। সে ধরনের উত্তম অধিকারী গুরু ও শিষ্য হলে, শিষ্যের অপ্রত্যাশিত ভাবেই শ্রীগুরু মূর্তি ধ্যানের মাঝে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

মহালক্ষ্মী

সাধন জীবনের যে পূর্ণতা, তা হচ্ছে মহালক্ষ্মী। সাধকের জীবনে পূর্ণতার যে শ্রী, সেই হচ্ছে মা লক্ষ্মী। সেই মা লক্ষ্মী আছেন। তিনি মুনিজন বন্দিতা মা লক্ষ্মী। আর এই মা লক্ষ্মী—সাধারণ জীবনের যে সাধ-আহ্লাদ। কিন্তু একমাত্র সেখানেই তো সব পূর্ণ হয়ে আছে শ্রী, শান্তি সব কিছু, যেখানে মা-মহা অর্থাৎ মহত্তম অর্থে লক্ষ্মী। সেই মা—তিনি যেমন ইচ্ছা করবেন, তেমন ভাবেই তাঁর সন্তানকে সাজাবেন যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্যে। তাঁর মেজাজ, তাঁর আনন্দ সাপেক্ষে। অরবিন্দের মহালক্ষ্মী, মহা সরস্বতী, মহাকালী পড়েননি? মহালক্ষ্মী যে আছেন, সেটা মানুষের শুভ-অশুভ কর্মফল প্রসূত নয়, সেটা হচ্ছে কর্মফলের পারে, সেটা মায়ের করুণা। মা লক্ষ্মী পূর্ণতা স্বরূপিনী। সন্তান চায় মায়ের প্রসন্নতা; এই মহালক্ষ্মী।

তখনকার সমাজ তো কৃষি-ভিত্তিক ছিল,—চাষবাস ভালো হ'লে দুটো পয়সা তো ঘরে আসে, সেইজন্য ধানের পুজো চলে আসছে সেই থেকে। মা লক্ষ্মীর এক হাতে ধানের গুচ্ছ, আর এক হাতে টাকার ঝাঁপি। মা যেখানে বসে আছেন, তারই পেছনে মাঠের পর মাঠ ধান হলুদ হয়ে আছে—ছবিটা এরকম। লাল কাপড়ের উপর কড়ি দিয়ে একটা ঝুড়ি বানায়, তার মধ্যে সোনার টাকা, রুপোর টাকা রেখে দেয়, সেটা সিন্দুকের প্রতীক। আবার মেয়েদের যেসব জিনিসের লোভ ছিল, সেইগুলো রাখে—ফিতে, আরশি, চিরুনি, এসব। বলে লক্ষ্মীর ঝাঁপি। এইগুলো মানুষের লোকাচার, মানুষ যেগুলো সাধ-আহ্লাদ করে, মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনটাকে সে পুজোর আসনে বসিয়েছে। লক্ষ্মী ঠাকুর তখনকার দিনে চালু হয়েছে তো। এখনকার দিনে চালু হলে ব্যাঙ্কের পাশ বই, ফিক্সড ডিপোজিটের কাগজপত্র রাখত। সব কিছু যা বিশাল, তাকে ছোট্ট করা, মানুষের নিত্যদিনের তুচ্ছতা আর কি। ভুলে যায় পার্থিব সমৃদ্ধি কোন স্থায়ী প্রশান্তি দিতে পারে না।

কিন্তু মহালক্ষ্মী আলাদা। মানুষের জীবনের যে গভীরতম পূর্ণতা, সেখানেই মহালক্ষ্মী। মানুষ জীবনের যে চরিতার্থতা, সেটাই মহালক্ষ্মী। তিনি আছেন। যেমন আর সব ব্রহ্মবাচক দেব-দেবী আছেন—শিব, কালী, দুর্গা, তেমনই। এই দেশের হাওয়ায় উপনিষদের মন্ত্র অতন্দ্র প্রত্যাশায় ফিসফিসিয়ে বলে—নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্।

তাহলে দুর্গা পুজোর পর লক্ষ্মী পুজো কেন হয় বুঝতে পারলেন তো? অসুর যখন নাশ হয়ে গেল, মা তখন অধিষ্ঠান করছেন তাঁর পূর্ণ মহিমায়। এ যুগের ঋষি রবীন্দ্রনাথ মানুষকে ডাক দিয়েছেন সেই মহা প্রস্তুতির—লক্ষ্মী যখন আসবে তখন—

কোথায় তাঁরে দিবিরে ঠাঁই।
দেখ রে চেয়ে আপনপানে পদ্মটি নাই।।"

বিজয়া

দেবতারা যখন বিজয় উৎসব করছে, তখন অসুর পক্ষ কি করেছে? কালো ব্যাজ পরে, গর্তে-অন্ধকারে-ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে কান্নাকাটি করেছে। তাহলে, আজকে যেটা দেবতাদের বিজয় উৎসব, সেটা অসুরদের বিষাদ দিবস। আর, আমরা যখন বিজয় উৎসব

করছি, তখন আমাদের এটা মনে রাখতে হবে, আমরা কি সমস্ত মনে প্রাণে সেই শুভ পক্ষ, মহতের পক্ষ নিতে পেরেছি? আমরা কি সেই পবিত্রতার সংগ্রামে ব্রতী হয়েছি? তবেই আমাদের বিজয় উৎসব করা মানায়। নাহলে ঝোপ-ঝাড়ে লুকিয়ে থাকতে হবে। আমরা কি আমাদের অন্তরে সেই অখিল দেবশক্তি-সমূহ-মূর্তা-মহাদেবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম ক'রে যাচ্ছি? এই প্রশ্ন করতে হবে। আমরা শুধু নেহাৎ আমাদের ক্ষুদ্রতার-তুচ্ছতার মধ্যে নিজেদের বদ্ধ করতে চাইছি, না সেই মহৎ-এর আবাহন করছি, প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি? তবেই যেন আমরা বিজয়া করি। এই বিজয়া করার তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। নাহলে শুধু কোলাকুলি ক'রে কি হবে? অবশ্য মিষ্টি খাওয়াটা হবে।

দেখ, বিজয় উৎসব করে দেবতারা যখন মহাদেবীকে স্তব করল, তখন মা দুর্গা বললেন কি? 'যখনই তোমরা মনে করবে যে তোমরা বিপদগ্রস্থ, তোমাদের শুভ সত্তায় তোমরা প্রতিষ্ঠিত নও, তখনই তোমরা আমাকে ডাকবে, আর আমি অবশ্যই আবির্ভূতা হবো। মা বললেন—

'ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থথা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতির্য্যাহং করিষ্যাম্ অরিসংখ্যয়ম।।'

শুধু যে আজই করলাম, তাই নয়, শুধু মেধস মুনির আশ্রমে নয়, যখনই এবং যেখানেই সেই শুভশক্তিকে আবাহন করবে, তখনই তিনি আসবেন। তাই, শুধু বাইরে নয়, অন্তরক্ষেত্রেও আবির্ভূত হবেন। চণ্ডীতে পঞ্চম অধ্যায়ে ব্যাপ্ত চৈতন্য আর অনুচৈতন্য রূপে মাকে বার বার প্রণাম জানানো হয়েছে।

সেই আবাহন যদি ধ্রুব ক'রে, শাশ্বত করে রাখতে পারি, তাহলে মা তো কথাই দিয়েছেন তিনি আসবেন, সহায় হবেন। চণ্ডীতে এটা মায়ের প্রতিজ্ঞা বলা হয়। যেমন গীতায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করছেন—হে কৌন্তেয়, জেনে রাখ, আমার ভক্তকে আমি উদ্ধার করবই। এটাই হচ্ছে চণ্ডীর সবচেয়ে আশ্বাসের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ

অবতরণ তত্ত্ব

'শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত'। মধ্য খণ্ড, ষড়বিংশ অধ্যায়ে দেখি কেশব ভারতীকে নিজেই মন্ত্র দিলেন আবার তাঁর কাছ থেকে নিলেন। বৃন্দাবন দাস বলছেন—আগে শিষ্য করলেন পরে গুরু করলেন।

শ্রীভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁর নিজের একটা মন্ত্র আছে, নাম, রূপ আছে, সবটা নিয়েই তিনি অবতীর্ণ। ভগবান অথবা ভাগবতকল্প পুরুষ, সবাই অবতার। অর্থাৎ তাঁর সব কিছুই নিত্য। মানুষ সাধনা করে সিদ্ধ হয়, তখন তাঁর নাম, রূপ একটা স্থিতি পর্যন্ত নিত্য হয়। কেননা তিনি যখন সাধনার চরমে প্রপঞ্চকে ভেদ করেন, তখন স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক সব স্তর তাঁর চেতনায় বিদ্ধ করেন। স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণাত্মক সর্বস্তর পরম বোধে একীভূত করেন। সেজন্য তাঁর নাম, রূপ, ভাবনা দিব্য স্তরে কালের প্রসাদ লাভ করে। ভগবান বা ভগবতকল্প পুরুষ যখন অবতীর্ণ হচ্ছেন, তখন তিনি অধিকাধিক ভাবে সর্বকালের জন্য করুণাউন্মুখ দিব্য সত্তা নিয়েই অবতীর্ণ হন। সেইজন্য কেশব ভারতী যখন কি মন্ত্র দেবেন চিন্তা করছেন, তখন তিনি নিজেই জানিয়ে দিলেন এই মন্ত্র নির্দিষ্ট এবং নিত্য। শ্রীচৈতন্য উদ্‌ঘাটিত করলেন তাঁর স্বরূপ, মন্ত্র এবং অবতরণের তাৎপর্য।

যেমন বিভিন্ন দেব-দেবীর স্বরূপমন্ত্র আছে, সেই মন্ত্রে আরাধনা করে, সেই মন্ত্র হচ্ছে বীজ স্বরূপ, এই বীজের সাধনায় সর্বশক্তি সমন্বিত নাম, রূপ ভাবাত্মক ব্রহ্মবাচক দেব বা দেবী প্রকাশিত হন, তেমনি শ্রীভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই অবতরণের বীজাত্মক মন্ত্র তিনি প্রকাশ করলেন কেশব ভারতীর কাছে।

আর, যে জগত-উদ্ধারণ নামে তিনি পরিচিত হবেন—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য—সেই নামেরও সেই ক্ষণে অবতরণ হয়েছে যে ক্ষণে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। কেশব ভারতী যখন আত্মস্থ হলেন, সেই নাম খুঁজে পেলেন। বললেন, সরস্বতী দেবী তাঁর কাছে প্রকাশিত হলেন এবং সেই নাম প্রকাশ করলেন। বস্তুত এসবই এককক্ষণে, কিন্তু নবদ্বীপ লীলায় ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হচ্ছে স্তরে স্তরে। যেমন ভাবে লীলা বিকাশ লাভ করছে, তেমন ভাবে প্রকাশ হচ্ছে। এ সমস্ত লীলারই অবতারণা। তাঁর আবির্ভাব, তিরোভাব, সবই অবতরণের মধ্যে, কালানুক্রমিক প্রকাশের অপেক্ষায়। এইজন্য অন্তরঙ্গজন বলা হয়। তাদেরও আবির্ভাব-আত্মপ্রকাশের সময় থাকে। নিয়ে আসেন বারবার। চৈতন্য লীলার পরতে পরতে তারা নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। এরা যেন বিভিন্ন স্তবক এক মহা দ্যুতিমান পুষ্পের।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম সম্পর্কিত রহস্যের দিকে তাকাই, তবে তা সঙ্গত ভাবেই কিছুটা সহজবোধ্য হয়ে আসে।

একটা কথা ঠাকুর যেমন বলেছেন, 'বল আর অন্যায় কাজ করব না, তাহলেই হ'ল, ভগবানের নামে আনন্দ কর'। এই কথাটা কাদের সম্বন্ধে বলেছেন? তখনকার দিনে সমাজে খ্রিস্টধর্মের প্রভাব খুব বেশি ছিল। পাপ এবং পাপের স্বীকার, এইগুলোর উপর খুব জোর দিয়েছিল। তারই অনুসরণে ব্রাহ্মসমাজে পাপ, পাপী, এই কথাগুলো বারবার বলত, সেইগুলো খুব বড় ক'রে দেখিয়েছিল। ঠাকুর সেজন্য, সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন, 'কেবল পাপী পাপী বলো না, বল পাপ করেছি, আর করব না, ঈশ্বর চিন্তা কর'। ব্রাহ্মসমাজের এবং তখনকার দিনের খ্রিস্টান প্রভাবিত সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ঠাকুর এই কথাগুলো বলেছিলেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে এর মধ্যে দিয়ে ঠাকুর পাপী, যারা পাপাচরণ করছে, তাদের পাপ এবং পাপাচরণকে লঘু ভাবে দেখলেন বা নেহাৎ মাফ ক'রে দিলেন—এমন মনে হয় না। অনুশোচনা, আত্মগ্লানি কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। এই তীব্র দহন জ্বালার পথেই মানুষ পবিত্রতা অর্জন করবে। অন্যায় যা কিছু, তার জন্য যদি অনুশোচনা, আত্মগ্লানি না আসে, তাহলে মানুষ কিছুতেই পাপ প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে পারবে না। আমি যদি নিজেকে যথার্থ পাপ প্রবণতা থেকে মুক্ত করতে না পারি, তাহলে ধর্মাচরণ লোক দ্যাখান বিড়ম্বনা মাত্র। এই পৃথিবী কার্য-কারণের মধ্যে দিয়ে চলছে, আমার যে ঘর নোংরা হয়েছে, তা আমাকেই পরিষ্কার করতে হবে, তারপর প্রশ্ন আসছে, আর নোংরা করব কি না। কোন চার্চ, কোন মন্দির, কোন মসজিদ নেই যে বলতে পারে—ঠিক আছে, খালাস করে দিলাম। যদি বলে, তাহলে সেটা ধাপ্পা দেওয়া কথা। ঠাকুর এই কথা বলেছেন ব্রাহ্মসমাজের এবং যারা খ্রিস্টান প্রভাবিত, তাদের সম্বন্ধে। ঠাকুর বলছেন, 'তোমাদের ব্রাহ্মসমাজে কেবল পাপ, পাপ', এত পাপ কেন? তার চেয়ে বল, হে ভগবান, যা করেছি আর করব না' ৮ এটা একটা পদ্ধতি। কারণ, যা করেছি তা দ্বিতীয়বার করলে তো মিথ্যাচরণ হয়ে যাবে। এই আর করব না বলার পর যেন আর দ্বিতীয়বার কিছুতেই সেদিকে মন না যায়, সেজন্য আত্মগ্লানির দহনে মানুষকে পবিত্র হতে হবে। পবিত্র হৃদয়েই তো ব্যাকুলতার সঞ্চার। ঠাকুর 'কেবল' কথাটা ব্যবহার করেছেন। কোন মতেই অনুতাপকে অস্বীকার করেননি। 'কেবল' কথাটার যথার্থ অর্থ তিনি বিচারের স্থানে বিচার এবং ব্যাকুলতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

দ্বিতীয় কথা—'যত মত তত পথ', এই কথার মানে এই নয় যে, সব মত নিয়ে একটা পথ হয়েছে। এটা হ'তে পারে না। মানুষ তার রুচি, তার সংস্কার অনুযায়ী পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে ছড়িয়ে আছে। তার রুচি, সংস্কার, আত্মিক সামর্থ অনুযায়ী তার নিজের একটা পথ সৃষ্টি হয়, সেই পথ দিয়েই সে যায়। সব পথ মিলিয়ে একটা পথ নয়। সব পথই সত্যি, যে যে পথ দিয়ে ভগবানের কাছে গেছে, সেটাই সত্যি। প্রত্যেকটার একটা দৃষ্টিভঙ্গি, একটা আদর্শ আছে। আচার্যরা ব্যাখ্যা করেছেন, সেটাই তার স্বধর্ম, যেটা তার আত্মিক বিকাশের সহায়ক। অন্যের দেখাদেখি বা উদারতার নাম ক'রে পাঁচমিশুলি করতে গেলেই তার আধ্যাত্মিক জীবনের মৃত্যু। উপলব্ধিবান মহাপুরুষরা বলেছেন, 'যত মত তত পথ'—এটি সামগ্রিক ভাবে। একক বা ব্যক্তিগত ভাবে—এক মত এক পথ। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সবচেয়ে বড় উদাহরণ। তিনি যখন যে-ভাবের সাধন আস্বাদন করেছেন, তখন পুরোপুরি সেই-ভাবের সাধনের সব কিছু মেনে নিয়েছেন। রাম

ভক্তের ভাবে তিনি পিছনে লেজ বানিয়ে গাছের ডালে ডালে ফিরেছেন। আল্লা সাধনের সময় মুসলমান বাবুর্চির হাতের রান্না খেয়েছেন। আর, আল্লা সাধন এবং নিরাকার সাধন, উভয় সময়েই কালীঘরে যান নি। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, তিনি বিভিন্ন ভাবের সাধন আস্বাদন করেছেন মাত্র, তবুও তা করেছেন যথাযথ। প্রত্যেক মানুষের জন্য তার নির্দিষ্ট একটা পথ আছে, যেটা তার আত্মিক উন্নতির পক্ষে সবচেয়ে বেশি সহায়ক। একটাই মত, একটাই পথ—এই প্রসঙ্গে আমি কঠোপনিষদের একটা কথা তুলে ধরছি।—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'। ক্ষুরের অগ্রভাগের ন্যায় তীক্ষ্ণ এই পথ। অনেকে বলেছেন—দুর্গম। মহর্ষি রমণকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এটার মানে কি এই? তিনি বললেন—আর একটা মানে আছে। কি সেই মানে? মানেটা হচ্ছে, প্রত্যেক মানুষের একটা নির্দিষ্ট মুক্তির পথ আছে, তা ক্ষুরের ধারের মত সোজা এবং পরিষ্কার ভাবে হিসেব করা, তা এদিক-ওদিক বা ঝাপসা নয়। নির্দিষ্ট পথ আছে, পাঁচমিশেলি নয়। সেই পথই তাকে অনুসরণ করতে হবে। আর একটা উদাহরণ দিতে হবে। স্বামী অভেদানন্দকে ঠাকুর দেখে বললেন, 'মহাযোগী, অনেক করেছে', নিজের হাতে হাত রেখে বললেন, 'কিন্তু ঠিক ঠিক হয়নি, তাই, আর একটু বাকি আছে'। এই 'ঠিক ঠিক' হওয়া, এটি খুবই বড় কথা। একালের অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর স্বরূপানন্দজীও এই মত পোষণ করতেন। তিনি বলতেন, 'বহু মন্ত্র, বহু পথ, সাধকের দুঃখের কারণ। একটা নির্দিষ্ট মন্ত্র, একটা নির্দিষ্ট ভাব, একটা নির্দিষ্ট পথ নিয়ে তাকে এগোতে হবে।

তৃতীয় কথা—ঠাকুরের আর একটা কথা—'সদা সত্যতে থাকবে', 'সত্য কথা কলির তপস্যা', 'যে সত্যকে ধ'রে আছে, সে ভগবানের পা ছুঁয়ে আছে'। প্রচণ্ড নৈতিক মূল্যবোধের কথা ঠাকুর বলে গিয়েছেন। নৈতিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করে কেউ ভগবানের কাছে পৌঁছতে পারবে না। নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে দিয়েই মানুষ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে পৌঁছতে পারবে। এটা বড় সত্য, কিন্তু এটা তত প্রচার করা হয় না। আজকের সমাজের সর্বস্তরে যে ব্যাপক ভাবে পাপ, দুর্নীতি আর মিথ্যে আচরণের আসর বসেছে, সততাকে সেখানে খুঁজে পাওয়া ভার। সত্য নিষ্ঠা আর ঈশ্বর নিষ্ঠাকে ঠাকুর এক আসনে বসিয়েছেন, এ বড় কম কথা নয়। মনে করুন তো, ঠাকুরের বাবা একটা মিথ্যে কথা বলার চেয়ে সর্বস্বান্ত হওয়া শ্রেয় মনে করলেন। তবেই তো তিনি ঠাকুরকে ঘরে আনতে পেরেছিলেন। আমরাও তো ঠাকুরকে আমাদের বুকের মাঝে আনতে চাইছি। যদি বল আজকের সমাজে ঠাকুরের কোন বাণী সবচেয়ে বড় ক'রে দেখানো উচিত? তাহলে এটাই আমি মনে করি সমস্ত মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় বাণী।

চতুর্থ কথা—ঠাকুর মায়াবাদী ছিলেন না। অদ্বৈত-মায়াবাদে শক্তিকে অস্বীকার করা হয়, মায়াকে একটা কিম্ভূত-কিমাকার বস্তু বলা হয়, যা জ্ঞান-নাস্য। জ্ঞানের উদয়ে মায়া নষ্ট হয়ে যায়। তাই মায়া অনাদি কিন্তু সান্ত। ঠাকুর রামপ্রসাদের গানের কথা দিয়ে বলেছেন, 'আমি কালী ব্রহ্ম, জেনে মর্ম, ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি'। বলছেন, 'সাপ যখন কুণ্ডলি পাকিয়ে আছে, তখন ব্রহ্ম', আর যখন সচল, তখন তাঁকে আমি কালী বলি'। আবার রামপ্রসাদের গান ধরেছেন, 'প্রসাদ বলে কালী বলে আমি তত্ত্ব করি যারে, সেটা চাতরে কি ভাঙব হাঁড়ি বোঝ না মন ঠারে ঠোরে'। এমন অসংখ্য উপমা দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের কালী কোন জ্ঞান নাস্য মায়াবাদ নয়। সেখানে শক্তিকে

ব্রহ্মের অভিন্ন-স্বাভাবিক প্রকাশ বলা হয়েছে। সেখানে দুধ আর দুধের ধবলত্ব যেমন আলাদা করা যায় না, তেমনি ব্রহ্ম আর ব্রহ্মের শক্তি আলাদা করা যায় না। বলেছেন, চাঁদ আর চাঁদের আলো, মণি আর মণির জ্যোতি যেমন আলাদা করা যায় না, তেমনি ব্রহ্ম আর ব্রহ্মের শক্তিকে কি আলাদা করা যায়? গোরক্ষনাথজী হাজার বছর আগে বলেছেন—

শিবস্যাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ।
অন্তরং নৈব জানীয়াৎ চন্দ্র-চন্দ্রীকয়োরিব॥

বা সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতিতে তিনি যে-কথা বলেছেন—

'অলুপ্তশক্তিমান্ নিত্যং সর্বকারতয়া স্ফুরণ্।
পুনঃ স্বৈনৈব রূপেন এক এবাবশিষ্যতে॥'

অলুপ্ত শক্তিমান ব্রহ্ম সর্বরূপে স্ফুরিত হয়েও নিত্যই চিদানন্দ স্বরূপে বিরাজ করছেন। নাথ সিদ্ধান্তে একে চিদ্-বিলাস তত্ত্ব বলা হয়েছে। দর্শন শাস্ত্রের সাধারণ পরিভাষায় একে পরিণামি অদ্বৈতবাদ বলা হয়েছে। কালীবাড়ির বামুন যে-কথা বলে গিয়েছেন, হাজার বছর আগে গোরক্ষনাথজী সেই-কথা বলে গিয়েছেন। যদি উপনিষদের কথা আনি, তবে শ্রীচৈতন্যদেব শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের যে-কথা আবৃত্তি করেছিলেন, সেই শ্লোকই স্মরণ করা যেতে পারে—

'পরাস্য শক্তি বিবিধৈক শ্রুয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥'

স্বাভাবিকী অর্থে পারমার্থিক স্বরূপে বা স্বতঃসিদ্ধ। কাজেই ঠাকুর মায়াবাদী ছিলেন না। সারদা মা যে-অদ্বৈতবাদের কথা বলেছেন, তা অবশ্যই পরিণামী বা শাক্তাদ্বৈতবাদ- নইলে মাকেই তো উড়িয়ে দেওয়া হয়। 'যত মত তত পথে'র বিস্তার হিসাবে তিনি সব মতকেই স্বীকার করেছেন। সেই দিক দিয়ে তিনি মায়াবাদী বেদান্ত দর্শনকে মত-পথ হিসাবে স্বীকার করেছেন মাত্র। উপনিষদের সৃষ্টি প্রকরণে বলা হয়েছে—নির্বিশেষ ব্রহ্ম ইচ্ছা করলেন তিনি এক হয়েও বহু হবেন। এই ইচ্ছা বলেই নির্বিশেষ থেকে সবিশেষ, ক্রমে এই সৃষ্টি বিলাস। এই ইচ্ছাটা কি? তিনিই আদ্যাশক্তি। ব্রহ্মের যা ইচ্ছাশক্তি, তাই আদ্যাশক্তি। তাঁর বিলাস এই জীব জগৎ। এই ইচ্ছার বিপরীত ক্রম ধরেই সাধক তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠাকুর বলেছেন, 'যদি বল বেলের শাঁস কতটুকু, তাহলে শুধু শাঁসটুকু নিলেই হবে। কিন্তু যদি বেলটা কতটুকু ছিল বলা হয়, তাহলে শাঁস, বিচি, খোলা, সবটাই নিতে হবে'। কাজেই ঈশ্বরতত্ত্ব সবটাকে নিয়েই, কোন কিছু বাদ ওেয়া যায় না। এই হ'ল চতুর্থ কথা।

পঞ্চম কথা হচ্ছে এই, ঠাকুর বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে শেষে মন্ত্র নিয়েছিলেন। এটাই যে চরম সত্য, এটা বললেন কে? তিনি তো গোবিন্দ রায়ের কাছ থেকে আল্লা মন্ত্র নিয়েছিলেন, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছ থেকে তন্ত্র শিক্ষা নিয়েছিলেন, কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছ থেকেও তন্ত্রদীক্ষা নিয়েছিলেন। এটা মনে করার কিছু নেই যে, একটাব চেয়ে আর একটা বড়। রামায়েতরা কি ঈশ্বরলাভ করে না? তন্ত্র মতে কি স্বরূপ-স্থিতি হয় না? এটার চেয়ে ওটা বেশি ভালো বলে একটার পর আর একটা ধরলেন, এটা ভাবার মত ভুল কিছু নেই; এটা চাকরি ছাড়ার ব্যাপার না। বলা হয় তিনি শেষে তোতাপুরীর কাছ

থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন বলেই এটা সবচেয়ে উঁচু বা ভালো। এটা মনে করার মত ভুল আর কিছু নেই। কারণ, শেষে তিনি বেদান্ত সাধন নেন নি। নিয়েছিলেন আল্লা সাধন। তাহলে তো আল্লা সাধনই সবচেয়ে বড় বলতে হয়। আর এক্ষেত্রেও মায়ের কথা মনে করা যেতে পারে যে, এই পৃথিবীর মানুষ যত ভাবে তাঁকে আস্বাদন করে পরমানন্দ লাভ করেছে, তিনি সেই সব ভাবে আনন্দ আস্বাদন ক'রে বিভোর থাকতেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা—স্বামীজী যখন বলেছিলেন, আমার ইচ্ছে চার-পাঁচ দিন ধ'রে সমাধিস্থ থাকি, একটু নেবে আবার সমাধিস্থ হয়ে যাই; তখন ঠাকুর বললেন, এর চেয়েও উঁচু অবস্থা আছে। তুই তো গাস—'যো কুছ হ্যায় সো তুহি হ্যায়'। বস্তুতপক্ষে, নাথ দর্শনে এবং আগমাদি অন্যান্য শৈব দর্শনে এই সহজ অবস্থাকেই শেষ কথা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরাবস্থাকে 'সমতত্ত্ব' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

'অদ্বৈতং ক্বচিৎ বিদ্যন্তি, দ্বৈতং বিদ্যন্তি চাপরে।
পরং তত্ত্বং ন জানাতি দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণম্।।'

ওঁঙ্কারানন্দ মহারাজ

তখন আমার বয়স ২৪ বছর। নিরন্তর ঈশ্বরীয় দর্শনাদি এসে আমার যুক্তিবুদ্ধির জীবনটাকে তছ-নছ করে দিতে লাগল। এই ভাঙার পালায় একটা গড়ার দিক ছিল—এক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ এসে যখন-তখনই আমাকে অবাক করে দিত।

ছুটলাম জানা-অজানা কাছে-দূরের সাধু-সন্তদের কাছে। সকলেরই এক কথা—এসব তোমার সংস্কার। মনটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। যা জানিনা, বুঝিনা, মানিনা, তাই মানতে হবে?

এই সময় আমি মাঝে মাঝে যেতাম হাওড়া, কাসুন্দে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে। একদিন গিয়ে শুনলাম, বেলুড় মঠের এক খুবই শ্রদ্ধাভাজন মহারাজ এসেছেন। নাম ওঁঙ্কারানন্দ। দূর থেকে দেখতে লাগলাম। কিন্তু কথা বলা দূরের কথা, কাছে ঘেঁষতেই পারিনা। চারিদিকে সব টাক মাথা মানুষের ভীড়। কিছু পরে উনি এক সরু রাস্তা দিয়ে মৃগেনবাবুর ঘরের দিকে যেতে লাগলেন। সঙ্গে আবার তারা। রাস্তার দু-দিকে ছোট গাছের বেড়া, তারপর কিছু মাঠ। হঠাৎ উনি লাফ দিয়ে গাছের বেড়া, পেরিয়ে মাঠের মধ্যে দৌড়িয়ে গেলেন। প্রবীণরা ওঁনার ছেলেমানুষি বুঝে হাসতে লাগল। আমি এই সুযোগ নিলাম। কাছে গিয়ে সটান জিজ্ঞেস করলাম—কেউ যদি যখন-তখন ঈশ্বরীয় রূপ দ্যাখে, তার মানে কি? কেন হয়, কি দরকার? উনি পরিষ্কার ভাবে আমার দিকে তাকালেন। তারপর কোমল অথচ দৃঢ় গলায় বললেন—যদি তুমি ভাব, তোমার ভাবনার জন্যই এই সব স্বপ্ন বা দর্শনাদি হচ্ছে, তাহলে আমি তোমায় প্রশ্ন করি—তোমার বয়সী ছেলে অন্য অনেক কিছুই দেখতে পারত। সে সব না দেখে শুধু ঈশ্বরীয় রূপই কেন দেখতে পাচ্ছ?

সেদিন সেই সবুজ মাঠের মধ্যে উনি আমার জীবনে এক নতুন প্রশ্ন, নতুন ভাবনার জন্ম দিলেন, যা আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারলাম না!

নিত্যানন্দের খোলে শ্রীচৈতন্য

লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব আর ঠাকুরের অন্যান্য জীবনীগ্রন্থে দেখি, কামারপুকুর থেকে সিহড়ে যাবার পথে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখলেন, দুটি কিশোরবয়স্ক সুন্দর বালক তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে সবুজ মাঠে বহুদূরে ঘুরে বেড়িয়ে, আবার কখনো কাছে এসে হাসি কথা বলে শেষে তাঁর শরীরে মিলিয়ে গেল। এই ঘটনার প্রায় দেড় বছর পরে ভৈরবী মা যখন ঠাকুরের কাছে এই দর্শনের কথা শুনলেন, তিনি বললেন—"বাবা তুমি ঠিক দেখেছ, এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য এবার একসঙ্গে একাধারে এসে তোমার ভিতরে রয়েছেন।"

লীলা তত্ত্বের বিচারে, বস্তুতপক্ষে গৌর-নিতাই এর একীভূত শরীর বলতে দুটো শরীর তো মিশে এক হয় নি, দুটো ভাবনা, দুটো স্বরূপ বা আস্বাদন মিশে এক হয়েছে। এই দুটো ভাবনার মেশামেশি শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাময় জীবনকে এত গরীয়ান করেছে। গৌরাঙ্গ আর নিত্যানন্দ, দুজনেই ভগবান। তবে, লীলা তত্ত্বের বিচারে গৌরাঙ্গ হচ্ছেন শ্রীরাধা বিভাবিতা কৃষ্ণ তনু, আর নিত্যানন্দ হচ্ছেন চন্দ্রাবলী বিভাবিতা কৃষ্ণ তনু। শ্রীরাধার বাইরে বিরহ, অন্তরে তিনি পরিপূর্ণ কৃষ্ণময়ী। তাই তিনি প্রেমানন্দময়ী। প্রেমস্বরূপা। তাঁর ভাব স্ব-গত। চন্দ্রাবলী পরিপূর্ণ বিরহ-মাধুর্যময়। শ্রীরাধার বাইরে বিরহ, অন্তরে পরিপূর্ণ মিলনাত্মক। কিন্তু বিরহের মধ্যে যে মাধুর্য, তা চন্দ্রাবলীর আস্বাদন। যার জন্য দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় চলে গেলেন, রাধারানী তখন ভাবারূঢ় হয়ে চন্দ্রাবলীকেই প্রথম কৃষ্ণমন্ত্র দিচ্ছেন। বলছেন, 'কৃষ্ণ নাম মন্ত্র আজ লহ সখীগণ'। কৃষ্ণ নাম মন্ত্র— আমার অন্তরে যে কৃষ্ণ পূর্ণরূপে বিরাজ করছেন, সেই অন্তরের কৃষ্ণকে নাম রূপে তোদের অর্পণ করলাম। অষ্টসখীকে কৃষ্ণ মন্ত্র দান করলেন। তার প্রথম এবং প্রধান হচ্ছেন চন্দ্রাবলী। চন্দ্রাবলীর সেই সাধনার সম্পূর্ণতায় আবার নিত্যকালের মিলন। বৈষ্ণব মহাজনরা যে শাস্ত্র প্রণয়ন ক'রে গিয়েছেন, তাতে এই ভাবেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দীক্ষা তো হ'ল, তার গুরু দক্ষিণা কি? দক্ষিণা বলেছেন—কৃষ্ণ নাম প্রচারণ। জগৎময় কৃষ্ণনাম প্রচারণ করতে হবে। তাই দেখি রাধা-ভাব-বিভাবিতা কৃষ্ণ তনু শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হলেন, বাইরে বিরহ, অন্তরে মিলন আস্বাদনের জন্য। আর এই কৃষ্ণ নামের সাধনার পূর্ণতায় যে অন্তরের গভীরতম আস্বাদন, সেই আস্বাদন স্বরূপ নিত্যানন্দ প্রভু। তিনি জগতময় কৃষ্ণ নাম প্রচার ক'রে দক্ষিণা দিলেন। বলে 'রাই ঋণ'। তাই দেখি তাঁর অবধূত বেশে দীর্ঘ চব্বিশ বছরের কঠোর পরিক্রমা মণ্ডিত তপস্যার জীবন। শ্রীচৈতন্যের চরণ দর্শনের পর নব জীবন প্রাপ্ত হ'য়ে জগতময় নিত্যানন্দ প্রভু সেই হরিনাম ছড়িয়ে দিয়ে হরি স্বরূপে শান্ত হলেন। একই স্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্কর্ষণ শক্তি দ্বারে বলরাম তথা নিত্যানন্দ দ্বারে বিরহ-মিলনাত্মক বা বিপ্রলম্ভ ভাবে বৈরাগ্য এবং নাম-প্রচারণ ব্রত নিয়েছিলেন।

রাধা বিভাবিতা কৃষ্ণ তনু, চন্দ্রাবলী বিভাবিতা কৃষ্ণ তনু। তা স্বরূপতঃ কৃষ্ণ তনু একটাই, কিন্তু ভাবটি থাকছে দুটো। একটা হচ্ছে স্বরূপ আস্বাদন বা সম্ভোগমূলক বিরহ, আর একটা হচ্ছে বিরহ আস্বাদন মূলক স্বরূপ লাভ। একটি প্রেমের, অপরটি বৈরাগ্যের পথ। এখানে প্রেম উপলব্ধ সত্তা আর বৈরাগ্য উপলব্ধ সত্তা, দুটো একীভূত। যার জন্য

ঠাকুর যে দেখেছেন আর যোগেশ্বরী ভৈরবী মা তা ব্যাখার করলেন, এটা যথার্থ এই জন্য যে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে একাধারেই দুটি ভাব সমান্তরাল। স্বভাবতঃই ভগবত ভাবে তাঁর যে আস্বাদন-মাত্র একাদশ বর্ষ বয়সেই আকাশে মেঘের বুকে বলাকা দেখে— বিশালাক্ষ্মী তলায় যাবার পথে বা শিবের সাজে সাজিয়ে দেওয়ায় সমাহিত হয়ে যাচ্ছেন— তাঁর মধ্যে এই প্রেম-সঞ্জাত স্বরূপানন্দ। আর বিরহ-সঞ্জাত স্বরূপানন্দের স্ফূর্তির মধ্যে দীর্ঘ কঠোর সাধক ভাব প্রকাশিত হয়ে আছে। আবার বলছি, গৌর-নিতাই একীভূত তনু হবার জন্যই যদিও প্রেম-সঞ্জাত স্বরূপ স্ফূর্তি শিশুকাল থেকেই ছিল, থেকে থেকেই নির্বিকল্প সমাধিস্থ হয়ে যেতেন, তবুও এই বিরহ-সঞ্জাত স্বরূপ স্ফূর্তির প্রেরণায় তাঁকে আমরা দীর্ঘকাল ধ'রে অমানুষিক, অত্যন্ত কঠিন তপস্বীর ভূমিকায় দেখতে পাই। আর শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা জগতের কাছে এত সর্বজন হিতকারী গভীর আস্বাদনের বিষয় হ'য়ে রইল।

সারবস্তু

★ কথামৃতে দেখছি—ঠাকুর অবতার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলছেন তিনি অনন্ত। তাঁর সার বস্তুটুকু মানুষের রূপে অবতরণের মধ্যে দিয়ে আসে—তিনি প্রেম, ভক্তি শেখাতে আসেন।...ভগবানের অসার বস্তু তাহলে কি?

★★ ঈশ্বর হচ্ছে পূর্ণ সগুণ সত্তা, এই সত্তার আমরা সেই জিনিসটুকু চাই, যাতে আমরা ভগবানের আনন্দ-স্বরূপ, চেতন-স্বরূপ, এইগুলো লাভ করতে পারি। ঈশ্বরের মধ্যে সর্বস্বরূপ আছে। যেমন, তিনি মায়াতে, মোহতে, মানুষকে বদ্ধ করছেন, মানুষকে অজ্ঞানের মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন। সবই তো তিনি। আবার আর একটা দিক হচ্ছে, তিনি জ্ঞানময়, প্রেমময়, আনন্দময়—সগুণাত্মক, ব্রহ্মদৃষ্টিতে—সবগুলোই তাঁর গুণ। কিন্তু যখন আমি সাধক, ভক্ত, তখন সার বলতে আমি তাঁর বরণীয় বা কাম্য জিনিসগুলো—তাঁর ভক্তি, প্রেম, চৈতন্য, আনন্দ এইগুলোই চাইছি। সেইজন্য আমাদের গায়ত্রীতে আছে— 'বরেণ্যং ভর্গো'। সূর্য। ব্রহ্মস্বরূপকে প্রতীক করা হচ্ছে, তাঁর বরণীয় তেজটুকু আমরা গ্রহণ করি। সেখানে অবরণীয় বলতে সেইগুলো, যেগুলো আমি চাই না। তিনি পূর্ণ সত্তা, তাঁর মধ্যে সব কিছু আছে। কিন্তু সেইগুলো আমি চাই, যেগুলোতে আমি আনন্দময়, চৈতন্যময়, প্রেমময় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হব। তিনি তো পূর্ণ স্বরূপ, তাঁর মধ্যে বিদ্যা-অবিদ্যা সবই আছে, সবই তিনি ধারণ করছেন এই সৃষ্টির বিকাশের মধ্যে। গীতায় আছে— 'বিদ্যাবিদ্যে মম তনু'। এখানে তিনি ব্রহ্মস্বরূপ। আর যেখানে তিনি দয়াময় ভগবান, সেখানে তিনি ' জ্যোতির জ্যোতি, উজল হৃদি কন্দর'। বেদে আছে—'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখম্ তেন মাং পাহি নিত্যম্'। দক্ষিণ মানে প্রসন্ন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে—'যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি'। তাঁর কল্যাণতম রূপটি যেন আমি দর্শন করি। যদি বল জগতজননী বা নারায়ণ বা শিব,—তাঁর মধ্যে বরেণ্যং, অবরেণ্যং নেই, তাঁর সবটাই কল্যাণতম সার বস্তু। কিন্তু আদ্যাশক্তি হিসাবে যদি ভাব, সেখানে সব আছে। সেখানে— 'সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতদ্'। আবার এই কথাও আছে—'বিদ্যাষু শাস্ত্রেষু, বিবেকদীপেষু'। তিনিই অন্তরে বিবেক দীপ হয়ে প্রজ্জ্বলিত হচ্ছেন। আবার সমস্ত বিশ্বকে মমত্ব গর্তে,

মোহ অন্ধকারে নিমজ্জিত করছেন। এই দুটো দিক বলছে, বলতেই হবে। কেননা শক্তির মধ্যে সবই আছে। শুভ-অশুভ, সব দিক নিয়েই শক্তি। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের এই বিশ্লেষণ, বিজ্ঞান সার্বজনীন ভাবে কিছুটা অনুধাবন করতে পেরেছে।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা দিবস

আজ মা ভবতারিণীর প্রতিষ্ঠা দিবস। সকাল থেকে মন্দিরময় দক্ষিণেশ্বর কত ফুল, মালা দিয়ে সাজিয়েছে। সানাই বাজছে। চারদিকে যেন আনন্দের স্রোত বইছে।

প্রতিষ্ঠা কথাটা হ্যাঁ-ও বটে, না-ও বটে। কেন বল তো? হ্যাঁ এই জন্যে, রানী রাসমনি আজকের দিনে, এই স্নানযাত্রা তিথিতে মাকে এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর না এইজন্য, কথিত আছে, প্রতিষ্ঠার শুভদিন নির্ধারণে বিলম্ব হওয়ায় কালী মা, রানী মাকে স্বপ্ন দিয়ে বলেছিলেন—'আমাকে আর কতদিন এই ভাবে বাক্সবন্দী করে রাখবি? যত শীঘ্র পারিস আমাকে প্রতিষ্ঠা কর'। সুতরাং তিনি তো আগে থেকে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েইছিলেন। আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা এক্ষেত্রে গৌণ।

তেমনি ভগবান রামকৃষ্ণদেবও নিজে থেকে পায়ে হেঁটে কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরে এসে উঠেছেন। বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেছে, এইখানে তিনি স্বয়ং এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। জগতের মানুষ আজ সেখানে ভক্তি-প্রণতঃ। তাই আজ এইখানে তাঁরও প্রতিষ্ঠা দিবস।

ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণদেব যে সর্বভাবে ভগবানকে আস্বাদন করবেন, তার ইঙ্গিত দেবার জন্যই যেন মা এই বৈষ্ণব তিথি—স্নানযাত্রার দিন এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা স্বপ্ন পাবার পর রানীমা দেখলেন কাছাকাছি এই তিথিটাই প্রতিষ্ঠা করার মত ভালো দিন। এক্ষেত্রে মায়ের মতলব না রামকৃষ্ণের মতলব বোঝা ভার।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় এখানে ছিলেন বটে, কিন্তু সেই সময় কৈবর্তের অন্ন গ্রহণ করবেন না, তাঁর এই মত দৃঢ় থাকায় তিনি মায়ের মন্দিরে প্রসাদ পেতেন না। সিধে নিয়ে পঞ্চবটীতে গঙ্গাতীরে নিজের হাতে রেঁধে খেতেন। তাঁকে তো কুসংস্কারগ্রস্থ বলা যাবে না। সামাজিক নিষ্ঠাটুকু বজায় রেখেই তিনি এখানে এসেছিলেন। উত্তরকালে এই মায়ের মন্দিরের প্রসাদই তিনি আনন্দ করে নিজে খেয়েছেন, তাঁর প্রিয় ভক্ত সন্তানদের খাইয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যথার্থ আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে কোন বিধিনিষেধ খাটে না। এইখানেই রামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিকতার সামগ্রিকতা।

রানী রাসমনি মায়ের নাম দিয়েছিলেন 'জগদীশ্বরী'। আর ঠাকুর নাম দিয়েছেন 'ভবতারিণী'। তিনি জগতকে ত্রাণ করছেন, তাই তিনি ভাবতারিণী। যিনি ভবতারিণী তিনি জগদীশ্বরী তো বটেই। আরো একটা চিরন্তন নাম আছে—দক্ষিণেশ্বরী। এই জায়গার নাম দক্ষিণেশ্বর। তাই মায়ের নাম দক্ষিণেশ্বরী।

কালের পথ বেয়ে দেখা যায়—আজকের এই শুভ দিনে ঠাকুরের সন্তানরা ছুটে এসেছেন ঠাকুরকে নিয়ে আনন্দ করতে—কবির ভাবনায়—

'চারিদিকে ঝলমল করে ভক্ত-গ্রহদল
ভক্তসঙ্গে ভক্তসখা লীলারসময় হে।'

অব্যাহত ধারায় আজো সহস্র সন্তান ছুটে আসছে দক্ষিণেশ্বর ভগবানকে প্রণাম জানাতে। তাই এই তিথি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকাশ-প্রতিষ্ঠা তিথি। যিনি সর্ব দেব-দেবীময়, তিনি এক সদ্‌গুরু বিগ্রহ রূপে এখানে বিরাজ করছেন।

অষ্টসখী

সৃষ্টি তত্ত্বের যে আরোহ-অবরোহের দিক নিরন্তর চলছে, দু-এর মধ্যেও লীলা নিশ্চয় আছে। এও তো মায়েরই লীলা। তিনি নিজেকে প্রচ্ছন্ন করছেন, আবার নিজেকে নিজে প্রকাশ করছেন। সামগ্রিক ভাবে এতো চলছেই।

এতৎসত্ত্বেও প্রচ্ছন্নতার আবরণ সরিয়ে পরমাত্মবস্তু নিজেকে অবতরণের মাধ্যমে কখনো স্বরূপ প্রকাশের লীলায় জোয়ার আনেন। সেই বিশেষ প্রকাশের লীলার একটা প্রান্ত হচ্ছে তাঁর নিজের অবতরণের মধ্যে, আর একটা প্রান্ত জগতের মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে। মধ্য স্থান ব্যাপ্ত করে, লীলা বিগ্রহের চারপাশে থাকেন তাঁর অন্তরঙ্গ জনেরা, যুগে যুগে যাদের আসা-যাওয়া, লীলা আস্বাদনের জন্য, লীলা বিস্তারের জন্য। সারদা মা, রামকৃষ্ণ লীলায় তাঁর জয়া-বিজয়া, গোলাপ-যোগীনের নাম করেছেন। গোলাপ মা, যোগীন মা এক হিসাবে ব্যক্তি সত্তা আবার এক হিসাবে শক্তি বিশেষ। তাঁরা জয়া, বিজয়া, অজিতা, অপরাজিতা প্রমুখ আদ্যাশক্তি মায়ের অষ্ট সখী-বিশেষের বা অলখ শক্তি-বিশেষের দুটো রূপ আশ্রয় করেছিলেন। অষ্টসখী এক হিসাবে সখী বলছি আবার আটটি অন্তরঙ্গ শক্তির প্রকাশগত দিক যা সম্মিলিত ভাবে যুগে যুগে রূপে রূপে কাজ করছে। কখনো কোন শুদ্ধ আশ্রয়ে রূপ ধারণ করে। যেমন গোলাপ মা শেষ দিকে বলেছিলেন—দেখলাম—গৈরিক বসনা এক সন্ন্যাসিনী হাতে ত্রিশূল। শুনে সারদানন্দ বললেন—'উনি আর দেহে থাকবেন না'। মানে, চিরায়ত সত্তায় বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। প্রকট লীলার অবসান হয়ে এলেও নিত্যলীলায়, নিত্যরূপে, নিত্যকাল প্রবহমান।

শাস্ত্রে অন্তরঙ্গা আটটা শক্তি বলছে। এই আটটা শক্তির অধস্তন বিলাসে আরও শক্তি আছে। শক্তি যখন বলছি, তখন তার বিকাশের ধারা তো থাকবেই। যখন বলছে 'বিদ্যাবিদ্যে মম তনু', চণ্ডীতেও সৎ-অসৎ সর্ববস্তুর মূলীভূত এক পরমা শক্তির কথা বলে গিয়েছেন। পরম সত্তা নিজেকে বিলীন করছেন বিভিন্ন পর্যায়ে, আবার পরম সত্তা নিজেকে প্রকাশ করছেন, সাধক নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে স্তরে স্তরে বিভিন্ন লীলা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে। এই অর্থেই লীলা। শ্রীরামকৃষ্ণ তো বিদ্যাশক্তির কথা বলেছেন। তার চরম দিক হচ্ছে স্বরূপতা। এই হচ্ছে অষ্টসখীর কাজ। মুখ্যা যে প্রকাশাত্মক শক্তি, তাকে ঘিরে ক্রিয়াশীল শক্তিগুলো, তার প্রধান আটটা দিক ধরা হয়েছে। ভবতারিণী মায়ের যে নবদেউল মন্দির তার মূলেও এই ভাবনা।

এ যোগিনীশক্তি। ডাকিনী আবরণাত্মক দিক, আর যোগীনী যখন বলছ তখন প্রকাশাত্মিকা বিদ্যাশক্তির দিক ধরেই নিতে হবে। মনে কর, তুমি তো কালীঘাটে যাও—মূলাশক্তিকে ঘিরে অষ্টসখী ক্রিয়াশীল আছে। যখন স্রোত উর্ধ্বগামী হচ্ছে, সেখানে শক্তির আবর্ত হচ্ছে। আবার আবর্তের মধ্যে আটটা দিক আছে, প্রকার আছে, প্রকরণ আছে,—এই ভাবে বলা যেতে পারে। সবই মূলীভূত একটা শক্তিকে ঘিরে আবর্তিত বা ক্রিয়াশীল হচ্ছে। আবার চরমে তা এক পরমা শক্তিতেই বিলীন বা বিশ্রান্তি লাভ করছে।

নরেনের দেহে ঠাকুর

কাশীপুর বাগানে ঠাকুর এক দৃষ্টিতে নরেন্দ্রের দিকে তাকালেন, তাঁর ভেতরের শক্তি নরেন্দ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করলেন। বললেন, 'আজ সব তোকে দিয়ে ফকির হলাম'।

একটা আমি আছে, আমিটা রামকৃষ্ণ, স্বয়ং অবতার। যা দিলেন, তা কি? সাধনার ফল। কিছু বাকি রাখলেন কি? না, নিঃশেষে দিলেন। নিঃশেষে দেওয়া—নিজেকে দেওয়া। যে সত্তা অবতীর্ণ হয়েছে সেই সত্তাটুকু দেওয়া। স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত 'শ্রীমা সারদাদেবী' বইতে আছে—সারদা মা তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে তা দেখেছিলেন, বললেন—'দেখলাম, ঠাকুর নরেনের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।' ঠাকুর নরেনের দেহে মিলিয়ে গেলেন, এটা কাশীপুরের পরের কথা।

নরেন্দ্র বললেন, এ কথাটা আমাকে বলা ঠিক হয়নি। মনে করেছিলেন হয়ত, মানুষ এই গভীর তত্ত্ব নিতে পারবে না। ঠাকুর স্বয়ং অবতার। যে হুকুমতে বা শক্তি নিয়ে অবতরণ করলেন, সেটা অবতরণের শক্তি। একটা সাধনার ফল সমর্পণ করা, আর একটা যে শক্তিতে অবতীর্ণ হচ্ছেন সেই সত্তার প্রবেশ বা প্রতিষ্ঠা। অবতরণের শক্তি উচ্চতর এবং ব্যাপকতর যুগ পরিবর্তনকারী শক্তি, যা মাত্র পূর্ণ অবতার পুরুষরাই নিয়ে আসেন।

মায়ের মাতৃত্ব

শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে জনৈকা স্ত্রীলোকের বাঞ্ছা-পূরণ প্রসঙ্গে দেখি—কোন এক দুর্ভাগা নারী তার মুক্তির জন্য ঠাকুরের কাছে এসেছে। ঠাকুর বলছেন, 'নবতে যাও, সেখানে যিনি আছেন, সে আমার থেকেও বড়, তিনিই তোমাকে শান্তি দেবেন'। সেই মহিলা মায়ের কাছে এল, এসে ঠাকুর যা বললেন তাই বললেন মা-কে। মা বললেন, 'উনিই বড়, উনিই পারবেন, ওঁনার কাছেই যাও'। বারবার সেই মহিলাটি একবার ঠাকুরের কাছে, আর একবার মায়ের কাছে আসতে আসতে নিতান্ত নিরাশ্রয় বোধ করতে লাগল। অবশেষে মায়ের অন্তরে দয়া হ'ল, মা তাকে নিজে একটা কিছু দিলেন, এবং তার মুশকিল আসান হ'ল।

কেন এই দুর্ভাগ্য পীড়িত নারীর সঙ্গে ঠাকুর এবং মা এভাবে ব্যবহার করেছেন? কোন না কোন উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যটা কি হতে পারে? ঠাকুর, মায়ের স্বরূপ জগতের কাছে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। দেখ, তিনি কত শক্তিময়ী। এটা একটা হতে পারে। আর একটা হতে পারে, প্রারম্ভিক এই অবহেলা তার অন্তর্নিহিত শরণাগতির ভাবটিকে আরও বাড়িয়ে তুলল। অন্য একটা কথা হতে পারে এই, একটা অসহায়, দুর্ভাগ্যপীড়িত নারীকে ঠাকুর বারবার ফেরাচ্ছেন। আগামী দিনে যে মায়ের বিশ্ব মাতৃত্ব, তাকে আঘাত করে করে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। সেটাই হতে পারে। মায়ের মধ্যে যে মাতৃত্ব লুকিয়ে আছে, যা আগামী কালে প্রকাশ হবে। বারবার মেয়েটি আসছে, বারবার কাতর ক্রন্দনের মধ্যে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে সংকোচের আবরণ ঝরে যাচ্ছে, প্রকাশিত হচ্ছে কল্যাণী মাতৃমূর্তি।

হনুমানের কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর নিজের আস্বাদনের কথাই যেন বলছেন। 'হে রাম, কখনও দেখি তুমি প্রভু আমি দাস, কখনও দেখি তুমি পূর্ণ আমি অংশ। আবার কখনো তুমিই আমি, আমিই তুমি'।

প্রথম কথার মধ্যে দিয়ে দ্বৈত তত্ত্বের কথা বলেছেন, 'তুমি প্রভু আমি দাস', দ্বৈত ভাব।

রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলছে,—জীব-কোটি একটা অংশ, তিনি পূর্ণ, জীব অংশ বটে। এখানে শক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। রামানুজের বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের কাছাকাছি, খানিকটা অচিন্ত্য ভেদাভেদ-এর প্রতিষ্ঠা হয়। এই যে 'তুমি পূর্ণ আমি অংশ', এটা ভাব সমাধির অবস্থায়। 'তুমি প্রভু আমি দাস', সাধারণ অবস্থা। নির্বিকল্প সমাধিস্থ অবস্থায় অদ্বৈত। অভেদ। কোন সত্য বা কোন অবস্থাকে অস্বীকার করছেন না। অনুভূতিলব্ধ সত্যের ভিত্তিতে তিনটি আস্বাদনই সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। যেখানে তিনটিকে স্বীকার করে নিয়েছেন, সেখানে হিন্দু ধর্মের সামগ্রিকতা।

এই তিনটি মিলে রামকৃষ্ণ দর্শন সম্পূর্ণ হ'ল। সুতরাং, যখন অদ্বৈতের কথা বলছেন, তখন এমন একটা অদ্বৈতের কথা বলছেন, যেখানে বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতেরও স্বীকৃতি আছে। এখানেই রামকৃষ্ণ ভাবের ব্যাপকতা বা বৈচিত্র। তিনি যে সর্বজনগ্রাহ্য ও বিশ্বময় হয়েছেন, তা এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে।

যখন দ্বৈত আর বিশিষ্টাদ্বৈতকে স্বীকার করে অদ্বৈতকে স্বীকার করছে, তখন অদ্বৈতের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। কেননা সেখানে অদ্বৈত হ'ল শাক্তাদ্বৈত। যা রামকৃষ্ণের উপদেশগুলির সঙ্গে সঠিক ভাবে মিলে যায়। কিন্তু যখন মায়াবাদকে স্বীকার করে অদ্বৈতকে স্বীকার করছে, তার বিশেষ তাৎপর্য নেই। কেননা সেখানে দ্বৈত আর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কোন স্থান নেই। এমনকি স্বামীজী যেখানে বলেছেন নিম্নতম সত্য, তখনো একটা সত্য আছেই। কিন্তু মায়াবাদী দর্শনে কোন নিম্নতম সত্য নেই, একেবারে মিথ্যে। এখানেই মায়াবাদী অদ্বৈত দর্শন ঠাকুরের উপদেশ ধারণ করতে বা সামঞ্জস্য করতে পারে না।

অদ্বৈতবাদ থেকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতবাদ। একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য পেয়েছে। তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে কি? নাথ দর্শনে বা শাক্তাদ্বৈত দর্শনে এর স্বীকৃতি আছে। অদ্বৈততত্ত্বকে চরম তত্ত্ব স্বীকার করে জীব-জগৎকে কোন না কোন ভাবে পরিণামবাদ স্বীকার করে গিয়েছেন। 'সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি' ধৃত যোগীশ্বর গোরক্ষনাথজীর বাণী—

'অলুপ্তশক্তিমান্ নিত্যং সর্বাকারতয়া স্ফুরণ্।
পুনঃ স্বৈনৈব রূপেন এক এবাবশিষ্যতে।।'

এবং অবধূত গীতা ধৃত—

অদ্বৈতং কোচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
সমং তত্ত্বং ন বিন্দতি দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণম্।।'

স্বামীজীও যখন বেলুড়মঠে ব্রহ্মচারীদের ক্লাস নিচ্ছেন, তখন বলেছেন—শংকর একভাবে, একদিক থেকে ব্যাখ্যা করেছে, তোরা নিরপেক্ষ ভাবে বোঝার চেষ্টা করবি। 'স্মৃতির আলোয় স্বামীজী' বইতে স্বামী শুদ্ধানন্দজী শুনিয়েছেন স্বামীজীর বাণী—ব্রহ্মসূত্রের

'অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি', এই সূত্রের ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা আমার মনে হয় যে, এতে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত—উভয় বাদই ভগবান বেদব্যাস কর্তৃক সূচিত হয়েছে"। আবার তিনি স্পিনোজাকে খুব উঁচু স্থান দিয়েছেন।

এগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনকেই স্বীকৃতি দিচ্ছে, বিশ্লেষণ করছে। প্রসঙ্গত চৈতন্যদেবের কথায় ঠাকুর এই কথাই বলেছেন। তিনটি অবস্থা হতো—১. বাহ্যদশা-স্থূল আর সূক্ষ্মে মন থাকত। ২. অর্ধবাহ্যদশা—কারণ শরীরে, কারণানন্দে মন গিয়েছে। ৩. অন্তর্দশা—মহাকারণে মন গিয়েছে। বাহ্যদশায় নাম-সংকীর্তন করতেন, অর্ধবাহ্য দশায় ভক্ত সঙ্গে নৃত্য করতেন, অন্তর্দশায় সমাধিস্থ হতেন।

তিনটি অবস্থার কথা বলেছেন, বাহ্যদশা, অর্ধবাহ্যদশা, অন্তর্দশা। আর কোথাও নেই এই বিশ্লেষণ। এ সামঞ্জস্যপূর্ণ যোগতত্ত্বের বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ প্রচলিত গোঁড়াদের খারাপ লাগবে।

চৈতন্যদেব সম্বন্ধে যে দুটো কথা ঠাকুর বলেছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আবার বলেছেন, চৈতন্যদেব শক্তির উপাসনা করেছিলেন। এটা পড়ে অনেক চিন্তা করেছি, অনেকদিন মেনে নিতে পারিনি, এসব হতে পারে না।

একদিন গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে এই চিন্তা করছি, চৌধুরী মহারাজ বহু দিন মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গ করেছেন, অনেক কিছু শুনেছেন, এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। মহারাজ, একটা কথা আছে। কি কথা? বললাম, কথামৃতের এই লাইনটা বুঝতে পারছি না। বললেন, 'আমিও মাস্টারমশাইকে এই কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন—'তিনি যে হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ করেছেন, সেটাই তো শক্তির সাধনা'। রাধা ভাবের কথা। তিনি যে রাধা ভাবে বিভোর হয়ে হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ করেছেন, এটাই তো রাধাতন্ত্রের কথা। শক্তির ভাবে শক্তিমানের উপাসনা'। তখন মনে পড়ল কথামৃতে ঠাকুর বলছেন ☆ 'শক্তিলীলাতেই অবতার'। (কথামৃত. ৯. ৯. ৮৩)

কাম

কথামৃত, তৃতীয় ভাগে পড়া হ'ল—কাম-ক্রোধের আকারমাত্র থাকে। অনেক জায়গায়ই আছে—দেহ ধারণ করলে কাম-ক্রোধ একটু একটু থাকে। আর প্রেমানন্দজী বলছেন—আমি জানিনা এসব কি জিনিস। আবার স্বামীজী তো বিদেশে ওখানকার মানুষদের সঙ্গে সহজ ভাবেই মিশেছেন। এ দেশেও মিশেছেন—কাশ্মীরে থেকেছেন। আবার নিউইয়র্কে স্বামীজী বার বার আরশিতে নিজেকে দেখতে লাগলেন। ওয়ালডো অনেক সময় থাকতেন স্বামীজীর কাছাকাছি, তিনি ভাবছেন—এই বার বুঝি অহংকারের বুদবুদটা ফাটল। স্বামীজী তখন তার দিকে ফিরে বলছেন, 'আসলে আমাকে দেখতে কেমন মনে রাখতে পারছি না, আমার চেহারাটা ঠিক মনে রাখতে পারছি না'। তাহলে, কথামৃতের এসব রবিবারের কথা আর ঠাকুরের কিছু সন্তানদের কথা কি এক হ'ল? ঠাকুর বলেছেন—সকালের ফোটা মল্লিকা ফুল, সূর্যোদয়ের আগে তোলা মাখন ইত্যাদি। এসব কথা শুধু কুমার বৈরাগ্য বা জীবনধারা-গত নয়। একান্তই আন্তরিক অবস্থা বা আকর সাপেক্ষ। ঠাকুরের কথায় হোমা পাখীর দল, এই পৃথিবীর ধুলো কোন দিনই যাদের স্পর্শ করেনি।

তিনটে অবস্থা। একটা সকাম—মানুষ যতক্ষণ কামের মধ্যে আছে। আর একটা—মানুষ সাধনার মধ্যে দিয়ে কামজিৎ হয়, নিষ্কাম অবস্থা পায়। এদের পোড়া দড়ি-দড়ির আকার মাত্র কিছু না কিছু, সামান্যমাত্র থাকে, কিন্তু এর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে। জিৎ বলে না? ফুটবল খেলায় এক পক্ষের জয় হ'ল। আর এক পক্ষ কি উধাও হয়ে গেল? না। এরা প্রাধান্য লাভ করল। কিন্তু অপর পক্ষ আছে, সেটা নিষ্প্রভ হয়ে আছে। আর একটা আছে—যেটা প্রেমানন্দজীর অবস্থা, স্বামীজীর অবস্থা বললাম। প্রেমানন্দজী জানেন না কি জিনিস। স্বামীজী জেনেছিলেন অল্প কয়েক দিনের জন্য। মাস্টারমশাই বলছেন—জগৎ সম্বন্ধে ধারণার জন্য।

যিনি পার হয়েছেন, চিরদিনের মত কর্তৃত্ব লাভ করেছেন, সেটা হচ্ছে 'নিষ্কাম অবস্থা'। আর যেখানে জয়-পরাজয়ের প্রশ্নই নেই, এই বোধের অতীত হয়ে সহজ জীবন লাভ করেছেন—নাথ দর্শন মতে তাঁদের বলা হয় 'পূর্ণকাম'। তিনটে পরপর। সাধারণ মানুষ সকাম। আর যারা জৈব জীবনের উপর স্থায়ী কর্তৃত্ব লাভ করল, সাধনা ক'রে সিদ্ধ হ'ল, তারা হ'ল নিষ্কাম। আর, যারা এই দুটো বোধ থেকেই আত্যন্তিক মুক্ত, তারা পূর্ণকাম। এই শিবজী, কৃষ্ণচন্দ্রকে বলা হয় পূর্ণকাম। দু-চার জন হোমা পাখী যদি একালেও না পেতাম, তাহলে ওঁনারা তো ছবি হয়ে থাকতেন।

এই আত্যন্তিক পার হতে না পারলে নাথ দর্শনোক্ত সহজ-জীবনের মধ্যে প্রবিষ্ট হতে পারবে না। যতক্ষণ দুটোর বোধ আছে, ততক্ষণ তার জীবন কিছুটা বিধিনিষেধের মধ্যে থাকেই। কিন্তু যিনি সহজ-অবস্থা পেয়েছেন, তাঁর সম্বন্ধে গোরক্ষনাথজী বলেছেন—'স্বেচ্ছাচারী স্বয়ং কর্তা ভ্রমতি ভৈরব যথা'। ভৈরব হচ্ছে শিব। স্বামীজী সম্বন্ধে দেখেছেন তো, তাঁর তো কোন বিধিনিষেধের প্রশ্নই ছিল না। এই পূর্ণকাম অবস্থা। এই সৃষ্টিতে খুব বিরল অবস্থা, কিন্তু তা বলে নেই, তা নয়। ওঁনারা একাধারে পূর্ণ পুরুষ, পূর্ণ নারী। প্রেমানন্দজী যখন বৃন্দাবনে ঘুরছেন, তখন বলে বৃন্দাবনের গোপিনীরা বলত—'লালী, আপ হি লালী কা মাফিক হ্যায়'। তাঁর মধ্যে রাধারানীকেই দেখছে তারা। তিনি একাধারে পূর্ণ পুরুষ, পূর্ণ নারী, সব। অর্ধ-নারীশ্বর, অচিন্ত্য অবস্থা। ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব।

ফলহারিনী কালী পুজো

ফলহারিনী কালী পুজো। মা কালী চিরকাল মাছ, মাংসের ভক্ত। কিন্তু এই সময় এত ভালো ভালো আম ওঠে, সব কেষ্টকে দিচ্ছে। রাতারাতি মা বলছেন—আমি ফলহারিনী। ভোল পাল্টে দিল ফস্ করে, লোভ সামলাতে পারল না। পাঁঠা খেয়ে খেয়ে হদ্দ হয়ে গেছে তো। রসাল ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে আম। খেতে খেতে ভাবছেন—ওঃ, এই জিনিস শুধু গোবিন্দ খাচ্ছে। সারা দিন আম খেয়ে খেয়ে পেটে একটুও জায়গা নেই, তবুও একটা পেয়ারাফুলি মেরে দিল।

কালকে ঘুমব কি, পাড়ায় সারা রাত কাঁসর-ঘন্টা বেজেছে, শাঁখ বেজেছে, ঢাকের গুড়গুড়। আবার ভোর রাত্রে ভাসান দিয়েছে মায়ের মূর্তি। চারিদিকে রক্ষাকালী পুজো হয়েছে। কি যে লাগছিল। নিশীথ রাত। গোটা রাত ভেসে গেছে। যেন মায়ের ভাবে বিভোর।

এই তিথিতে ঠাকুর মাকে পুজো করেছিলেন। ফলহারিনী কালী পুজোর দিনই ঠাকুর মাকে জগদম্বা, জগদীশ্বরী, ত্রিপুরাসুন্দরী রূপে পুজো করেছিলেন—বিধিপূর্বক যেভাবে কুমারী পুজো হয়, সেই ভাবে। মা তো অনাঘ্রাতা, সেইজন্য মা চিরকুমারী। আবার তিনি চির সতী। আবার তিনি জগজ্জননী। সব কিছু তাঁর মধ্যে পূর্ণ হয়েছে। আদ্যাশক্তির পূর্ণ প্রকাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাকে বিধি পূর্বক পুজো করে সমর্পণ স্বরূপ নিজের জপের মালাটা অর্পণ করেছিলেন। মা কে ছিলেন যে ঠাকুরের পুজো গ্রহণ করতে পেরেছিলেন? সাক্ষাৎ জগজ্জননী ছিলেন, তাই ঠাকুরের পুজো গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুর মায়ের কাছে তাঁর সমস্ত সাধনার ফল গচ্ছিত রেখেছিলেন। তিনি তো পরমাশক্তি, মানুষের পরম জ্ঞান-দায়িনী শক্তি। মানুষ যখন মুক্তির জন্য সাধনা করে, তখন এই বিদ্যাশক্তির আশ্রয় নিয়েই সাধনা করে। মায়ের দুটো শক্তি। 'বিদ্যাবিদ্যে মম তনু'। একটা প্রবৃত্তি পরায়ণ ডাকিনি শক্তি, আর একটা মুক্তিদায়িনী শক্তি, বিদ্যাশক্তি, বিদ্যাদায়িনী শক্তি।

সমস্ত সাধনাই বিদ্যাশক্তির এলাকা। মানুষের মনে যে সদ্‌ভাব, তপস্যার ভাব জেগে উঠছে, সমস্তই বিদ্যাশক্তির দান। এক ভাবে তিনি বদ্ধ করছেন, আর এক ভাবে তিনি মুক্ত করছেন। ঠাকুর মাকে চেনালেন—তিনি পরমা প্রকৃতি, মানুষকে মুক্তি দিতে এসেছেন, তাঁর কাছ থেকেই মানুষ মুক্তির পাথেয় সংগ্রহ করে, করবে। ঠাকুরকে, সারদা মাকে চিন্তা করে মানুষ যুগে যুগে মুক্ত হবে, দিব্য জীবন পাবে, তার সহায়ক শক্তি ঠাকুর, মায়ের কাছে সঞ্চিত করে রেখে গেলেন। ঠাকুরের, মায়ের কৃপা-জড়িত তপস্যার ফল জীব তার মুক্তির জন্য পেয়ে যাবে। আর, ওঁনাদের মহা তপস্যা তো জীবের মুক্তির জন্য।

ভগবান যখন আসেন, ঈশ্বরকল্প মহাপুরুষরা যখন আসেন, তাঁদের সমস্ত সাধনার ফল সঞ্চিত থাকে আদ্যাশক্তি মায়ের কাছে। তাঁর কাছ থেকেই সাধকরা যুগে যুগে সংগ্রহ করে তাদের সাধনার পাথেয়। এটা চিরন্তন। ঠাকুর এটাকে প্রকাশ করলেন, বাহ্যিক ভাবে তাকে একটা রূপ দিলেন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আর এটা সম্ভব হ'ল মা স্বয়ং উপস্থিত আছেন বলেই। আমরা জানতে পারলাম মায়ের স্বরূপ।

বৃন্দাবনে একবার রাধা-কৃষ্ণ পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হয়েছিলেন। আলিঙ্গনবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একাকার, এক তনু হয়ে যাচ্ছেন। এমন সময় সখীরা বলছে—না, এরকম হলে হবে না, এখনও লীলা শেষের সময় হয়নি, আবার দুই তনু হোক। চৈতন্য চরিতামৃতে আছে—

"রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥"

বস্তুত পরম তত্ত্বের দিক থেকে একই লীলায় দু ভাবে প্রকাশ হচ্ছে। তিনি যে পরম শিব-স্বরূপ আর মা যে পরমা প্রকৃতি। শিব আর পার্বতী দুজনেই তত্ত্ব স্বরূপে এক ছিলেন। মায়ের পদপ্রান্তে বইতে মা নিজে বলেছেন—ঠাকুর অখণ্ড চৈতন্য স্বরূপ। তন্ত্রশাস্ত্রের ক্রম ধরে ঠাকুর ফলহারিনী কালীপুজো করেছিলেন। পুজো অন্তে দুজনেই গভীর সমাধিতে মগ্ন হলেন। চেতনায় একাকার। নিখিল বিশ্ব-প্রপঞ্চ বিলীন হ'ল। রইল শুধু চেতনার

সমুদ্র। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপে একাকার। কিছু পরে আবার নেমে এলেন দ্বৈত ভূমিকায়। এক ছিলেন, লীলায় হলেন দুই। ঠাকুর মাকে প্রণাম করলেন। এখানেই তন্ত্র তত্ত্ব লীলা তত্ত্বকে অতিক্রম করে গেছে। 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর' সব একাকার। তত্ত্ব স্বরূপে যেমন সৃষ্টি লীন হয়ে যায়, তেমনি ঠাকুর আর মায়ের বাহ্য চেতনায় সৃষ্টি লীন হয়ে গেছে। দুজনেই দিব্য চেতনায় একীভূত, একাকার। এখানেই সৃষ্টি লয়। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন—'আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন।' এই হচ্ছে পরম তত্ত্বের রমণ। এ আস্বাদন একাকার, একীভূত হওয়া শক্তি আর শক্তিমান, পরম পুরুষ আর পরমা প্রকৃতি। সমস্ত লীলা সেখানে স্তব্ধ। আবার করুণা পরবশ হয়ে দ্বৈত ভূমিকায় দিব্য তনুতে এই পৃথিবীতে মহতি লীলা প্রকাশ করার জন্য অবতীর্ণ হলেন। 'আদি অন্তহীন অখণ্ডে বিলীন, কৃপায় ধরিলে মানব কায়।'

ফলহারিনী কালীপুজোর চিরায়ত তাৎপর্য, ঠাকুর মাকে পুজো করার শত শত বৎসর আগে থেকেই। একটা গাছকে চিন্তা কর, তার থেকে চারা, ফুল, সর্বশেষ দান ফল। কোন গাছ বিষ ফল দেয়, কোন গাছ অমৃত ফল দেয়। মানব জীবন যেন একটা গাছ। এতে বিষ ফল ফলতে পারে আবার অমৃত ফল। অমৃত ফলে নিজের সফলতা আবার সমাজকে ধন্য করতে পারে। আবার অসৎ কর্মজাত বা বাসনা-কামনা কলুষিত ফল যদি হয় তবে তা ভগবানের ভোগে লাগে না, কাকে ঠোকরানো। এছাড়া একটা অমৃত ফল ফলতে পারে। ঠাকুর বলছেন—ভক্তি কামনা কামনার মধ্যে নয়। এই জীবনে ভগবানের ভক্তি-রূপ ফল ফলবে। তাই দিয়ে হবে আমার মায়ের ফলহারিনী কালীপুজো। মা আমার তাই খেতে ভালোবাসেন। রসাল কিনা। যে কোনরকম কাজ, সে সৎকাজ বা অসৎ কাজ, যা ভগবানকে লাভ করার পথে বাধা হয়, যা জড়ায়, তিনি যেন গ্রাস করেন। সমস্ত কর্মফল তিনি যেন খেয়ে ফেলেন, একমাত্র তাঁকে পাওয়ার বাসনাই যেন আমার মধ্যে জেগে ওঠে, স্থির হয়ে জেগে থাকে। কৃপায় আমাদের সমস্ত কর্মফল গ্রাস করেন, তাঁর চরণে আশ্রয় দেন, তাই তিনি ফলহারিনী।

জগদ্ধাত্রী

জগদ্ধাত্রী ঠাকুরকে বলা হয় ব্রহ্মময়ী। আমাদের ৩৩ কোটি দেব-দেবী আছে। যে সমস্ত দেব-দেবীর মধ্যে ব্রহ্মের রূপ ভাবনা বিশেষ ভাবে প্রকাশ হয়েছে, তার মধ্যে জগদ্ধাত্রী অন্যতম। যেমন কালী, শিব। দেখা যায় হাতির মাথায় পা দিয়ে সিংহ, সিংহের পিঠে মা বসে আছেন। এই হাতি মনের প্রতীক। হাতি হচ্ছে মহা শক্তিমান, বড় বড় গাছকে সে ভেঙে ফেলতে পারে, বাড়ি ঘরদোর ভেঙে চুরমার করে, মাটিতে মিশিয়ে দেয়। এই হাতিকে যখন মানুষ বশ করে, তখন সে মানুষের বহু কাজে লাগে। এমন কাজে লাগে যা অনেক মানুষ পারবে না। যেমন—দুর্গম বন থেকে বড় বড় গুঁড়ি তুলে আনা। যে শক্তি বিপুল ভাবে ধ্বংসের মধ্যে নেমে আসতে পারে, সেই হাতিকে বশ করলে মানুষের মঙ্গলের সহায় হয়। তেমনি আমাদের মন রজঃ-তমসাবৃত হয়ে আছে, বন্য হয়ে আছে, তাই নিজেকে ঘিরে ঘিরে প্রতি মুহূর্তে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি। এই মন যে বশীভূত করতে পেরেছে,

তার তপস্যায় ও ঈশ্বরের কৃপায়, সেই মন তার সহায়, মহা-মঙ্গলের কারণ। এইজন্য আমাদের শাস্ত্রে হাতিকে মনের সঙ্গে তুলনা করেছে। এই মনঃশক্তি যখন বশীভূত হয়, তখনই মায়ের আসন তার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা হয় সিংহাসন। পশুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সিংহ। আসনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন—সিংহাসন। মনে রাখতে হবে, সিংহের সামনের পা-টা হাতির মাথায় থাকবে। তাহলে, যে যোগী মনকে বশীভূত করেছে, তার অন্তরে মায়ের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর, যেখানে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে ভক্তের ভক্তিতে, করুণার শক্তিতে সিংহবাহিনী মা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

এরপর দেখা যায় তাঁর এক পা নিচে ঝোলান, আর এক পা সারদা মায়ের কথায়—'পায়ের উপর পা ঠেস দিয়ে লালমুখো মা'। গ্রামের ভাষা। তিনি গুণাতীত, নির্বিশেষ, অব্যক্ত, অধরা, অচিন্তনীয়া। আবার তিনি সগুণা, সবিশেষ, করুণাময়ী। তিনি এক পা প্রসারিত করেছেন ভক্তদের কল্যাণের জন্য—বিচিত্র ভাবে বিচিত্র রূপে। এই জগতে তাঁর বিলাস চলছে, সমস্ত মঙ্গলময় ভাবে-রূপে। বারে বারে তিনি ধরা দিচ্ছেন এই সবিশেষ রূপ প্রসারিত করে। আমরা প্রণাম করি—

"সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

গুণময়ী সেখানে, যেখানে তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ করছেন। আর যেখানে তিনি গুণের আধার, সেখানে অধরা, অচিন্তনীয়া। দিব্য লীলায় এক পা প্রসারিত করেছেন, তাঁর সন্তানকে আকর্ষণ করছেন—আমার চরণ আশ্রয় কর। আর এক পা পরম তত্ত্বের আভাস হয়ে আছে। 'পায়ের উপর পা ঠেস দিয়ে আছেন'। এই পা আশ্রয় করেই, মায়ের করুণায় সেই পা পেয়ে যাব, মাতৃতত্ত্ব-তথা আত্মতত্ত্ব পেয়ে যাব। এই ঠেস দিয়ে বসার আর একটি ভাব, তিনি সুপ্রতিষ্ঠিতা, স্বপ্রতিষ্ঠিতা হয়ে আছেন।

লাল রঙ হচ্ছে রজোগুণের প্রতীক। আমরা লাল রঙ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করি, তাহলে মায়ের লাল রঙ কেন? চণ্ডীতে আছে, মা তো কাঞ্চনবর্ণা, কোন জায়গায় অতসী পুষ্পবর্ণা, হলুদ। কিন্তু মা যখন মহিষাসুরকে বধ করতে যাচ্ছিলেন, তিনি করুণায় আরও বেশি ক্রিয়াশীলা হচ্ছেন, স্পন্দিতা হচ্ছেন। এই করুণার জন্য দিব্য রজোগুণের প্রকাশ। তাই চণ্ডীতে মা বলছেন, 'ততক্ষণ তুমি আস্ফালন কর, যতক্ষণ আমি মধু পান করি'। মধু পান কেন করছেন? আমাদের মহাজনেরা বলেন, মা অশেষ করুণায় আরও ক্রিয়াশীলা হচ্ছেন। 'চিত্তে কৃপা, সমরনিষ্ঠুরতা চ'। মা ব্রহ্মানন্দময়ী, তিনি এই দিব্য রজোগুণকে আহ্বান করছেন, তিনি তাঁর করুণায় আরও সক্রিয়া হয়ে মহিষাসুরকে বধ করবেন বলে। তার দানব জীবন অবসানের জন্য, তার দিব্য-জীবনকে প্রকাশ করার জন্য। আর সঙ্গে সঙ্গে মায়ের অতসী-পুষ্পবর্ণা তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণা হল। কাঞ্চনকে যদি উত্তপ্ত করা যায়, তাহলে বাল-সূর্যের লালের মত আভাস আসবে। লোহা পর্যন্ত গরম করলে লাল হয়, আর সোনা উত্তপ্ত করলে না জানি কত সুন্দর। লাল রঙের মধ্যে তার স্বর্ণ আভা কতখানি থাকে। মায়ের প্রকাশ নিশ্চয় তার থেকেও অনেক সুন্দর। এই যে দেখে এলে সপ্তমীতে হলুদ কাপড় দিয়েছে, আর অষ্টমী-নবমীতে লাল কাপড় দিয়ে পুজো হল, তিনি তাঁর কার্য সমাধা করলেন, ভক্তদের কৃপা বিতরণ করলেন।

এখন, মা যখন ব্রহ্মময়ী, তাঁর সর্প উপবীত। তিনি ব্রহ্মানন্দময়ী, তিনি ব্রহ্মানন্দদায়িনী। সর্প উপবীত জাগ্রত ব্রহ্ম-চেতনার প্রতীক। এই যোগ ভাবনাতেই মাকে সর্ব জীবের প্রাণশক্তিভূত 'আধার রূপে' এবং সিদ্ধ-যোগী-জনগণের 'অমেয়ভাব কূটস্থে' বলা হয়েছে।

এরপর, মায়ের উপরের দু হাতে দেখা যায় সুদর্শন চক্র, আর একটা শঙ্খ। সুদর্শন চক্র—বলা হয় শত্রু বিনাশ করেন। শত্রু তো সবতাতেই আছে—ভেতরে আছে, বাইরেও আছে। সুতরাং, চক্র যা দিয়ে তিনি সন্তানের মোহপাশ ছিন্ন করছেন। আর শঙ্খ—বলা হয় মঙ্গলশঙ্খ, জগতের মঙ্গল বিধান করেন। আর একটা মানেও আছে,—শঙ্খধ্বনি নাদ-ব্রহ্মের প্রতীক। যে সাধক মায়ের কৃপা পাবে, সে শব্দব্যূহ ভেদ করে ঈশ্বর তত্ত্বে প্রবিষ্ট হবে। উভয় অর্থেই মঙ্গল তো বটেই। মঙ্গল আর পরম মঙ্গল। আর দু হাতে দেখা যায় ধনুর্বাণ। ধনুর্বাণ—আমাদের শাস্ত্রাদিতে বিশেষ তাৎপর্য করা হয়েছে। মুণ্ডক উপনিষদে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে—

'প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ।।'

প্রণব—ওঁকার হচ্ছে ধনু, শর হচ্ছে জীবাত্মা, আর ব্রহ্ম-পরব্রহ্ম হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য, যা ভেদ করতে হবে। শরের মতো একমুখী একাগ্রতা নিয়ে সঠিক ভাবে আমাদের লক্ষ্যভেদ করতে হবে। বিশুদ্ধ প্রণব এবং অন্যান্য সিদ্ধ মন্ত্রের প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে, তপস্যার মধ্যে দিয়ে আত্মা লগ্ন হয় তার লক্ষ্যবস্তুতে। এই উপনিষদের মন্ত্র, আর যে ব্রহ্মময়ী দেবীকে আমরা উপাসনা করি, তিনি তাঁর করুণা-কটাক্ষে আমাদের সাধন সফল করবেন। তাঁর হাতে আমরা দেখি এই ধনুর্বান, যা আমাদের জীবনের সমস্ত অভীপ্সার প্রতীক।

এখন, কোন কোন যুগে কোন দেব-দেবী বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। সত্যযুগে যেমন নারায়ণ, বলা হয় গঙ্গাবতরণ, সত্যযুগাদ্যা, তেমনি ত্রেতায় ত্রাণ, মানুষ যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পায়। ত্রেতাযুগাদ্যা জগদ্ধাত্রীকে বলা হয়। তিনি আমাদের ত্রাণ করবেন এই কলুষতা, আবিলতা থেকে। যেমন নররূপী লীলায় ত্রেতা যুগাদ্যা শ্রীরামচন্দ্র ত্রাণ করেছিলেন, সর্ব মানবকে। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের বিশেষ ভাব-সামঞ্জস্য আছে। রাম যেমন রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর, ইদানীং কালে আমরা একটা অর্থবহ ঘটনা দেখি—আমাদের দক্ষিণেশ্বরে নবযুগাদ্যা যে লীলা হল, তাতে মা সারদা এই জগদ্ধাত্রী পুজো প্রচলন করেছেন নতুন করে। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর লীলার মধ্যে দিয়ে শ্রীরামের ভাব প্রতিষ্ঠিত করেছেন বারবার। তিনি অন্যান্য ভাবের চেয়ে এই ভাবকে অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য দিয়েছেন। পঞ্চবটিতে সীতার হাতে যে ডায়মন্ড কাটা বালা দেখেছিলেন, সেইরকম বালা করিয়ে দিয়েছিলেন সারদা মায়ের হাতে। তাঁর অন্যতম উত্তরসূরী, তাঁর অভিন্ন প্রকাশ স্বামীজীকে রাম মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করেছিলেন। তাঁর সন্তান ব্রহ্মানন্দ রাম-নাম প্রচার করলেন। অন্য জায়গায় দেখা যায়, পাগলিকে বললেন, 'এখানে মধুর ভাব চলবে না'। মর্যাদা পুরুষোত্তম। রামচন্দ্রকে বলা হয় মর্যাদা পুরুষোত্তম। আজকের দিনে আবার নতুন ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মের এবং ধর্মকেন্দ্রিক সমাজের মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করলেন একদিকে, অপরদিকে স্বয়ং সারদা যাকে মা জগদ্ধাত্রী এসে

বলছেন, 'তুমি আমার পুজো কর'। এ সারদা মায়ের দায়, না জগদ্ধাত্রী মায়ের দায়, না উভয়ে একই লীলা প্রকাশ করছেন? দ্বৈত ভাব, একদিকে জগদ্ধাত্রী রূপে, আর একদিকে সারদা রূপে। শেষ কথাটাই আমার মনে হয়। জগদ্ধাত্রী বলছেন, 'তুমি আমার পুজো কর'। আবার মা দেখি সমারোহ ক'রে জগদ্ধাত্রী পুজো করছেন। তা, একশ বছরের মধ্যেই দেখছি দিকে দিকে নব উৎসাহে জগদ্ধাত্রী ঠাকুর পূজিতা হচ্ছেন। জগদ্ধাত্রী একা আসেননি, সঙ্গে জয়া-বিজয়া। নব যুগ সন্ধিক্ষণে, নব জগদ্ধাত্রী সারদা মাকেও দেখি জয়া-বিজয়া, গোলাপ মা, যোগীন মা পরিবৃতা। এ তাঁর নিজ মুখের কথা।

এরপর আমি আমার ছোট্ট ব্যক্তিগত একটা কথা বলি—আমি তখন নতুন দীক্ষা নিয়েছি। খুব উদ্দীপনা—জপ ইত্যাদি করি। একদিন সকালে জপ করছি বসে বসে, দেখলাম সামনে মা জগদ্ধাত্রী। ভারী সুন্দর, নিখুঁত অবয়ব। কিন্তু একি? আমি ছবি আঁকতাম তো, তাই আরও বেশি করে মনকে পীড়া দিতে লাগল—মায়ের চোখ দুটো ঝাপসা। ভালো করে জপ করতে লাগলাম, যদি ভালো করে দেখা যায়। এত নিখুঁত, এত সুন্দর বিগ্রহ, কিন্তু চোখগুলো এত ঝাপসা! টানাটানির চোটে বিগ্রহ মিলিয়ে গেল। মনোকষ্টে চুপচাপ বসে আছি। যা হোক, অপেক্ষা করতে লাগলাম। বিকেল হলে দৌড়লাম গুরুদেবের কাছে। অন্যদিন যেমন গুরুদেব বলেন, 'আয়, বোস' ইত্যাদি, সেসব কিছু নয়। প্রদীপের সলতে ঠিক করছেন। আমার রাগ যে, এমন অবস্থায় এলাম আর তিনি তাকালেনও না। বললাম, আজ্ঞে, একটা কথা বলব? তিনি বললেন, 'বল'। বললাম, 'মায়ের চোখ দুটো ঝাপসা কেন?' আর, গুরুদেব যা উত্তর দিলেন, আমি শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বললেন, 'বাবা, মায়ের তো খুব সাধ ছেলেকে প্রাণভরে দেখে, কিন্তু ছেলের মনে ময়লা যে, মা ভালো করে তাকাতে পারছেন না'।

নটরাজেশ্বর শ্রীশ্রীঠাকুর

কথামৃতে বহুবার আছে—'শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবেশে নৃত্য করিতেছেন'। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শ্রীরামকৃষ্ণকে এতজন দেখেছেন, এত জ্ঞানী-গুণী মানুষ, অথচ কেউই শ্রীরামকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নৃত্য সম্বন্ধে আলোকপাত করেননি। গভীর ভাবাবেশে তিনি নৃত্য করতেন। গভীর ভাবময়তায় তাঁর শরীর আন্দোলিত হতো। ভেতরের আনন্দের এমন অবস্থা, যা সমস্ত শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গে পর্যন্ত ছন্দোবদ্ধ বিস্তার লাভ করত।

চৈতন্য চরিতামৃতে আমরা পড়েছি শ্রীচৈতন্যদেব কখনো ভাবাবেশে নৃত্য করতেন, কখনো ধূলায় গড়াগড়ি দিতেন। কিন্তু এর বিস্তৃত বর্ণনা বড় একটা পাই না। সেই গভীর অধ্যাত্ম উন্মাদনার অভিব্যক্তি, সেটা বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে শিব পুরাণাদি শাস্ত্রে পড়েছি, শিবজী তাঁর গভীর ভাবাবেশে কখনো কখনো নৃত্য করতেন। সেই নৃত্যের তালে-তালে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূলীভূত ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ হতো। পরম আনন্দের একটি গভীরতম দিক, যার মধ্যে এই সৃষ্টির সমস্ত বিলাস বিধৃত আছে, তা এই নাচের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হোত।

যে নৃত্য দিব্যলোকে সংঘটিত হয়েছিল, সেই নৃত্য আবার প্রকাশিত হয়েছিল নরলোকে-শ্রীরামকৃষ্ণে। বাইরের সমস্ত নাচ তো খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ। কিন্তু শিবজীর নাচ খণ্ডিত নয়, অখণ্ডিত, সেখানে সৃষ্টি আর ধ্বংস একসঙ্গে বিধৃত। তাঁর এক হাতে অমৃতপাত্র, আর এক হাতে দিব্যাগ্নি প্রজ্জ্বলিত। এক হাতে ডমরু বাজাচ্ছেন, ঝংকৃত হচ্ছে, আর এক হাতে প্রলয় বিষাণ। সৃষ্টি আর ধ্বংস দুদিকে রেখে, মাঝখানে স্ব-মহিমায় বিরাজ করছেন। মায়াতীত-মায়াধীশ কিনা।

সৃষ্টির যা কিছু, তার মধ্যে যে তত্ত্ব, যে গভীরতা এবং স্বচ্ছ আনন্দের যে অব্যাহত ধারা, তা খণ্ডিত, ছিন্ন হয়ে আছে অজ্ঞানের আবরণে। তার মধ্যে সেই পরম সুখ-শান্তির অনুভূতি নেই; সুখ এখানে শান্তিহারা হয়ে আছে! শান্তি এখানে অজ্ঞানের নিস্তব্ধতার মধ্যে স্তব্ধীভূত, জড়ীভূত হয়ে আছে। কিন্তু শিবজীর সেই নাচের মধ্যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় একসঙ্গে বিধৃত হয়ে আছে, তাই সেই নাচের মধ্যে মহাজ্ঞানের সঙ্গে, মহানন্দের প্রকাশ। এক-অখণ্ড। সেইজন্য বলা হয় শিবজীর নাচ ব্যক্ত ওঁকার-এর অভিব্যক্তি। অব্যক্ত যে ওঁঙ্কার, তার যে ব্যক্তিভূত সগুন প্রকাশ, নির্গুণ ব্রহ্ম যে সগুণাত্মক রূপে প্রকাশিত হলেন, এই নৃত্যের মধ্যে দিয়ে তার পূর্ণ অভিব্যক্তি। সেখানে সৃষ্টির সমস্ত রস একীভূত হয়ে আছে পরম বৈচিত্রের মধ্যে একের অভিব্যক্তিতে।

একটা সামান্যতম সৃষ্টির মধ্যে যদি তার ধ্বংসের সুর আসে, আমরা কান্নাকাটি করি, ভেঙে পড়ি, মনে হয় জীবন যেন ছিন্ন হল। কেননা, আমাদের চেতনা খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ। কিন্তু প্রাজ্ঞ চেতনায়, সেখানে সব একাকার হয়ে আছে। সেখানে সৃষ্টি, স্থিতি আর লয় একই আনন্দের, অনন্তের অভিব্যক্তির একীভূত প্রকাশ। সেই প্রজ্ঞান আমাদের নেই বলেই এই সৃষ্টি আমাদের কাছে এত খণ্ডিত, এত দুঃখময়। সেই চেতনা যখন আমরা পাব, তখনই আমরা সেই শিবজীর নাচ দর্শন করার অধিকারী হব। তখনই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য নাচ দেখার যোগ্য অধিকারী হব।

তবে চিন্তা-ভাবনার দিক দিয়ে আমাদের ঋষিরা একটা সূত্র দিয়েছেন। আমাদের এই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, সব কিছুই অজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে। আর শ্রীভগবানের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় দিব্য আনন্দের অভিব্যক্তি। ঋষিরা বলেছেন—

> 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
> আনন্দেন জাতানি জীবান্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি॥'

এসেছি আনন্দ হতে, আনন্দেই বেঁচে রব, মিশে যাব শেষে, অনাবিল ভূমানন্দ মাঝে। যিনি এই আনন্দের খবর পাবেন, তিনিই জানবেন এই সৃষ্টির সবকিছুর মধ্যেই সেই ভূমানন্দের প্রকাশ। আর, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্য সেই পরমানন্দেরই দ্যোতক ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ

জড়বাদের উপর মানবিকতা, মানবিকতার উপর আধ্যাত্মিকতা-ক্রমবিন্যস্ত সত্যের উর্ধ্বায়িত বিন্যাস। এটাই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সমৃদ্ধ এবং নীতিনিষ্ঠ বলিষ্ঠ জীবনবাদ, সবার উপর সার্বজনীন আধ্যাত্মিকতা। ভক্তিলাভই মানব জীবনের উদ্দেশ্য—ঠাকুর বলে গিয়েছেন। আবার তিনি জড়বাদকে স্বীকার করেছেন। ভক্তদের ছেঁড়া জামা-কাপড় দেখলে, মানুষের দারিদ্র দেখলে দুঃখ পেতেন, কষ্ট পেতেন। বিজ্ঞানের কথা জানতে চেয়েছিলেন। চন্দ্র গ্রহণ, সূর্য গ্রহণ কেমন করে হয়, মাস্টারমশাইয়ের কাছে জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মাস্টারমশাই যখন এঁকে দেখাচ্ছেন, তখন দেখতে দেখতেই সমাধিস্থ। মাইক্রোস্কোপের মধ্যে দিয়ে কেমন দেখায় দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু যখন আনা হল—তিনি সমাধিস্থ। তিনি জড়বাদকে তথা বলিষ্ঠ জীবনবাদকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু সর্বদাই তার উপরে রেখেছেন আধ্যাত্মিকতা। বৈদ্যনাথ ধামে দরিদ্রদের দেখে বেদনার্ত হয়েছেন। রাণাঘাটে মথুরের জমিদারি দেখে বলেছিলেন—তোমার জমিদারিতে এত দারিদ্র? আবার নৈতিকতাকে তিনি স্বীকার করেছেন জড় সত্য এবং আত্মিক সত্যের সংযোগকারি শক্তি হিসাবে। ঠাকুরের বাণী—যে সত্যনিষ্ঠ, সে ভগবানের পা ছুঁয়ে আছে। তাই কোন জায়গায় জড়বাদের জড়তার মধ্যে বা নৈতিকতার জড়তার মধ্যে পড়েননি, সব কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন আধ্যাত্মিকতা। মূল্যবোধের এই উর্ধ্বায়িত বিন্যাস তাঁকে বদ্ধ করতে পারেনি বৈদ্যনাথ ধামে—চলে গেছেন কাশীধামে।

এই ক্রমবিন্যস্ত সত্যের উর্ধ্বায়িত বিন্যাস শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। এটাকেই তিনি বারবার তুলে ধরেছেন। তাঁর অন্তিম বাণী—'তোমাদের চৈতন্য হোক', যা শাশ্বত বাণীও বলা যায়। আধ্যাত্মিকতা যে মানুষ জীবনের চরম আদর্শ, সেটাকেই গভীরভাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তিনি যখন বলে গিয়েছেন আবার আসবেন—একবার না দুবার—সাঙ্গপাঙ্গোদেরও আসতে হবে। সেই আধ্যাত্মিকতার চরম বাণীকে উজ্জ্বলতর ভাবে তুলে ধরতেই তিনি আসবেন। এটা আমার বিশ্বাস।

সারদা মা

আলতা রাঙা সারদা মায়ের চরণ চিহ্ন অনেকে তো বাড়ীতে রেখে পুজো করেন। মায়ের পাদপদ্মে আমরা সকলেই প্রণাম জানাই। অনেক ফটোতে দেখা যায় মা পাদপদ্ম প্রসারিত করে রেখেছেন। বলা হয় পাদপদ্ম। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন, এই যে পাদপদ্ম বলি, তার কারণ—পদ্মের মধ্যে যে সৌন্দর্যের আভাস আমরা পাই, সেই সৌন্দর্য কোন কোন চরণেও প্রকাশ পায়। তাই বলা হয় পাদপদ্ম। পরবর্তীকালে শ্রী নন্দলাল বসু তাঁর রূপাবলী প্রসঙ্গে তা এঁকে দেখিয়েছেন।

কোলে হাত রাখা সারদা মায়ের দুটো প্রসারিত চরণ যখন আমি দেখি, পাশাপাশি আমার মনে হয় আর একটা কথা প্রস্ফুটিত পদ্মের মাঝে যে পরিপূর্ণ পবিত্রতার প্রকাশ, তা যেন সারদা মায়ের চরণ যুগলে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। তাই আমার কাছে পাদপদ্ম কথাটা গভীরতর অর্থে প্রকাশ পায়। বাস্তবিক অভেদানন্দজী যাঁকে বলেছেন, 'পবিত্রতা

স্বরূপিনী'। তাঁর স্মরণমাত্র মানুষের মনে পবিত্রতা সঞ্চারিত হয়। মায়ের প্রসারিত পাদপদ্মের মধ্যে সেই প্রস্ফুটিত পদ্মের পরিপূর্ণ পবিত্রতা।

ফোটা ফুলের মাঝে আমরা আর একটি প্রকাশে মুগ্ধ হই। সেটি হল তার অম্লান সজীবতা। বস্তুত সন্তান কল্যাণ কামনায় সতত প্রসারিত তাঁর পাদপদ্মের চেয়ে সজীব সুন্দর আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। তাই আমাদের কাছে পাদপদ্ম কথাটা গভীরতর অর্থবহ হয়ে দেখা দিয়েছে, ধরা দিয়েছে। আমরা তাঁর চরণ চিন্তা করি। আর ভাবই তো রূপকে মুক্তি দ্যায়।

মায়ের মুখটি বারবার মনে পড়ে, মায়ের ভ্রূ-যুগলের মধ্যে কঠিন বাস্তবতার আভাস। এই পৃথিবীর সমস্ত কাঠিন্যকে বিরূপতাকে স্বীকার করে, স্বর্গের পবিত্রতা, স্বর্গের সৌন্দর্য নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চোখ দুটোর মধ্যে সেই পবিত্র স্বপ্ন ভরে আছে। সে স্বপ্ন তিনি জীবনভোর দেখেছিলেন। তাঁর তিনটে স্বপ্নের কথা আমরা জানতে পারি।

'আমার ছোটবেলায় দেখতাম আমার সঙ্গে আমার বয়সী কতগুলি মেয়ে কাজে সাহায্য করতে যেত। কখনো দলঘাস কাটতে গেছি, কখনো ধান কুড়োতে, তারা আমার সঙ্গে গেছে'। এই দিব্যদৃশ্য তিনি দেখেছিলেন। বস্তুতপক্ষে তিনি একা আসেননি, এই পৃথিবীকে পবিত্রতম করার যে বাসনা, যে স্বপ্ন নিয়ে তিনি এসেছিলেন, সেই কাজে তিনি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদেরও নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর কথিত জয়া-বিজয়া থেকে শুরু করে সাগর পারের নিবেদিতা-ক্রিস্টিনা পর্যন্ত।

মা দ্বিতীয় স্বপ্ন দেখছেন, যখন ঠাকুরের কাছে আসতে গিয়ে জয়রামবাটি থেকে দক্ষিণেশ্বরে আসার পথে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় কোন এক পান্থশালায় বিশ্রাম করছেন, তখন দেখছেন কালো একটা মেয়ে ভারী সুন্দর, পা দুটো টুকটুকে লাল, পাশে বসে সেবা করছে। মায়ের ভাষায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে গা? সেই মূর্তি, বলল, আমি তোমার বোন, দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি। আমি বললাম, আমার আর যাওয়া হল না। তখন সে বলল, যাবে বৈ কি?

বাস্তবিক স্বপ্নে দেখা দক্ষিণেশ্বরের যে মেয়েটার কথা মা বলে গিয়েছেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী বিগ্রহ তথা এই পৃথিবীর মন্দিরে মন্দিরে পূজিত মাতৃ বিগ্রহ। আর একটি বিগ্রহ, যে বিগ্রহতে তিনি মহাকরুণায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবন জোড়া তপস্যায় তাঁর স্বপ্নের জীবন থেকে, স্বপ্নলোক থেকে যে বিগ্রহকে প্রাণবন্ত করেছিলেন, তাঁর নাম সারদা। একটি বিগ্রহীভূত, আর একটি জীবন্ত। আমরা পেলাম বিশ্বহিত ধ্যানমগ্না মাতৃমূর্তি।

কাজেই, তাঁর দ্বিতীয় স্বপ্ন আমাদের কাছে অন্যরকম ভাবে ধরা দেয় মন্দিরে এই কালো মেয়ে। আর, আলো করা মেয়ে-নহবতে দেখেছি এই বিগ্রহীভূত রূপ ও সচল মাতৃরূপ সারদা রূপে, দুটো রূপেই তিনি এসেছিলেন এই ধরায় তাঁর সন্তানকে উদ্ধার করবার ব্যাকুল স্বপ্ন নিয়ে।

তাঁর তৃতীয় স্বপ্ন তিনি বলছেন, 'স্বপ্ন দেখলাম লালপাড় মেয়ে, হাতে কলসি আর ঝাঁটা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁ গা, ঝাঁটা আর কলসি কেন গা? তিনি বললেন,

ঝাঁটা মানে সব ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করব। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর কলসী? তিনি বললেন, কলসীতে অমৃতবারি আছে, তা সিঞ্চন করে যাব, সব কিছু অমৃতময় করে দিয়ে যাব'।

বস্তুতপক্ষে সারদা মায়ের তৃতীয় স্বপ্নে তাঁর জীবনের পরিপূর্ণ স্বপ্ন তথা স্বরূপই প্রকাশ পেয়েছে। তৃতীয় স্বপ্ন যে কতখানি সফল, তিনি এসেছেন জগতের যা কিছু মালিন্য, যা কিছু অপবিত্রতা দূর করতে। তাঁর জীবনজোড়া করুণার প্রবাহে তিনি এই জগতের যত কিছু মলিনতা, কলুষতা দূর করে দিয়ে গেছেন ও দিচ্ছেন। আর তাঁর অমৃতময়ী প্রভাবে এই জগতের অনন্ত হৃদয়ে সেই পবিত্রতার সঞ্চার হয়েছে। সহস্র জীবন অমৃতায়িত হচ্ছে তাঁর করুণার প্রবাহে।

কাজেই তৃতীয় স্বপ্নেও তিনি সঞ্চারিত হয়েছেন। প্রকাশ করেছেন তাঁর করুণাঘন রূপ। স্বপ্ন তিনি দেখেছেন জীবনভোর, আর সেই স্বপ্ন আমাদের জন্যই, আমাদেরকে নিয়েই। এই কথাই তাঁর ভাগবতী তনুর দিকে তাকিয়ে মনে হয়।

রাই ঋণ

ঠাকুর তাঁর সমস্ত সাধনার ধন দিয়ে মাকে পুজো করলেন। তাঁকে অভিষিক্তা বা প্রতিষ্ঠিতা করলেন, 'মা ত্রিপুরাসুন্দরী বালে, ইহার শরীর, মন আশ্রয় করিয়া আবির্ভূতা হও মা, আবির্ভূতা হও। ইহার সিদ্ধিদ্ধার উন্মোচিত কর'। তারপর কাশীপুর বাগানে একদিন বলছেন, 'হ্যাঁ গো, এই শরীরটা এত করল, তুমি কি কিছু করবে না, কলকাতার লোক যে পোকার মত বিলবিল করছে?' মা বললেন, 'আমি মেয়েমানুষ, আমি কি করব?' তখন তিনি বললেন, 'এ কি করেছে, তোমাকে তার অনেক করতে হবে'।

ব্রজগোপীরা একদিন রাধারানীকে একটা বেদীর উপর বসিয়ে পুজো করেছিলেন। বলেছিলেন, আজ থেকে তুমি বৃন্দাবনের রাজা। বৃন্দাবন কি? এই পৃথিবীর যত সাধক-সাধিকা, সব বৃন্দাবনের অধিবাসী। তিনি সমস্ত পৃথিবীর ভক্ত-হৃদয়ের অধিশ্বরী হয়ে গেলেন। এই 'রাই রাজা' করলেন।

তারপর কৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেলে দেখা গেল রাধারানীর ভাবারূঢ় অবস্থা হচ্ছে। মাদনাক্ষ মহাভাব, বিরহের চরমে কৃষ্ণচন্দ্রের স্বরূপস্ফূর্তি হচ্ছে। সমাহিত অবস্থা। তারপর দশম দশায়, অভেদ স্বরূপে গোপীদের বলছেন, 'তোদের সকলকেই আমি শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ পাইয়ে দেব, তবে সেই ঋণ তোদের শুধতে হবে কৃষ্ণ নাম দিয়ে।' একমাত্র নামের মধ্য দিয়েই এই ঋণ শোধ করতে হবে। শ্রীমতী তাঁর 'নীলরতন'কে ব্রজ গোপীদের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছেন, এই বলে—

'কৃষ্ণ নাম মন্ত্র আজি লও সখীগণ।
আর এই দীক্ষার দক্ষিণা কৃষ্ণ সঙ্কীর্তন।।'

সেই লীলা প্রসারিত করে চৈতন্যদেব সর্বলোকের কাছে- যা বৃন্দাবনে ছিল, তা জগত অরণ্যে পরিবেশন করেছেন নামের ঋণ।' নাম প্রেম দিয়া তারিলা সংসার'। নাম-প্রেম পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। শিব-এর কথায় আছে 'পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ একি

সন্ন্যাসী? বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।।' বিশ্বে সেই বৈরাগ্য ছড়িয়ে দিলেন এ বৈরাগ্যের কথা। আর প্রেমের পথে সেই 'রাই ঋণ' বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন শ্রীচৈতন্যদেব।

তাই গোপীদের সেই সাধনা শুরু হল, তারা যাতে কোন না কোন শুভ দিনে সেই 'রাই ঋণ' শোধ করে রাধা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণকে পেতে পারে। কৃষ্ণ বলেছিলেন, 'আমি আবার আসব'। তিনি প্রতীক্ষা করছেন মাঝখানে। যতখানি গোপীরা প্রতীক্ষা করছেন, তিনিও ততোধিক প্রতীক্ষা করে আছেন। যবে 'রাই ঋণ' শোধ করতে পারবে, তবে তিনি তাদের কাছে পূর্ণ স্বরূপে দেখা দেবেন।

একই তো লীলা। আমাদের রাই রাজা সারদা মা-ও সবাইকে সেই কৃপা বিতরণ করে যাচ্ছেন, সকলকেই মা দেখছেন। একটা 'রাই ঋণ' তিনি দিয়ে যাচ্ছেন, সেই ঋণটা শোধ করলেই পাব। দিয়ে যাচ্ছেন অকাতরে। মা মন্ত্র দিয়ে স্বয়ং ঠাকুরকেই দিয়ে যাচ্ছেন, সেই ঋণ শোধ করলেই এ কথা জানতে পারব। চৈতন্যদেব যেমন জগতের জন অরণ্যে সেই ঋণ বিতরণ করেছেন, সারদা মা-ও এ জগতের জন অরণ্যে তাঁর যথাসর্বস্ব প্রাণধন বিতরণ করে গিয়েছেন। সেই 'রাই ঋণ' এখন শোধ করতে হবে। কৃষ্ণ নাম এখন রামকৃষ্ণ নাম। শ্রীমা কি দীক্ষান্তে তাঁর সন্তানদের বলেননি—'বাবা, আমার যা দেবার সেই এক কালেই দিয়েছি, এখন তোমার বাড়ার ভাগ'? এতেও যদি কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছে, তাতে তিনি বলেছেন—'মনে কর তুমি একটা খাটে শুয়ে আছ, সেই সময় যদি কেউ খাট শুদ্ধ সরিয়ে দ্যায়, তুমি কি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবে, তুমি যখন জেগে উঠবে তখন জানতে পারবে'। এখন আমাদের এই জেগে ওঠার অপেক্ষা। চরম কথা এই যে, এমন কী স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের সন্তানরাও বিশ্বজননী সারদা মা-এর কাছে তাদের 'রাই ঋণের' কথা গভীর কৃতজ্ঞতার সুরে বন্দনা ক'রে গেছেন।

কল্পতরু

কল্পতরু সম্বন্ধে ঠাকুরের নিজ মুখের একটা গল্প আছে। এক কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে কাটতে পরিশ্রান্ত হয়ে একটা গাছের তলায় বসে পড়েছে। সে জানে না যে সেটা কল্পতরু। বসে পড়ে ভাবছে, বড় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি, এখন যদি একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বইত। সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। তখন ভাবছে, হাওয়া তো বইছে, একটু তামাক যদি পেতাম তাহলে বেশ হোত। তারপর এই ভাবে বিছানা, দাস-দাসী ইত্যাদি হ'ল। তখন ভয় হয়েছে, সব তো হল এখন যদি এই বনের মধ্যে থেকে একটা বাঘ আসে, তাহলে তো খেয়ে ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলল।

ঠাকুর এই কল্পতরু নামের বৃক্ষের গল্পের মধ্যে দিয়ে যেন বলতে চাইছেন, মানুষের এই জীবনজোড়া সুখের প্রয়োজন, আয়োজনের মধ্যে দিয়ে যে সংঘাত-সমাপন, জগতে সেই নাটকেরই পুনরাবৃত্তি চলছে। জীবনের নির্বোধ বাসনার বিস্তারের মধ্যে দিয়ে বাঘ রূপী দুঃখের পদসঞ্চার। কেননা মূলে যা প্রয়োজন তা হ'ল চেতনার বিকাশ।

এখন, ঠাকুরের যে লীলা, যাকে আমরা কল্পতরু বলে শুনতে পাই—ঠাকুরের আশীর্বাদ ছিল—'তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক'। তাহলে, ঠাকুরের কল্পতরুর আশীর্ব্বাদ সচ্চিদানন্দ গুরু রূপে। 'পরিত্রাণায় সাধুনাং—সাধুদের পরিত্রাণ করেন। কি

ভাবে পরিত্রাণ করেন? যে জাগতিক কোন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আছে, সেই দুঃখটা তার মিটিয়ে দিলে সে তাৎক্ষণিক পরিত্রাণ পায় বটে, তবে অবশ্যই নিজের গণ্ডীর মধ্যে সে আবর্তিত হবে। যথার্থ পরিত্রাণপ্রার্থী চৈতন্যের কাঙাল, অন্ধকারে বসে কাঁদছে, আমাকে আলো দাও। সুতরাং সাধকদের জীবনের পরিত্রাণ, তাদের জীবনে সেই চৈতন্যের প্রকাশ। সেই চৈতন্যের সাধনাই তাদের জীবন। এই চৈতন্যের অবতরণ সচ্চিদানন্দ গুরুসত্তার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে হচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য সদ্গুরুরা তাঁরই আবেশ। সচ্চিদানন্দ গুরু রূপে তিনি জগতকে চৈতন্য দিতে এসেছিলেন। হাত তুলে উদার প্রসন্নতায় বলেছিলেন, 'তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক'।

কোথাও তিনি শুধুমাত্র কোন জাগতিক প্রয়োজন মিটিয়ে মানুষকে আরও বন্ধনে ফেলেননি। কেননা, তিনি বন্ধনমুক্তি দিতেই এসেছেন। তাই দেখা যায়, যে ইষ্টের দর্শন পাচ্ছিল না, সে ইষ্টের দর্শন পেল। কারো ধ্যানে আনন্দ হচ্ছিল না, সে ধ্যানে বসে গেল। কেউ অনাস্বাদিত আনন্দে অধীর হয়ে স্তব স্তুতিতে মগ্ন হল। কেউ বা সর্বব্যাপ্ত ঠাকুরের শ্রীমুখ দেখতে পাচ্ছে—যেমন ত্রৈলোক্যনাথ স্যান্যাল।

মানুষ তো দিব্য ব্যক্তিত্ব দেখবে, ভাবনার সঞ্চার দেখবে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ তার তাৎক্ষণিক প্রয়োগটা দেখে আনন্দ পায়। সেই অঘোষিত অনুষ্ঠানে সব ভক্তদের যে যেখানে আছে তার থেকে যতটুকু বেশি অবস্থা দেওয়া যায়, যা সে নিতে পারবে, ততটুকু এবং হয়ত তার চেয়েও অধিক, যেমন ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, সে তো রাখতে পারল না, হয়ত করুণা পরবশ হয়ে তার চেয়েও অধিক দিয়ে দিলেন। সেইজন্য ত্রৈলোক্য-নাথ সান্যালের কথা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্য দিক দিয়ে আমরা নিত্য দিনের জন্য প্রসারিত চৈতন্যের একটি ভাবময় বিগ্রহের সন্ধান পেলাম।

ঐশ্বর্যময় ঈশ্বর রূপে তিনি কর্মফল বিধাতা, কর্মফলের নিয়ন্তা। সেই রূপ আমাদের কাছে ততটা কল্যাণকর নয়, সচ্চিদনন্দ রূপই আমাদের কাছে প্রত্যাশিত। সেই রূপ তিনি প্রকাশ করেছিলেন জগতের কল্যাণের জন্য। তাই স্বামী সারদানন্দ আজকের ঠাকুরের লীলাকে বলছেন 'আত্মপ্রকাশে অভয়দান'। কি আত্মপ্রকাশ করছেন? না, তিনি সেই সচ্চিদানন্দ সদ্গুরু স্বরূপ, তাঁর কাজ হচ্ছে জগতের চৈতন্য বিধান করা। তাই অভয়দান।

ভগবানের কাছে আমাদের এই প্রার্থনা আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের কর্মফলজনিত যে অশুভ সংস্কার আছে, যেন তার বন্ধন উত্তীর্ণ হই আমরা। যেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে, সেই সচ্চিদানন্দ গুরুর কাছ থেকে আশীর্বাদ যাচঞা করতে পারি, হে ভগবান, তুমি আমাদের চৈতন্য বিধান কর, যাতে এই মায়ার কুহেলিকার যন্ত্রণা থেকে চিরদিনের মত মুক্তি পেয়ে স্বরুপানন্দি হতে পারি।

আনন্দরূপ

সাধক যখন মুক্ত হ'ল, তখন সে স্ব-স্বরুপে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এই সৎ থেকে চিৎ স্বরূপ জাগরণ হচ্ছে, তার থেকে আনন্দ স্বরূপ। পৃথিবীতে যখন সে নেমে এসেছে, তখন তার পরিচয়, প্রথমে সে আনন্দ স্বরূপ তারপর চিৎস্বরূপ, তারপর সৎস্বরূপ—

যখন জগতে জীব উদ্ধারের কাজে ব্রতী হল। কেননা, এই মায়াবৃত সংসারে সে মুক্তির পথ দেখাচ্ছে। এই হচ্ছে সৎ-এর আনন্দ। বিদ্যাশক্তির আনন্দ নিয়ে সে থাকবে। কাজেই, আগে আনন্দস্বরূপ, তারপর চিৎস্বরূপ তারপর সৎস্বরূপ। এই জগতে জীবকে সে সেই দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। আর যার ইষ্ট ভাবনা বা যিনি এই অব্যক্ত ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত আছেন, তার কাছে ঐটাই থেকে যায়। আগে সৎ, তারপর চিৎ, তারপর আনন্দ। যিনি নেমে আসেন, সেটা যেন আবৃত রাখেন, না হলে কাজ করতে পারবেন না। মানুষকে মুক্তি পথের আনন্দ দান করছেন তো, চেতন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। এইগুলো হচ্ছে ভারি রহস্য।

সারদা মাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তোমার কি সব সময় নিজের স্বরূপের কথা মনে থাকে? মা বললেন, না, তবে এক একবার দেখে নিই।.....ঠাকুরকেও দেখেছি পান খাব, তামাক খাব বলে মনকে নামিয়ে রাখতেন। বলেছেন, আমার সাধ ভক্তি ভক্ত নিয়ে আনন্দ করব। উপনিষদের মন্ত্র দেখ, 'আনন্দ অমৃতরূপং যদ্ বিভাতি'। এই বিভাতিটুকু নিয়েই জগত কল্যাণ, আর সৎ-এই তার সমাপন। শঙ্করাচার্য তত্ত্বপ্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় লিখেছেন, সৎ, চিৎ স্বরূপম্, আবার স্তব-স্তুতি করতে গিয়ে চিদানন্দরূপম্।..... এটা আমার এই ভাবেই মনে হয়েছে।

শক্তি

এই যে বলেছে, মা-কালীকে কেটে দিয়েছেন ঠাকুর, এটা অনেকেই বোঝেনি, তাই নানারকম ব্যাখ্যা করে দিয়েছে। সমাধি স্তরে রূপকল্প ব'লে কিছু থাকে না, শক্তি থাকবে। রূপ এসে বাধা দিচ্ছে, তখন তিনি কেটে দিলেন। তখন মন হু-হু করে উঠল নিরালম্ব ভূমিতে। এই যে মন উঠল, এটাও তো শক্তিরই খেলা। শক্তি ছাড়া ওঠে? রূপকল্প থাকবে না, কিন্তু শক্তি থাকবে। এই যে বিদ্যুৎ বইছে রূপকল্প নেই, তাহলে কি শক্তি নেই?: শক্তি থাকবেই।

স্বামীজী

⋆ সমাজ বা লোকালয় থেকে আলাদা থেকে উচ্চ কোটির মহাত্মারা আছেন জগত কল্যাণে। তাহলে স্বামীজী যখন ওভাবে থাকতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন নিরন্তর নির্বিকল্প সমাধিতে থাকবেন, তখন ঠাকুর বারণ করেছিলেন কেন? ওটা করলেও তো জগতের কল্যাণ হোত?

⋆⋆ এই উত্তরটা দুদিক দিয়ে। একটা হচ্ছে স্বামীজী এসেছিলেন কাজ করতে। সেই কাজটা শুধু জগতের সূক্ষ্মতম স্তরকে নিয়ে নয়, ব্যাপ্ত স্তরে, স্থূল স্তরেও তাঁকে কাজটা করতে হবে। কাজেই তিনি নির্বিকল্প সমাধি স্তরে থেকে সেই সমাধির সুখ অনুভব করবেন, সেটা তো নয়। দ্বিতীয় কথা—স্বামীজী চেয়েছিলেন সমাধি সুখ অনুভব করতে। আর যে সমস্ত মহাত্মারা জগত কল্যাণের জন্য সমাধিস্থ হয়ে আছেন সেটা অনুভব করার জন্য নয়। যখনই তাঁরা জগত কল্যাণ সংকল্প করছেন, তখনই তাঁরা নিজেদের যে চূড়ান্ত

স্থিতি, তার থেকে নেমে এসেছেন। কারণ সংকল্প তাঁদের স্থিতিকে কিছুটা নামিয়ে রেখেছে।..... এই কিঞ্চিৎ হচ্ছে এ ঘর, ঘর-এর মত। সমাধি হলেও এতটাই ফারাক।

অনেকেই বলে, স্বামীজীর ধ্যান মূর্তির মত মূর্তি হয় না। মাথায় রাজাধিরাজের মত পাগড়ি পরেছেন, সাজগোজ করা, এই ধ্যান সমাধির মূর্তির পাশাপাশি ধ্যানমূর্তি হচ্ছে বুদ্ধের ধ্যানমূর্তি। সমাধির তো দুটো দিক, একটা হচ্ছে বাইরের ত্যাগ, তিতিক্ষাময় জীবন, আর অন্য দিকে অন্তরে গভীর সত্য জ্ঞান আনন্দময় একটা প্রশান্তি। এই দুটো দিক দেখলে বুদ্ধের ছিন্ন চিবরধারী, ত্যাগ তিতিক্ষাময় তপোক্লিষ্ট শরীর, আর গভীর ধ্যানের আনন্দে ভরা মুখমণ্ডলে গভীরতর প্রশান্তি, এ অনেক বেশী যথার্থ। বিরহের সরসীতে প্রাপ্তির শতদল-এ নাহলে মানায় কি? কঠোরতা প্রাপ্তি করুণা এই তিনের মিলিত বিগ্রহ সারনাথ এবং অন্যান্য সফল বুদ্ধ মূর্তি হাজার হাজার বছর পেরিয়ে বিশ্বের সর্বত্র সমাদৃত। সূর্যের আলোর মত, পৃথিবীর কোন সম্প্রদায় তাঁকে নিজের বলে আগলাতে পারে নি।

কিন্তু স্বামীজী রজোগুণের ক্রীড়াভূমি পশ্চিমের মানুষদের কাছে রাজযোগের ক্লাস নেওয়ার সময় যথোপযুক্ত ওদের মনোরঞ্জনের মত সেজে ধ্যানের ক্লাস নিতে গিয়ে যখন বসেন, তখন সমাধিস্থ হয়ে যান। কাজেই ওদের গ্রহণ সামর্থের কাছে স্বামীজীর ব্যবহারিক জীবনটা অনেক নমনীয় করতে হয়েছে। ধূলিধূসরিত নগ্ন পদ, অনশনক্লিষ্ট ক্ষীণ দেহ, তপস্যার জ্বলন্ত অগ্নিবিগ্রহ সম স্বামীজী গাছতলায় পড়ে আছেন সমাধিস্থ হয়ে, সেটা ওরা যথার্থ নিতে পারতো কি না সন্দেহ। কিন্তু সেটাই যথার্থ মূর্তি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার। জগত সেখানে পরমার্থের সেতু মাত্র। জগৎকে স্বীকার করা হয়েছে পরামার্থিক মূল্যবোধের নীচে নামমাত্র। সেদিক থেকে বুদ্ধদেবের ধ্যানমূর্তি যথার্থ। স্বামীজীর ধ্যানমূর্তিও যথার্থ, কিন্তু সেখানে একটা আপাত প্রয়োজনের প্রলেপ আছে।

পরমহংস

☆ 'নিত্যগোপালের পরমহংস অবস্থা, তবুও তাকে সাবধান করছেন?'

☆☆ এই পরমহংস কথাটা একটু বোঝার আছে।......মনে করুন একটা এম. বি. বি. এস. ডাক্তার চেম্বারে বসেছে। তারপর সে বিলেত ফেরত হয়ে আবার সেই চেম্বারেই এসে বসল। ডাক্তার তো আগেও ছিল, পরেও আছে, কিন্তু আকাশ পাতাল ফারাক হয়ে গেল তো? তেমনি, যোগীরা দেহবোধের ক্ষেত্রে কণ্ঠে স্থিতি করেন। কণ্ঠের উপরে উঠলে এই দেহবোধ তথা জগতের বোধ প্রায় লুপ্ত হয়। যখন সিদ্ধ হয়ে যায়, সিদ্ধ হবার পর উপরে উপরে যত দুরই গতি হোক, সচল অবস্থায় ঐ কণ্ঠে স্থিতি লাভ করে। আবার উন্নত সাধকরাও কণ্ঠে স্থিতি লাভ করছে। কিন্তু তার উপরে গতি হয়নি। উপরের গতির জন্য সাধনা করে যাচ্ছে। সিদ্ধ হয়নি। মানে, তার অজ্ঞান কাটেনি। অজ্ঞান বা মায়া আছে। সেও কণ্ঠে স্থিতি লাভ করছে, আর যিনি পরিপূর্ণ সিদ্ধ হয়ে গেছেন, অজ্ঞান অবিদ্যার পারে গিয়েছেন, কামবীজ দগ্ধ করেছেন, তিনিও ফিরে এসে কণ্ঠে স্থিতি করছেন। এই দুটোই এক হিসাবে পরমহংস, স্থিতিটার হিসাবে পরমহংস।

পরমহংসের অবস্থার অনেক হেরফের আছে। এইজন্য পরমহংস কথাটার মানে দুটো অর্থেই হয়। যেখানে দেখবেন সেই পরমহংস সম্বন্ধে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কিছু ভালো মন্দ

কথা আছে, বুঝবেন সেখানে আংশিক বা কাঁচা পরমহংসের কথা বলা হচ্ছে। যেহেতু তার অবিদ্যা, অজ্ঞান কাটেনি, সেইজন্য তাকে সব কিছু বিধি নিষেধের মধ্যেই থাকতে হয়, নিয়ম নিষ্ঠার অবহেলায় হেলে পড়ে। কিন্তু যিনি সিদ্ধ হয়েছেন, উপরের উপরের অবস্থা পেয়ে গেছেন, তাঁর কাছে সেই অবিদ্যা, অজ্ঞানের প্রশ্ন নেই, এঁনারা পূর্ণ পরমহংস। এঁদের ক্ষেত্রে জীব-ভাবের কোন ব্যাপার নেই। এঁরাই আচার্য জগতের। নইলে পরমহংস কথাটার মানেই দাঁড়ায় না।

নিত্যগোপাল পূর্ণ পরহমংস অবস্থা পেয়েছিলেন পরে, যখন তিনি অবধূত সন্ন্যাস নিয়ে সাধনা করে সিদ্ধ হয়েছিলেন। অনেক জায়গায় দেখবেন, এই যে বলছে কুম্ভমেলায় শত শত পরমহংস এসেছে বা কোন পরহংসকে কাঠিয়াবাবা বকাঝকা করছেন কাঠিয়া বাবার জীবনীতে আছে, সব জায়গায় মনে হতে পারে পরমহংসকে আবার কি বলছেন?: জাগতিক স্থিতিটা এক আছে, সেই হিসাবে পরমহংস। যেমন ডাক্তারের উদাহরণটা দিলাম।

সাধনার স্থির ভূমি না পাওয়ার জন্য আংশিক পরমহংস অবস্থা থেকেও অনেক সাধক নেমে যায়। কেননা, সে মনে করে আমি সব কিছুর পার হয়ে গেছি, আসনের আনন্দ এসে গেছে। কিন্তু নিষ্ঠা চলে গেলেই তার অবস্থা আস্তে আস্তে নামতে থাকে। তখন আর নিজেকে সামলাবার কোন উপায় থাকে না। কেননা, দীর্ঘ দিনে তিলে তিলে গড়ে তুলেছে তো নিজেকে, কিন্তু সেটা ভাঙতে সময় লাগে না। যারা নেবে যায়, তারা অনেকেই ওখান থেকে নেবে যায় এই ভ্রান্তিতে পড়ে যে, মনে.করে আমি ভালো অবস্থা পেয়ে গেছি। তাই বারবার দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের সাবধান বাণী।

আর এক আছে আনুষ্ঠানিক পরমহংস। পরমহংস সন্ন্যাস একজন আর একজনকে দিয়ে দিল। সেটা চলতি পরমহংস। এখনকার বেশিভাগ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক পরমহংস সন্ন্যাস দিচ্ছে কাজের সুবিধার জন্য।

আবার পূর্ণ পরমহংসেরও পরের অবস্থা আছে। অর্থাৎ, পূর্ণ পরমহংস কথাটা সেখানে চলে না। ওসব কথাই অর্থহীন। এমন কথাও শাস্ত্রে আছে। যাকে বলা হয়েছে সহজ অবস্থা। পরমহংসেরা এঁনাদের দর্শন করুণা অভিলাষী। লোকালয়েও আছেন। যেমন, শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের রামদাস কাঠিয়াবাবার সহজ অবস্থা। সেখানে পরমহংস কথাটাও চলে না, গুরুগম্ভীর খেতাব তো। কলকাতায় একজনের বাড়ীতে কাঠিয়াবাবা এসে বসে আছেন। এমন সময় খবর এল যে, তখনকার দিনের ভোলাগিরি মহারাজ দর্শন করতে আসছেন ওঁনাকে। ভোলাগিরি উত্তরাখণ্ডের বিখ্যাত পরমহংস, খুব গণ্যমান্য। ভোলাগিরির শিষ্যদের খুব আনন্দ, আমাদের গুরুদেব আসছেন, আর কাঠিয়াবাবার শিষ্যরা বলছেন, আপনি অভ্যর্থনা করবেন তো? তিনি বললেন, তোমাদের ইচ্ছা হয় তোমরা যাও। তিনি ওপাশ ফিরে শুয়ে রইলেন। কেন এমন হল! ভদ্রতার ব্যাপারও তো একটা আছে? কি হয় ব্যাপারটা দেখতে সবাই অবাক হয়ে ভিড় করেছে। তখন পরমহংস ভোলাগিরি এসে কাঠিয়াবাবার স্তব করতে লাগলেন। বসলেন না, দাঁড়িয়ে দু হাত জোড় করে স্তব করতে লাগলেন। খানিকক্ষণ স্তব করার পর কাঠিয়াবাবা উঠে বসলেন, বললেন—'তুম আ গিয়া ভোলাগিরি। আও আও, বইঠো।' শিষ্যরা দেখলেন কি? ভোলাগিরি ওঁনার খাতিরের মধ্যে পড়েন না।

কর্মে অধিকার

★ দেখছি ঠাকুর শুধু গিরিশ ঘোষেরই বকলমা নিয়েছিলেন, আর মা যেন অনেকেরই বকলমা নিচ্ছেন, বলছেন, 'তোমাদের কিছু করতে হবে না।'

★★ দুটো আলাদা পরিস্থিতি। ...কাউকে মা বলছেন, ভোর রাত্রে উঠে জপধ্যান করতে। কাউকে বলছেন, সকাল-সন্ধ্যেয় জপধ্যান করবে। ত্যাগ, তপস্যা, বৈরাগ্যের কথা তো বলেছেন? আবার কাউকে বলছেন,-কিছুই করতে হবে না। তাহলে সবাই কি গিরিশ ঘোষ হয়ে গেছে? না। মানুষ যে আত্মকর্ম করবে, তার সেই সত্তা বা অবস্থা থাকতে হবে। বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে যখন তার আসক্তির মেলবন্ধন, তখন সে শুধু জড়িয়েই যাবে, তার আত্মকর্মের তখন কোন সামর্থ নেই। মায়ের দীক্ষা পেল, আশ্রয় পেল, তখন আর জড়াবে না হয়ত। তার হয়ে মা-ই করবেন-যতক্ষণ না তার সত্তা মোক্ষ-পথগামী হয়। মানুষের সত্তা যখন মোক্ষ-পথগামী হয়, গুটিয়ে আসে, তখন সে আত্মকর্মের যোগ্যতা লাভ করে। তার আগে তাদের বলছেন, কিছুই করতে হবে না, আমিই করব। তাদের তো সামর্থ নেই, কি করবে? মনে কর, একটা বড় ছেলে জামা-কাপড় কাচছে। সেই দেখে একটা ছোট ছেলেও জামা-কাপড় টেনে নিয়ে বলছে, আমিও কাচব। মা বলছে,-না, তোমার কাচতে হবে না, আমিই কেচে দিচ্ছি। মা জানে, তার সেই বয়স হয় নি, তাই মা নিজে কেচে দিচ্ছে। পরমার্থ প্রসঙ্গে শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ একটি অবিস্মরণীয় কথা বলেছেন,-এই কর্মযোগ, ভক্তি যোগ, জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলছেন। 'সব ভেতরের অবস্থা সাপেক্ষে। মানুষের কর্মেন্দ্রিয় যখন আত্ম-পথগামী হয়, সে স্রষ্টার কাছে ফিরে যাওয়ার অধিকার পায়, তখন যে কর্ম, সেটাই হচ্ছে কর্মযোগ। মন যখন আত্মাভিমুখী হয়, সেটা ভক্তি যোগ। বুদ্ধি যখন আত্মাভিমুখী হয়, সেটা জ্ঞানযোগ'। বলছেন, সবটাই তার সত্তার অবস্থা। তার আগে সে কি করবে? তার আগে-কাঠিয়াবাবার কথায়-'ভজন কা ঘর দূর হায়'। সেখানে যতটুকু পারে সদ্‌জীবন, সদ্‌ভাবনা, আর মায়ের চরণ-নির্ভর হয়ে থাকা।

এইজন্য মা যেমন অনেক শিষ্যকে ত্যাগ, তপস্যা, বৈরাগ্যের জন্য উদ্দীপ্ত করছেন, নিজের জীবনের গভীর-কঠোর তপস্যার কথা বারবার শুনিয়েছেন, তেমনি অনেককে বলেছেন, কিছুই করতে হবে না, আমিই সব করব। তাদের দীক্ষা দিয়ে ভার নিয়েছেন। রাত পর্যন্ত অসুস্থ অবস্থাতেও শুয়ে শুয়ে জপ করেছেন তাদের জন্য। সারদা মায়ের জীবনীতেই আছে।

গিরিশবাবুর বকলমা নেওয়া, তা নয়। গিরিশবাবু কি অনেক হয়েছে? বলছেন মায়ের ভৈরব। তাঁর ভক্তি, শ্রদ্ধা, সে জগতে দুর্লভ জিনিস। ঠাকুর মোমবাতি আনতে পাঠিয়েছেন একজনকে তাঁর কাছে। শুনে প্রথমেই হেভি গালাগাল। তারপর ঢিপ ঢিপ ক'রে প্রণাম। ঠাকুরের সন্তান তো রেগে গেছে, বলল, কেন গিরিশবাবুর কাছে মোমবাতি আনতে পাঠিয়েছেন? পরে গিরিশবাবুকে জিজ্ঞেস করলে বলল, তখন রঙে ছিলাম, ঠাকুর মোমবাতি চেয়ে পাঠিয়েছেন শুনে এত আনন্দ হল যে, খুব গালাগাল দিলাম। যত খারাপ হোক, তাঁর সেই ভক্তি-বিশ্বাসে তো খাঁটি ছিল। জীবনের অসহ্য দুঃখেও সে বিশ্বাস আরো উজ্জ্বল।

যোগমায়া

শ্রী শ্রী মায়ের কথা-দ্বিতীয় ভাগ পাঠ প্রসঙ্গে—

☆ রাধু, ঠাকুর যাকে যোগমায়া বললেন, তার ঐরকম অবস্থা হয়েছিল কেন? মা'র কত কষ্টের কারণ হয়েছিল তো।

☆☆ এই যোগমায়া একটা শক্তি, যেটা আশ্রয় করে অবতার বা অবতার-কল্প পুরুষেরা জগতে লীলা করেন। ব্যক্তি-নিরপেক্ষ শক্তি। কখনো কোন মানুষকে আশ্রয় করতে পারে। তাই বলে সেই যোগমায়া, এটা সকলে ভুল করে। অবতারকল্প পুরুষ বা অবতার পুরুষরা যে দিব্য-কর্ম করতে অবতীর্ণ হন বা প্রকাশ হন, তাঁদের সহায়ক হিসাবে বিভিন্ন ধরনের শক্তি কাজ করে। এই শক্তিগুলো কখনো একক ভাবে, কখনো বহু ভাবে, কখনো সামগ্রিক ভাবে বিভিন্ন সত্তা আশ্রয় করে কাজ করে বিচিত্র সব পরিস্থিতির উদ্ভব ক'রে থাকে। এর বাইরে রাধু একটা সাধারণ মেয়ে-পুরো জীবনটাতেই তাই।

তবে কিছু না কিছু প্রভাব বিস্তার করে—যাকে আশ্রয় করেছে তার উপর। শুধু রাধুকেই আশ্রয় করেছে, তা নয়। কোন কোন শাস্ত্রে একে ভূচরী, খেচরী, দিকচরী—এই তিনটে শক্তি হিসাবে বলা হয়েছে, যা ঈশ্বরকল্প পুরুষকে আশ্রয় করে কাজ করে। এই শক্তিগুলো নিরপেক্ষ বা কোন ব্যক্তি বিশেষকে আশ্রয় করে কাজ করতে পারে, একই সঙ্গে উভয় ভাবেই হোতে পারে।

নিরপেক্ষ যখন বলছি, তখন তাঁর কাজের প্রয়োজনে বিভিন্ন ঘটনাগুলো সংগঠিত করছে সামগ্রিক ভাবে। মনে কর কেশববাবু—ঠাকুরের অনুরক্ত হ'ল, তাঁর পত্রিকায় ঠাকুরের সম্বন্ধে লিখল। তখনকার দিনের শিক্ষিত, চরিত্রবান, আদর্শবান ছেলেরা কেশববাবুর মধ্যস্থতায় চলে গেল ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর তো অতটা যাননি, আর কলকাতার মানুষের কাছে অত পরিচিত ছিলেন না। সামগ্রিক একটা পদ্ধতি দেখছি, যাতে কাজ হয়েছে। ঠাকুরের অনেক সন্তানই দেখছি এই ভাবে এসেছে। আর পরবর্তীকালে মাস্টারমশাইকে দেখ—তখনকার দিনের শিক্ষিত, গণ্যমান্য লোক, তিনি প্রকাশ করলেন কথামৃত। সেই কথামৃত পড়ে তখনকার দিনের ছেলেরা স্বামীজীর কাজে মিশনে যোগদান করল। ব্যাপক ভাবে কাজ হচ্ছে। শূন্যে তো কাজ হয় না, মানুষগুলোকে আশ্রয় ক'রে কাজ করেছে। ঠাকুর বলছেন, 'মা, ওকে এক কলা দিলি কেন? ও বুঝেছি, ওতেই হবে'। বিশেষ কোন শক্তিতে কাজ করেছেন। গোলাপ মা, যোগীন মাকে, মা নিজেই বলেছেন, আমার সখী। গোলাপ মায়ের বিচিত্র ভূমিকা আছে। আবার যোগীন মা-তাঁর একান্তই বিশেষ অধ্যাত্ম ভূমিকা পালন করেছেন।

☆ সেদিন পাঠ হল, মা বলছেন, 'গোলাপের এটা শেষ জন্ম'। মায়ের শক্তি হলে শেষ জন্ম আবার কি?

☆☆ ব্যক্তি গোলাপের শেষ জন্ম হতে পারে। মা বলেছেন জয়া-বিজয়া। ব্যক্তি হিসেবে কাজ ক'রে গেছেন। মায়ের শক্তি কি অবলুপ্ত হয়? যখন ইচ্ছে মা আসবেন, তার অংশ আসবে, তার আবেশ আসবে, কাজ ক'রে যাবে।

ভগবান লীলা করলেন-এক সত্তা, তাঁকে ঘিরে দুটো হল—রাধা আর কৃষ্ণ। তাঁকে ঘিরে আবার অষ্টসখী। আস্বাদনের বিচিত্র দিক অষ্ট সখী হয়ে লীলা করলেন, আস্বাদন ছড়িয়ে দিলেন। আবার অষ্টসখী রাধা-কৃষ্ণেই সমাপন। অষ্টসখী বাইরে যেমন, ভেতরেও

তেমন। রাধা-কৃষ্ণের যে লীলা প্রকাশ হচ্ছে, তারই আস্বাদন। ঝুলনলীলা, দোললীলা,- শেষে রাসলীলায় চরম-একীভূত, একাকার একই পরমানন্দের মধ্যে। অষ্টসখী আধিকারিক দিক দিয়ে ছড়িয়ে দিলেন সেই লীলা। রাধা-কৃষ্ণ ঝুলছেন, তাঁদের অষ্টসখী দুলিয়ে দিচ্ছেন। এই দুলিয়ে দেওয়া নিত্যকাল চলছে লীলা-আস্বাদনের পরতে পরতে। ঠিক তেমনি, আদ্যাশক্তি মা, তাঁর অষ্টসখী আছে। কৃষ্ণচন্দ্রের অষ্টসখী একটা, আর এটা আর একটা। আস্বাদন আলাদা। এটা তো নিকুঞ্জলীলা নয়, মা তো শ্মশানবাসী। মায়ের অষ্টসখী ব্রহ্মময়ী মায়ের লীলা আস্বাদন করছে, তথা ছড়িয়ে দিচ্ছে। রামপ্রসাদ যে-মাকে পেয়েছেন, আর কমলাকান্ত যে-মাকে পেয়েছেন, সেও তো আলাদা। প্রত্যেকে রকম রকম না পেলে আমরা এত আস্বাদন পেতাম কি?

প্রত্যেকে যে যার নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন ক'রে যায়। দেখ, যে অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এত বীরত্বের প্রকাশ করেছিলেন, পরবর্তীকালে সেই অর্জুন একটা ধনুক তুলতে পারছেন না। -কত নির্জীব হয়ে গেছে সে। কৃষ্ণলীলার প্রকাশ যে অংশটুকু, সেটা তাকে দিয়ে হয়ে গেছে। এখন অবশ হয়ে গেছেন। তাহলে দেখ, শুধু জনম-মরণ নয়, সেই শক্তি সত্তা যেখানে যতটুকু কাজ করছে, সেখানে স্ফূরণ হচ্ছে, তাতে সেও নিশ্চয় লাভবান হচ্ছে। খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জন্মে জন্মে।

স্বামীজী

চপ, কাটলেটের দোকান হবে, মানে কি? ..দেশটা রজোগুণে ছেয়ে যাবে। আর, রজোগুণে ছেয়ে গেলে রজোগুণের পাপও আসবে। তমো-ভারাক্রান্ত দেশটাকে রজোগুণে তুলে দিলেন—এতবড় একটা যুগান্তকারী মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রেমের সমুদ্র।

তমোগুণ শুধুই মন্দ, আর রজোতে ভালো আর মন্দ মিশিয়ে থাকে। রজোগুণে যে পাপ, সে সমাজে খুবই দেখা যাচ্ছে। মানুষ ভয়ানক ভাবে অসৎ হয়ে গেছে, এ রজোগুণেরই প্রতিক্রিয়া। তিনি তো ভারতবর্ষের মঙ্গল করতেই এসেছিলেন। যে মহান অমোঘ শক্তিতে দেশটাকে তমো থেকে রজোগুণে তুলে দিয়েছেন, সেই শক্তিতেই রজো থেকে সত্ত্বে তুলবেন। এই শক্তি তিনি দিয়ে গিয়েছেন বলেই আমি বিশ্বাস করি। সেই শক্তি শুধু খানিকটা প্রয়োগ করে আর খানিকটা রেখে দিলেন,-তা কি হয়? তিনি বাকিটাও ঠিক করবেন। তাঁর বাণী মিথ্যে হবার নয়। যেসব কথা বলে গিয়েছেন, তাঁর পূতঃ অন্তর্দৃষ্টিতেই বলেছেন, ভবিষ্যৎ বলার শক্তিতে নয়। তিনি জ্যোতিষি ছিলেন না, তিনি ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ ছিলেন। এই অন্তর্দৃষ্টির প্রাখর্যে যে-কথা বলে গিয়েছেন, প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে। সুতরাং এই দেশ আবার সোনার দেশ হবে। তার জন্য যা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, হবে। দেশজুড়ে ভয়ানক দুর্নীতির কোলাহল আর রক্তাক্ত সংঘাত দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে, আর বেড়েই যাবে, যতক্ষণ না এর মধ্যে থেকে যথার্থ শুভ শক্তি জেগে ওঠে। এই সমাজের মধ্যে একেবারে সমুদ্র-মন্থন হচ্ছে। এই ডামাডোলের মধ্যে দিয়ে সেই অমৃত উঠবে।

স্বামীজী

এই যে বিশ্বপ্রেম স্বামীজীর,-আমাদের কাছে সেটাই বড় কথা। স্বামীজীর করুণার কথাটা লক্ষণাক্রান্ত। উপাদানটা অনুভববেদ্য। 'অবতার নাহি বলে আমি অবতার।
লক্ষণ নির্ণয় করি করহ বিচার।।'-চৈ.চৈ.

এখানে কথাটা ঠিক মিলে যাচ্ছে। আবার স্বামীজীর অন্যতম জীবনীকার লুই বার্ক এমন মন্তব্য করেছেন যে-বাইরের প্রচণ্ড আর ব্যাপ্ত জীবনের অন্তরালে তিনি প্রতিটি মানুষের মধ্যে কি অমোঘ সম্ভাবনার শক্তি সঞ্চারিত করেছেন, তা আজ পর্যন্ত তার জীবনীকারদের কাছে অস্ফুট রয়ে গেল।

এমনিতে সকলেই অবতার। কিন্তু যখন মানুষ লোভের মুখে, চাপের মুখে পড়ে, তখন ফুৎকারে সব উড়ে যায়। যে মানুষ, নিজের করতলগত মুক্তিকেও অগ্রাহ্য করছে জগত প্রেমে, সে কি আর যেখানে-সেখানে হবে? ইদানীংকালে তো পথে-ঘাটে বিশ্বপ্রেমিক দেখা যাচ্ছে। নিজের করতলগত মুক্তি নিশ্চয় তারা অগ্রাহ্য করেছে। বিশ্ব-প্রেমে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। একটা ধর্মসভায় গিয়েছিলাম, সেখানে সবাই বলছে,-জগতের মঙ্গল হোক। আমিও বললাম, হোক। মঙ্গল তো হচ্ছে খুব। চলে এলাম। প্রার্থনার দীনতা অহংকারের দাম্ভিকতায় ডুবে গিয়ে আশীর্বাদের প্রেত রূপে দ্যাখা দিয়েছে।

কি সুন্দর মানুষটা এসেছিলেন! নিজের মুক্তির জন্য কতবার প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করতে গেছেন। কত বিনিদ্র রজনী, কত অভুক্ত দিন, আর সব ছাপিয়ে অন্তরের অনির্বাণ আকুলতা। যে মুক্তির জন্য এত মূল্য দিয়েছেন, সেই মুক্তি করায়ত্ত হয়েছে, তারপর তিনিই বলছেন,-'একটা লোকও অমুক্ত থাকলে আমার মুক্তির দরকার নেই'। একি আমরা ধারণা করতে পারব! কত বড়-বড় বুকনি, কিন্তু এক টুকরো সুবিধা যেখানে, সেখানে আমাদের সব কাণ্ডজ্ঞান নস্যাৎ।

এখানে দুটো কথা বলি—পাগড়ি পরা স্বামীজী, তার পাশে এই ছবিটাও মনে রাখতে হবে-পাহাড়ের গুহায়, নির্জনে-নিরালায় ভগবত বিরহে দেহত্যাগ করতে গিয়েছেন প্রায়োপবেশনে। সবটা নিয়েই স্বামীজী। স্বামীজীর সম্পূর্ণতা। অন্য কথা হল, স্বামীজীর পরবর্তী দুজন মহাত্মা সর্ব মুক্তির কথা জোরালো ভাষায় বলে গেছেন। এবং এর আগে এ ধরনের ভাবনা ছিল না এমন কথাও। কিন্তু স্বামীজী দীনতার পরাকাষ্ঠায়, অন্তরের বেদনায় যে বলেছেন-একজন মানুষও বদ্ধ থাকতে আমার মুক্তি নেই-এর চেয়ে অখণ্ড মহাযোগ আর কি হতে পারে?

স্বামীজী ঘুম বলে কিছু জানতেন না। যখন শুয়ে থাকতেন তখন দেখতে পেতেন একটা জ্যোতির্পিণ্ড বড় হ'তে হ'তে ফেটে গেল,..তারপর আপনহারা হয়ে গেলেন! কোন গুরু ভাই একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি উপুড় হয়ে শুয়েছ কেন? তখন তিনি বলছেন,-'যদি একটু ঘুম হয়'। চিৎ হয়ে শুলেই ঐ অবস্থা! শিশুকাল থেকেই। তিনি অখণ্ডের জ্যোতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। অখণ্ডের স্ফুট! তাঁর আবার কাম কি! তাঁর কাম জগতের লোককে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। —হে জীব, এই ঘৃণিত তুচ্ছ জীবন থেকে মুক্ত হয়ে পরমার্থে প্রতিষ্ঠিত হও। এটা বুঝতে হবে। স্বামীজীরও কাম ছিল বলে দাঁত বার করলে

হবে না। আর এই ভদ্রলোক, বুড়ো লোক বলছে-কাম যায় নি! তার মধ্যে অন্তত সেইটুকু সততা আছে।

অন্তর-ক্ষেত্রে যে মোহ-মায়া, তারই বাইরের প্রকাশ কাম। এ নেই-বললে হবে না, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ, সমস্ত জীবেরই আছে, কোন না কোন ভাবে প্রকাশ হচ্ছে। সমস্ত সৃষ্টিই এই কামের অধীন। একমাত্র যে সমস্ত অন্তর থেকে মুক্ত হতে চায়, সে তৎক্ষণাৎই মুক্ত হয়। যে সমস্ত অন্তর থেকে ঘৃণা করবে,-না, এসব বাজে, তুচ্ছ জিনিস,-সে তদ্দণ্ডেই মুক্ত হবে এবং এই জীবনে সহজ, প্রশান্ত জীবন পাবে। কিন্তু এই ঘৃণা হওয়াই খুব বড় কথা। মহাজনরা ইচ্ছামাত্রই করে দিতে পারেন। কিন্তু এমনই বিধির বিধান যে, সে উল্টে বলবে,-আমি বাঁচব কি ক'রে? কি নিয়ে? ঠাকুর মথুরবাবুকে করে দিয়েছিলেন। সে বলেছে, আমি বাঁচব কি করে? এ শুধু মথুরবাবু নয়, চিরকালই চলে আসছে। কারণ, এটা অন্তরেরই সামগ্রিক অপবিত্রতার প্রকাশ। অন্তর যদি পবিত্র না হয়, এসব তো থেকেই যাবে।

মানুষের মন চায় সবসময় ক্ষুদ্র, তুচ্ছ কিছু ধরে থাকতে। সেই একটা গান আছে রবিবাবুর—

'তীর যদি আর না যায় দেখা, তোমার আমি হব একা,
দিশাহারা সেই অকূলে—আমায় মুক্তি যদি দাও'।

এই 'দিশাহারা অকূল'—অসীম, ছোট আধার সহ্য করতে পারে না। আমি মাইথনে গেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁধের ধারে বসে থাকতাম। অনেকের কষ্ট হোত, বলত—চলে আসুন, চলে আসুন। বলতাম, বসুন না খানিকক্ষণ—জবরদস্তি। খানিকক্ষণ বসার পর বলে, —না, অত খারাপ লাগছে না। এই যে বিশাল ব্যপারটা, মানুষ ভয় পায়, হারিয়ে যাবার ভয়। তার চেয়ে এক কোণে একটা চেয়ার, টেবিল, একটা কিছু ধরার মত মনের অবলম্বন মানুষ চায়—খোঁজে। তাকে যদি বড়, খুব একটা ব্যাপ্তির কথা বল, তার হারিয়ে যাবার ভয় হয়। এই ছোট্ট আমিটা হারিয়ে যাচ্ছে। মাস্টারমশাইকে কেউ বলছে, কি ভালো লাগে? মাস্টারমশাই বলছেন, খুব ভালো লাগে আকাশ দেখতে। এই আকাশ দেখতে অনেকে ভয় পায়—বিশাল আকাশ। সমুদ্র দেখেও ভয় পায়। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে, গল্প নিয়ে বসে আছে, সে ভালো। কিন্তু একা যেন গ্রাস করে ফেলে। মানুষ এই বালুকাকণাগুলো, প্রতি মুহূর্তে ভেসে-হারিয়ে যাবার ভয়। তাই না? তাই সে ক্ষুদ্রতাকে ধরে থাকতে এত ভালোবাসে।

বাউলের দল

☆ ঠাকুর বলেছিলেন, 'বাউলের দল এল, নাচল-গাইল ফিরে গেল, কেউ চিনতে পারল না। কিন্তু তা তো হয় নি, প্রচুর লোকে জেনেছে বাউল বলতেও বিশেষ কিছু—

☆☆ অবতারপুরুষ যখন আসেন,-একটা প্রত্যক্ষ লীলার প্রয়োজন থাকে, আর একটা পরোক্ষ লীলার প্রয়োজন। এই প্রত্যক্ষ লীলার প্রয়োজনে তিনি ঠিক যাদের আনার, তাদের সঙ্গে করে আনেন,-তাদের সঙ্গে আনন্দ ক'রে চলে যান, সাধারণ লোকে তাঁকে জানতে, চিনতে পারে না। এই অবতারপুরুষরা যখন আসেন, তখন তাঁকে ঘিরে একটা রহস্যের

সৃষ্টি থাকে, খেলা থাকে। কিন্তু তাঁর অন্তর্ধানের পর তাঁর মহিমা ক্রমশই ছড়াতে থাকে, দিগন্ত-ব্যাপ্ত হয়। এটা প্রত্যেক অবতারপুরুষের লীলার বৈশিষ্ট্য। এই জন্য অবতার লীলাকে বাউলের দল হিসাবে বলেছেন। বাউলের দল আসে, আপন মনে নাচে, গায়, চলে যায়। পরে তাদের কথা লোকমুখে রাষ্ট্র হয়—একটা দল এসেছিল, নেচেছিল, গেয়েছিল, আহা। সেই-কথাই আমার মনে হয় ঠাকুর বলেছেন। চলে যাবার পর তো তাঁর নাম ছড়িয়ে যাচ্ছে। আবার উল্টোটাও দেখ,—তখনকার দিনে অনেক মহাজন, যাদের নাম বিশালভাবে ছড়িয়ে গিয়েছিল, আস্তে আস্তে তাদের নাম তো হারিয়ে যাচ্ছে।

বাউল কথাটা হচ্ছে,—'বায়ু'-তে 'ল' প্রত্যয়। যারা বায়ু নিয়ে কারবার করে বা যারা বায়ুজয়ী। ঠাকুর বলছেন যে, আর একজনকে মরার খবর দিল,—সে যদি আপনজন না হয় তাহলে বলবে—তাই তো, তাই তো। আর যদি আপনজন হয়, তাহলে 'অ্যাঁ।' বলে বসে পড়ে। তা, এই হচ্ছে কথা। ভগবানের ভাবে সাধক গভীর ভাবে ডুবে যায়। যতই ডুবে যায়, ততই সে নিঃশ্বাস-এর প্রক্রিয়া থেকে পার হতে থাকে। এটা তো স্বাভাবিক,-মানুষ যত নিবিষ্ট হয়, ততই তার নিঃশ্বাস স্থির হয়ে আসে।

এখন, ঠাকুর এবং ঠাকুরের সন্তানরা পরমার্থের দল তো, সেইজন্য তাঁদের বাউলের দল বলা হয়েছে। এটা বিশেষ মানে। পরমার্থের দল, সেই হিসাবে বাউলের দল।

কাশীপুরে ঠাকুর নরেনকে একটা কথা বলেছেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ,—তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়'। তা, বাউলরা হচ্ছে মরমিয়া, অর্থাৎ লীলাবাদী,—মিস্টিক যাকে বলে ইংরেজিতে। ভগবানকে প্রেমসুন্দর-আনন্দ কলেবর বলে বর্ণনা করে, সেইরকম ভাবনা ভাবে,—তাঁর সঙ্গে বিরহ-মিলনের টানা-পোড়েনেই তাদের অলোকসামান্য জীবন ছড়িয়ে থাকে। নিজেরা সেই আনন্দে বিভোর থাকে। অবতার লীলাময় বিগ্রহ-তাঁকে যোগীর দল বলা যাবে না, জ্ঞানীর দলও বলা যাবে না। অবতার তো লীলা আস্বাদন করতেই আসেন, তাঁর অন্তরঙ্গ অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গেদের সঙ্গে। সেই জন্য অবতারের দল বাউলের দল।

দেববাণী

'দেববাণীর' ভূমিকায় আছে। স্বামীজী যখন ক্রমাগত বক্তৃতা দিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করলেন, তখনই তিনি সহস্র দ্বীপোদ্যানে বিশ্রাম লাভার্থে অবস্থান করছিলেন। তখন কয়েকজন তাঁর কাছে কিছুকাল ধ্যানের এবং আধ্যাত্মিক বিষয়-সমূহ জানবার জন্য একত্র হয়েছিল এবং সেই হিসাবে সেই রূপে তাঁকে পেয়েছে—তৎকালীন যে-সব ভাষণ দেন, ইত্যাদি। এটা একটা দিক।

বস্তুতপক্ষে ক্রমাগত মিশনারি বিরোধিতার উত্তর দিতে গিয়ে এবং বক্তৃতা সফরে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিভ্রমণের সময় তিনি এরই তলে তলে যতখানি সম্ভব আধ্যাত্মিক প্রভাব ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। যারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল, তাদের জন্য আরও গভীর ভাবে কাজ করার একান্ত প্রয়োজন স্বামীজী অনুভব করেছিলেন। সম্ভবত এই কারণেই তিনি এই বিশ্রামের অছিলায় থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কের নির্জনতার মধ্যে চলে গিয়েছিলেন। এই বইটার নামই দিয়েছে—'ইন্সপায়ার্ড টক্স'। কাজেই, তিনি বিশেষ অনুপ্রেরণাবশত

কাজটি করেছিলেন। যিনি এসব লিখে গেছেন, তিনি এই নামের মধ্যেই তা প্রকাশ করেছেন। যদিও স্বামীজী আলাদা ক'রে বিজ্ঞাপন দিয়ে এরকমটা করেন নি, করার প্রয়োজনও ছিল না। তাহলেও এটা বুঝতে হবে, আদিষ্টভাবে এই জগতের কল্যাণের জন্য যিনি অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি যখন হঠাৎ এই ব্যাপক কার্যক্রমের জীবন থেকে একান্ত জীবনে সরে গেছেন, তাঁর গূঢ় অভিপ্রায় নিশ্চয়ই সেখানে ছিল এবং বাইরের কাজের চেয়ে তাঁর অন্তরের গভীরতর প্রেরণায় যাদের তিনি তাঁর দৈবী শক্তিতে আকর্ষণ করেছেন, শুধু তারাই সেখানে ছুটে গিয়েছিল। এটা ভাবাই যথাযথ হবে। তিনি অলৌকিক ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রয়োজনও অলৌকিক। কাজেই অন্তর-ক্ষেত্রে যাদের প্রেরণা দিয়েছেন,- তারা জানতে-অজানতে, ঠিকানা জেনে না জেনে, যে ভাবেই হোক তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছিল। এটা তৎকালীন প্রয়োজন সাপেক্ষে যেমন, চিরন্তন প্রয়োজন সাপেক্ষে আরও বেশি বলা যেতে পারে। কেননা, সহস্র দ্বীপোদ্যানে তিনি যা বলে গিয়েছেন, আজ সহস্র মানুষ সেই অনুপ্রেরণা পাচ্ছে।

আর একটা হচ্ছে, এই সময় তিনি কল্যাণ ভাবনার ব্যস্ততার জীবন থেকে গভীরতর অন্তর-জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। বলা-বাহুল্য সেটাও তাঁর নিজের সমাধি সুখের জন্য নয়, জগতের কল্যাণেরই জন্য। তিনি এই সময় আত্মনিমগ্ন ভাবে অধিকারী শিষ্যদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করা ছাড়াও বাকি সময় যে একাকী গভীর সমাধিমগ্ন হয়ে কাটিয়েছেন, সেইগুলো সামগ্রিক জনমানসে তাঁর গভীরতর আত্মিক-প্রেরণা সঞ্চার করেছে। এবং, এই অমোঘ শক্তি সঞ্চার করার জন্যই তিনি এরকম একটা জায়গায় চলে গিয়েছিলেন। এটা মনে করাই যথাযথ বলে আমার মনে হয়!

স্বামীজী যতবারই এইরকম একান্ত জীবনে চলে গেছেন, তখনই এই ধরনের মহান জিনিস আমরা পেয়েছি। আরও পেতে পারতাম, যদি—স্বামীজী যখন ক্ষির-ভবানী, অমরনাথ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন এবং গভীর ধ্যান-তন্ময়তার মধ্যে কাটিয়েছেন-সেসব পেতাম। কিন্তু এই ধরনের, দেববাণীর মতো বিশেষ সম্পদ আমরা তাঁর কাছ থেকে পাইনি। তার কারণ হিসাবে নিবেদিতা একটা কথা বলেছিলেন যে, যদিও তিনি নিরন্তর গভীর ভাবে দিব্য-জীবনের মধ্যে প্রবিষ্ট ছিলেন, তবুও এই ধরনের কিছু লেখা সম্ভব হয়নি, কেননা আমরা সবসময় চেষ্টা করতাম হালকা ছোটখাটো কথার মধ্যে দিয়ে তাঁর মনকে নীচের ভূমিতে নামিয়ে রাখার। কারণ, স্বামীজীর মন তখন নির্বাণ প্রয়াসী ব্যাকুলতার মধ্যে বিরাজ করছিল। কাজেই সেক্ষেত্রে এই ধরনের অনুপ্রেরণার কথা লেখা সম্ভব হয়নি। নিবেদিতার অসামান্য বিবরণাত্মক বর্ণনা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করলেও, দেববাণীর আলোকে এটা আজকে আমাদের ভাবনায় আসে-তাহলে হয়ত আরও কত জিনিস পেতাম। যদিও সেই ভাবতন্ময়তার টুকরো-টুকরো ছবি দুটো-একটা যা আমরা পাই, তা থেকেই যথেষ্ট প্রেরণা পাই। কিন্তু আক্ষরিক ভাবে তাঁর দিব্য জীবনের যেসমস্ত কথাবার্তা-অনুপ্রেরণামূলক, তার জন্য আমাদের মিস ওয়ালডোর পরিবেশন করা এই 'দেববাণী'র দ্বারস্থ হতে হবে।

দেববাণী

পুলিশ অন্যায়ের শাস্তি দেয়। কিন্তু পুলিশের কাজ আর ভগবানের কাজ তো এক নয়। ভগবানের উদ্দেশ্য—সরিয়ে সরিয়ে তার অন্তর পবিত্র করা। যেমন একদিকে প্রলোভন আছে, অন্য দিকে সৎ কাজের প্রবৃত্তি আছে, তেমনি ভগবান চান আস্তে আস্তে তার প্রলোভন কাটাতে, তার মধ্যে আরও সৎ-ভাব জাগাতে। ভগবান অন্তর পবিত্র করতে চান। এ কাজ ভগবান ধীরে ধীরে করছেন। বাইরের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থায় এ কাজ সম্ভব নয়।

দেববাণীতে স্বামীজী বলছেন, যে সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার-তিরস্কার পায় তার প্রতি শ্রীভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ। এ ক্ষেত্রে এটাই বুঝতে হবে, পুরস্কার-তিরস্কারের আপাত দিকটা ছাপিয়ে সেই অনুগৃহীত ব্যক্তির প্রতি ভগবান প্রয়োজনীয় চেতনার সঞ্চার করেন যাতে সে বুঝতে পারে কাজটা কেন বা কতদূর ঠিক বা বেঠিক হয়েছে। আর এটাও বলা যায় তার দিক থেকে সেই গ্রহণ সামর্থটুকু থাকে। অসৎ কাজের শাস্তি সে মাথা পেতে নিতে পারে, শ্রী ভগবানের অনুগ্রহ বলে।

রূপকথা

শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের কাছে রূপকথার গল্প শুনিয়েছিলেন। কিরকম রূপকথা? বলছেন যে, সমুদ্রের অতল গভীরে এক ঝিনুক থাকে। সে কখনো জলের উপরে ভেসে ওঠে স্বাতী নক্ষত্রের জলের জন্য। সেই জলের এক বিন্দু পেলে আবার ডুবে যায়, অনেক যত্ন করে সে রত্ন তৈরী করে। বাস্তবিক সমাজ-সংসারে ঝিনুকের ছড়াছড়ি। কিন্তু সেই ঝিনুক পাওয়া যায় না, যাতে মুক্তো হয়। এমন মানুষও থাকে সংসারের হাজার সুখ-দুঃখের জলের মধ্যে থেকেও তাদের তৃষ্ণা যায় না। তাদের মধ্যে অমিত পিপাসা জেগে ওঠে। কিসের জন্য? এত জল যাকে তৃপ্তি দিতে পারে না, কোন সেই জল যা তাকে তৃপ্তি দেয়? স্বাতী নক্ষত্রের এক বিন্দু জল। সেই এক বিন্দু জল গ্রহণ করে সে আপনার অন্তরে সাধন-সমুদ্রের গভীরে ডুব দেয়, রত্ন তৈরী করে।

সচ্চিদানন্দ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ যেন সেই স্বাতী নক্ষত্র, আর তাঁর করুণা-কণা সেই স্বাতী নক্ষত্রের এক বিন্দু জল, যা নিয়ে এই পৃথিবীর কিছু মানুষ রত্ন তৈরী করার সাধনায় ডুব দ্যায়। এই আমাদের চিরন্তন ইতিহাস,-আধ্যাত্মিকতার তথা সনাতন ঐতিহ্যের।

সচ্চিদানন্দ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ আরও শুদ্ধতর অধিকারের কথা ব্যক্ত করেছেন তাঁর শ্রীমুখে। বলেছেন, আকাশে থাকে এক রকমের পাখী, তার নাম হোমা। সে আকাশেই ডিম দেয়। সেই ডিম পড়তে পড়তে আকাশেই ফেটে যায়, তার থেকে বাচ্চা বের হয়। সেই বাচ্চা পড়তে পড়তে দেখে এত নিচে মাটিতে পড়লে তো মারা যাব। তখন সে আবার চোঁ-চাঁ দৌড় দেয় তার মায়ের কাছে—নিঃসীম আকাশে আনন্দে ভাসতে থাকে।

বাস্তবিক এমন শুদ্ধতর আধার এই জগতে আসে—যতই বিরল হোক। তারা যুগে যুগে কালে কালে আসে—যাদের অন্তরে এই পৃথিবীর ধূলিকণা স্পর্শ করার দুর্যোগটুকু পায় না। তারা বেদাগ মল্লিকা ফুল—ঠাকুরের ভাষায় সূর্যোদয়ের আগে তোলা মাখন। যখনই তারা সজাগ, সচেতন হয়, তখনই মায়ের কাছে দৌড়ে যায়—চোঁ-চাঁ, মা ছাড়া

তাদের চলবে না। এমন মানুষও তো আসে—ঠাকুর এসেছিলেন, সেই সুযোগে আমরা তাদের দেখতে পেয়েছি, জানতে পেরেছি, তাদের ছবি দেখছি।

অবোধ কিছু মানুষ, যারা জ্ঞান বা পাণ্ডিত্যের অভিমান করে, তারা তাদের ক্ষুদ্রতায় প্রশ্ন করে, তাদের অপরিসীম অজ্ঞতাকে প্রকাশ করে বলে—মুক্তো তৈরী করতে তো স্বাতী নক্ষত্রের জল লাগে না। কই, এমন কোন হোমা পাখীর কথা তো শোনা যায় না। কিন্তু, এটা যাদের জন্য বলা, তারা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে—এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের মজা। এই শ্রীরামকৃষ্ণের রূপকথা।

ভাবময় তনু শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর প্রতিটি কথাই ভাবে ভরা। তিনি এই মাটির পুতুল হয়েও অলখ- নিরঞ্জন। তাঁর কথা বুঝতে গেলে তাঁর মনের মানুষের দরকার।

মহাশক্তির অবতরণ

ভগবান বা ভগবত স্বরূপের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে মহাশক্তির অবতরণ হয়, তা তাঁর অপ্রকট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় না। মোটামুটি যারা লীলাবাদী, তারা শ্রীভগবানের অবতরণ বলে। আর যারা যোগমার্গী, তারা ব্রহ্মস্বরূপের অবতরণ বা ব্রহ্মাবতার বলে। তাই যখনই একটা মহাশক্তির অবতরণ হয়, তা সিদ্ধপুরুষের প্রকাশের যে শক্তি, তার চেয়ে মহত্তর, গভীর এবং ব্যাপক অবতরণের শক্তি প্রকাশিত হয়। এই অবতরণের শক্তি সেই অবতারকে ঘিরে সূক্ষ্ম বা স্থূল ভাবে যা হয়, শুধু যে সেই অবতীর্ণ পুরুষকে কেন্দ্র করেই শেষ হয়ে গেল, তা নয়। সেই শক্তি বিভিন্ন শুদ্ধতর আধারকে আশ্রয় ক'রে সফল হ'তে থাকে। তেমনিই লীলা-প্রসঙ্গ করেছে চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যলীলায়। আবেশ, আবির্ভাব আর প্রকাশ, তিনটে। এর মধ্যে আবার ভাগবতশাস্ত্র অংশ, কলা-র বিস্তার করেছে।

কোন সিদ্ধপুরুষ বা কোন শুদ্ধ আধার আশ্রয় ক'রে প্রকাশ হচ্ছেন এবং তিনি অভিষ্ট মঙ্গলকর্ম ক'রে যাচ্ছেন—এ হচ্ছে আবেশ, যেমন নকুড় ব্রহ্মচারী। দ্বিতীয় বলছে,—সামগ্রিক ভাবে যে তার জীবনটা, তার শরীরটা ধ'রে প্রকাশ হচ্ছেন তা নয়, ক্ষণিকের জন্য কোন বিশেষ লীলায়, ভাবের গভীরতায় প্রকাশ হচ্ছে, এইজন্য বলছে আবির্ভাব। এই প্রদ্যুম্ন মিশ্রর কথা বলা হয়েছে। আর তৃতীয় বলছে প্রকাশ। মুহূর্তের জন্য বা খুব অল্প ক্ষণের জন্য কখনো-সখনো কোথাও ঝটিতি প্রকাশ হয়েই মিলিয়ে যাচ্ছেন। যেমন বলেছে শচী মায়ের মন্দিরে, নিত্যানন্দের নর্তনে, শ্রীবাসের কীর্তনে, রাঘবের ভবনে। এসব জায়গায় ঝটিতি তাঁর প্রকাশ হচ্ছে। নিত্যানন্দের নর্তনে-কীর্তনে কেমন প্রকাশ হচ্ছেন, তার কেমন সুন্দর বর্ণনা করেছেন বৈষ্ণব মহাজনরা।

'মেঘেতে উদয় বিদ্যুতের প্রকাশ যৈছে।
সংকীর্তন মাঝে প্রভু প্রকটয় তৈছে।।'

তাঁর আবির্ভাব দর্শন করছে কোন কোন ভাগ্যবান। আর তাঁর আবির্ভাবের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে সব জায়গায়, সবার মধ্যে। এই ভাবে সেই মহাশক্তির প্রকাশ। আবেশ-জীবনজোড়া, আবির্ভাব—কিছু সময়ের জন্য, আর প্রকাশ—ক্ষণিকের জন্য। এই ভাবে মহাশক্তি তাঁর নিজের কাজ করে যায়। এমনই মঙ্গল করুণা।

এই গুলোকে ভক্তিশাস্ত্রে, ভাগবতাদি শাস্ত্রে বহুতর বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেছে। আজকের দিনে যেন মানতে দ্বিধাগ্রস্থ হই। কিন্তু আজকের দিনের লীলা বলে পরিচিত, আজকের দিনের মানুষ এইগুলো লিখে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলার দিকে যদি দৃক্‌পাত করি, তাহলে তার যথার্থ গ্রহণযোগ্যতা দেখতে পাব। লোকমাতা নিবেদিতায় দেখি স্বামী বিবেকানন্দ, নিবেদিতা এবং সারা বুলের মাথা স্পর্শ করে বলছেন,—'এক নারীর কাছ থেকে যা পেয়েছিলাম, আজকে এই দুই নারীকে তা দিয়ে গেলাম'। এই এক নারী বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ বা আদ্যাশক্তি মহাকালীকে বুঝিয়েছেন। সেই মহাশক্তির দায় নিবেদিতা জীবনভোর বহন করেছেন। অপর দিকে দেখতে পাই নিবেদিতার সপ্রেম সেবা, সারদা মায়ের কাছে প্রার্থনা একদিকে চলছে, আর একদিকে সারা বুলের অসুস্থ অবস্থা। স্বামীজী যখন দান করেছিলেন, তখন তাদের কাছে বিপুল একটা আশা নিশ্চয় করেছিলেন যে, সেই মহাশক্তি তাদের জীবনে বিশাল ভাবে ক্রিয়াশীল হবে। আর লোকমাতা নিবেদিতার মধ্যে তার বিস্তীর্ণ মহান প্রকাশ আমরা দেখেছি। একই ভাবে 'যুগনায়ক বিবেকানন্দে' দেখি স্বামীজী পূর্ববঙ্গে বিরজানন্দ প্রকাশানন্দকে পাঠাবার সময় বলছেন—'আমি তোদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করব—ঠাকুর তোদের সঙ্গে থাকবে'। একই শক্তির ক্রমবিন্যস্ত সঞ্চার। আরো উত্তরে যদি যাই, ঠাকুর বলছেন স্বামীজীকে,—'আজ তোকে সব দিয়ে ফকির হলাম'। আবার সারদা মা দেখছেন ঠাকুরের শরীর স্বামীজীর শরীরে মিশে গেল। এই যে বিভিন্ন রকমের প্রবেশ, আবেশ ইত্যাদি, এগুলো বিচিত্র ভাবে এবং বিপুল ধারায় ফলবতী হয়েছে।

বলতে পার স্থূল আবেশ ইত্যাদি যে মানুষের শরীরে দেখা যায়, সেইগুলোর সঙ্গে এইগুলোর ফারাক কি? এই প্রসঙ্গটা এইজন্য তুললাম যে, আমি একটা অন্য দিকে যাব। এই আবেশ, আবির্ভাব, প্রকাশ—মহাশক্তির অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে ধারাবাহিক ভাবে চলে। শুদ্ধতর আধাব খুঁজে খুঁজে বেড়ায়—কে কোথায় সেটা কতটা নিতে পারবে। চাঁদের আলো যেমন সফল হয়, সন্ধ্যায় ফোটা সাদা ফুলগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনি মহাশক্তি তার আপন আকুলতায়, কল্যাণ ইচ্ছায় সম্ভাব্য স্থান খুঁজে ফেরে। এখন, যে আধারের ক্ষেত্রে এমন মহাশক্তির সঞ্চারণ হয়, সেটা কোন জড় জিনিস নয়, এটা চেতনার এবং সেই সঙ্গে মহাশক্তির এবং প্রেমের অবতরণ। শক্তির সঙ্গে চেতনা যুক্ত থাকে। কাজেই, যে আধারে অর্পিত হল, সেই আধারের মহা দায় হল—নিজের তপস্যা এবং সমর্পণের মধ্যে দিয়ে সেই মহা সম্ভাবনাকে প্রস্ফুটিত করে তোলা, সেই শক্তিকে আত্মস্থ বা আত্মীকরণ করা, নিজের চেতনার সঙ্গে একীভূত করে নিজের রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করা। তাহলেই সেই শক্তি পূর্ণ-জ্ঞান-সহিত সম্পূর্ণ সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়।

যেখানে এর কম হয়, সেখানে তা একদেশদর্শী হয়ে যায়। আবার কোথাও হয়ত ফুটল না, আধারকে ভেঙেচুরে একাকার করল। কোথাও হয়ত ফুটল, কিন্তু যথার্থ ফুটল না, একটা বিশেষ ভাবে তা প্রকাশ হল। কাজেই অবতরণ যেমন স্থান-কাল-পাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে, তেমনি যেখানে অবতীর্ণ হচ্ছেন, সেই সমস্ত আধারেরও মহা দায় থাকে সেই চেতনায় চেতনামৃত হওয়ার। তবেই যথার্থ এই জিনিস তার যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে প্রকাশ হতে পারে।

আবার যেখানে সফল, সেখানে একদিকে যেমন জগতের কাজ হল, অন্যদিকে সেই আধারটাও তো উন্নত হল। তার যে নির্দিষ্ট স্তর ছিল, সেই স্তর অতিক্রম করে গেল। এ বড় ভাগ্যের কথা। স্বামীজী অভেদানন্দকে শক্তিপাত করেছিলেন। ঠাকুর বললেন, 'ওর গর্ভপাত হল। যাক্ ওর ভাগ্য ভালো'। যে পরিণতির দিকে যাচ্ছিল, সেটা ক্ষুন্ন হ'ল। কিন্তু আরও উচ্চতর পরিণতির দিকে চলে গেল। ক্রমে অভেদানন্দের মানসলোকে মহা-ঝড় আরম্ভ হ'ল, কিছুদিনের জন্য তিনি নাস্তিক হয়ে গেলেন। এটা থেকে ওটা ধরতে সময় নিচ্ছে, এটা মহৎ জীবনের থেকে মহত্তর জীবনে উত্তীর্ণ হতে সময় নিচ্ছে। তাঁর অন্তর্জীবনের কথা বলছি। তারপর সেটা সফল হয়ে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনকে বহু দূর প্রসারিত করেছে।

মনে রাখতে হবে—এটা কোন জড় অবতরণ নয়, এটা চেতনার অবতরণ। কাজেই আত্মীকরণটা খুব বড় কথা।

হাতের ওজন দেখা

শিবানন্দ মহারাজের একজন শিষ্য এসেছে তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে। তিনি বললেন, 'তোমার হাতটা দেখি'। হাতের ওজন দেখে বললেন,—'ঠিক আছে, কালকে এস'। পরের দিন দীক্ষা দিলেন।

ঠাকুর এরকম দেখতেন। হাতটা নিয়ে স্পর্শ করে কিছু বুঝতেন। সাধারণ লোক মনে করবে হাতের ওজন দেখছেন। ওঁনাদের মত মানুষ স্পর্শ না করেই বুঝতে পারেন। যেখানে সত্তাটা খুব বেশি ছড়িয়ে থাকে, সেখানে একক সত্তা কেন্দ্রীভূত করতে পারছেন না, সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিকে স্পর্শ করে তাঁর ব্যাপ্ত সচেতনতা সঙ্কুচিত—কেন্দ্রীভূত করে বুঝতে পারেন বা জেনে নেন তার অবস্থা। একমাত্র আত্মিক সচেতনতায় সব কিছু জানা যায়।

স্বামীজী স্তব্ধ হয়ে আছেন। কোন কিছুতেই মন দিতে পারছেন না। তখন সবাই মনে করল, শরৎ চক্রবর্তীকে তো ভালোবাসেন, তাকে তাঁর সামনে পাঠালে তার সম্বন্ধে যদি মনটা আস্তে আস্তে লাগে, তাহলে সমস্ত মনটাই খানিকটা নেবে আসবে। এই মনে ক'রে তারা শরৎ চক্রবর্তীকে স্বামীজীর কাছে পাঠিয়ে দিল। এই লাগা বা নাবা সাধারণ অর্থে নয় তো। সেইরকম এইগুলো ধারণা করাই মুশকিল। মনে কর—জলের তলায় কি আছে সেটা যখন দেখছ, তখন জলের উপরে কি কুটো ভাসছে সেটা তো তোমার দৃষ্টিতে পড়বে না। সেটা দেখতে গেলে চোখটাকে সামলাতে হবে। একটা উপমা দিলাম। উপমা তো সর্বাত্মক হয় না।

হাত ভারী বা হাল্কা লৌকিক ভাবে বলেছেন। তার মধ্যে যেটা অলৌকিক, সেটা তো ঠাকুর বড় একটা প্রকাশ করতেন না। 'বীরভূমের বামুন মুই, কে জানে তোর গাঁই-গুঁই।' এই হচ্ছে ঠাকুরের কথা। নিজেই তো বলেছেন, কাঁচের সার্সী দেওয়া আলমারির ভেতরে যেমন দেখা যায়, তেমনি আমি বুঝতে পারি। তার আবার হাতের ওজন নেওয়া।'

প্রশ্ন ঠিক ঠিক করলে উত্তরটাও ঠিক ঠিক আসবে। উত্তরটাও তিনিই দিচ্ছেন। এক

সর্বাত্মক চেতনা-প্রশ্ন হয়ে জেগে উঠে, উত্তরে বিশ্রান্তি লাভ করছে। তারই প্রকাশ-প্রতিষ্ঠা। চণ্ডীতে আছে ব্যাপ্ত চৈতন্য আর একক চৈতন্যের কথা। ব্যাপ্ত চৈতন্য বারবার একক চৈতন্যকে প্রসারিত হবার আহ্বান জানাচ্ছে। আন্তরিক না হলে সেই উত্তরটাও ভালো হবে না। শাস্ত্র বলছেন,—আশ্চর্য সেই প্রশ্নকর্তা, আশ্চর্য সেই উত্তরদাতা, আশ্চর্য সেই শ্রোতা, আশ্চর্য সেই বিষয়। কেমন সুন্দর কথা। শঙ্করাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন—আশ্চর্য অর্থে দুর্লভ।

ঠাকুর-দেবতা

☆ 'মায়ের কথা'-তে মা বলছেন—'ঈশ্বর-টিশ্বর কিছু নেই, জ্ঞান হলে ঠাকুর-দেবতা সব মায়া'।

☆☆ যে কোনদিন সাগর দেখেনি, তার কাছে হাজার সাগরের বর্ণনা কর, সবটাই কিন্তু মায়া। তোমার কাছে কল্পনা মাত্র। যদি সাগর দেখে আসো, তাহলে এসব বর্ণনা পড়ে থাকবে, কোন বর্ণনারই আর দরকার নেই। তেমনি ভগবান হচ্ছে সেই জিনিস—মানুষের সমস্ত কল্পনার পার। মানুষ ভগবান সম্বন্ধে যত ভাবনাই ভাবুক, যখন উপলব্ধি করবে সেটা আলাদা। সেটা বর্ণনার মধ্যে নয়। বর্ণনা সবই তো মায়িক জগত-নিষ্ঠ। ঈশ্বর-বস্তু মায়ার পার, বর্ণনা সব পড়ে থাকে সেখানে। বর্ণনা তো সেই বস্তুকে প্রকাশ করতে পারে না। উপনিষদে আছে—মনই সেখানে যেতে পারে না, বাক্য আর কি করবে? মা বলছেন, ঈশ্বর-টিশ্বর সব মায়া, জ্ঞান হলে বলেছেন। জ্ঞান হবার আগে শুদ্ধ মায়া, তাকে আশ্রয় করে সাধক এগোয়। এইজন্য ঠাকুরের অনেক প্রার্থনার মধ্যে একট মজার প্রার্থনা আছে—'হে ভগবান, তুমি কেমন আমাদের জানিয়ে দাও'। খুব সুন্দর কথা। সেইজন্য ঠাকুর বলেছেন—সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে, ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয়নি। উচ্ছিষ্ট অর্থে কেউ তা প্রকাশ করতে পারেনি। আবার—আমার অবস্থা বেদান্তের পার, বলেছেন। অর্থাৎ বেদ-বেদান্ত যা বর্ণনা করেছে সেটা তো সব আপেক্ষিক বর্ণনা, মায়িক বর্ণনা, এর পারে সেই বস্তু। বেদ, বেদান্তে নেই আবার আছে। এই একটা কথা বুঝতে পারলে এসব কথাগুলো বোঝা যাবে। ঠাকুরের কথা আছে—জ্ঞান কাঁটা দিয়ে অজ্ঞান কাঁটা তোল, তারপর জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যাও। সব একটাই কথা। একটা শুদ্ধ মায়া আশ্রয় করে সাধনা। তারপর শুদ্ধ-অশুদ্ধ মায়া, দুটোরই পারে যাবে।

অসতের মা

আশু দীর্ঘ বছর ধরে মায়ের একান্ত সেবা করেছে। সেই আশুর কিছু অন্যায় আচরণে তাকে চলে যেতে হবে। আশুবাবু লিখছেন-'মা সারাদিন খেতে পারেননি, কেঁদে কেঁদে মুখ ফুলে গেছে। তবুও বলছেন, 'তোমাকে চলে যেতে হবে। তুমি আমার সন্তানই রইলে। তবু তোমাকে চলে যেতে হবে।' আশুবাবু আত্মজীবনী প্রকাশ করেছেন। উদ্বোধনে মায়ের সেবক ছিলেন। অক্ষয় চৈতন্য যে মায়ের জীবনী লিখেছেন, সেই আশুবাবুর কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছিলেন।

এটা মনে রাখতে হবে, তিনি সৎ অসৎকে কোনদিন এক করেননি। কিন্তু তিনি সকলকেই তার মুক্তির পথে নিয়ে গেছেন। এখানেই তিনি সকলের মা। কাউকে আদর দিয়ে হোক, কাউকে শাস্তি দিয়েই হোক, সৎ পথে, মঙ্গলের পথে, কল্যাণের পথে নিয়ে গেছেন। এখানেই তিনি সতের মা, অসতের মা। তাঁর অমোঘ শক্তিতে নিয়ে যাবেনই যাবেন। যার দিকে একবার দৃষ্টি পড়েছে, তাকে নিয়ে যাবেন, সেই মুহূর্তেই নিয়ে গেছেন। শিষ্য অশিষ্য কা কথা। তাকে যেতেই হবে। ফোর হুইলার জীপ যখন গাড্ডায় পড়ে দোল খায়, দোল খেতে খেতে বেরিয়ে যায়। তা, যে জীব গাড্ডায় পড়েছে তাকে দোল খেতে খেতে নিয়ে যাবেন। এখানেই সতের মা, অসতের মা। তাঁর অমোঘ শক্তি, অমোঘ সামর্থ। তাঁর করুণার অনুগমন করে সেখানে।

গুণধর গিরিশবাবু। মা বলছেন—'গিরিশের পাপ নিয়েই ঠাকুরের এই ব্যাধি। তা, গিরিশকেও শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল।' জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই কষ্ট। তার ছেলেপুলে মারা গেছে, চারিদিক থেকে বিরোধিতা এসেছে, শরীর সমস্ত রকম রোগের আকর হয়েছে, কিন্তু ঠাকুর বলতে ভোলেননি, মা বলতে ভোলেননি। এখানেই সতের মা, অসতেরও মা। মতিটা ঠিক রেখেছেন। এটাই তাঁর কৃপা। মুড়ি, মিছরির এক দর করেননি, সেটাতে অনাসৃষ্টি।

একদিন বৃষ্টির সকালবেলা দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর ঘরের বারান্দায় যে দিকটায় মা গঙ্গা আর মাধবীলতা গাছ আছে, সেখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। রোজই দেখতাম সাদা চুল, দাড়ি বুড়ো ভিখিরি একটা, নহবতে খুব মা মা করত, মাথা ঠুকত। সে ভয়ে ভয়ে কাছে এসে বলল—'বাবা, একটা কথা বলব'? হাতজোড় করে বলছে, কাঁপছে। বললাম, কি হয়েছে? ভাবলাম ভিক্ষে-টিক্ষে পায়নি, বর্ষা-বাদলার দিন, কিছু হয়ত চাইবে। বলল, 'মায়ের দয়ায় সেসবের অভাব নেই। তবে আমার বুকে ভয়ানক জ্বালা'। হাতজোড় করে আছে। ঠকঠক করে কাঁপছে। রোজই সারদা মায়ের কাছে মাথা ঠোকে। কি হয়েছে-রোগটোগ? 'না। জীবনে আমি অনেক অন্যায় করেছি। এখন অন্যায় করার সামর্থ নেই, বাটি নিয়ে বসে থাকি, সকাল সন্ধ্যেয় সারদা মায়ের মন্দিরের দিকে তাকিয়ে থাকি। যা ভিক্ষে পাই যথেষ্ট। কিন্তু আমার মনে ভয়ানক জ্বালা হচ্ছে। মনের মধ্যে অসৎ বৃত্তি, সেটা যাচ্ছে না। পাপ প্রবৃত্তি আমাকে নিশিদিন যন্ত্রণা দিচ্ছে। রোজই ভাবি আপনাকে বলব, কিন্তু আপনার সঙ্গে অনেকে থাকে তো, সেইজন্য লজ্জায় বলতে পারিনি, ভয়ে বলতে পারিনি। আমার এই পাপ প্রবৃত্তি কেন যায় না বাবা। —ভাবলাম, ধন্য দক্ষিণেশ্বর আর ধন্য দক্ষিণেশ্বরের এই ভিখিরি। সারদা মা তার বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন। মহা সুখে থাকতে পারত, কেউ কিছু জানতে পারছে না। কিন্তু পাপ প্রবৃত্তি আছে বলেই ভেতরে এত জ্বালা। এটাই সাধনা। সাধনা তো ভেতরে ক্রিয়াশীল আছে। বলছে—'আমার বুকে ভয়ানক জ্বালা। অসৎ প্রবৃত্তি কেন যায় না?' এই অসতের মা হয়ে আছেন তার বুকে। দুনিয়ায় কত বদমাইশ আছে, মহা আনন্দে আছে তারা, কিন্তু এর বুকে মা জ্বালা হয়ে বিরাজ করছেন।

স্বামীজী

স্বামীজী বলেছেন-'আমি একজন মরমী ভক্ত, প্রিয়তমের আদেশ ছাড়া নড়তেও পারি না।'

এই যে বেদ-বেদান্ত, অমুক তমুক, এসব ঢাল-তরোয়াল। আসলে তিনি প্রভুর দাস, প্রভু তাঁকে যে ভাবে চালিয়েছেন, সেই ভাবেই চলেছেন। স্বামীজীর বিদেশ যাওয়ার উদ্দেশ্য বলা হয়—সর্ব ধর্ম সম্মলেনে বক্তৃতা করে ধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করা এবং ভারতবর্ষের দুঃখ দারিদ্র দূর করা, ক্রমশ তাঁর ভাবনা পরিস্ফুট হয়েছে এবং পরবর্তীতে বলা যায় গোটা মানবাত্মার ক্রন্দনে সাড়া দিয়েছেন। আলাদা আলাদা করে দেখা হচ্ছে। কিন্তু বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড সত্তা। এবং, তাঁর দৃষ্টি দেশ-কাল ব্যহত নয়। ঠাকুর তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যাওয়ার জন্য, তিনি গিয়েছেন। সেই নির্দেশ দেওয়ার পর ঠাকুর চুপ করে গেলেন, তা কখনো নয়। তিনি বলছেন—আমি একটা মরমী ভক্ত, সব সময় প্রভুর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকি। তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ তিনি প্রভুর আন্তর-নির্দেশ মতই চলছেন। কথামৃতে পাই—ঠাকুর, নরেনের দিকে তাকিয়ে গান গাইছেন-'এসে পড়েছি যে দায়, সে দায় বলব কারে'। বস্তুত মানবাত্মার ক্রন্দন ব্যথিত করুণাবতরণের এই যুগ্ম দায় তাঁরা আবির্ভাবক্ষণ থেকেই বহন করেছেন। আদেশ-নির্দেশের কথা-ভক্তি ভালোবাসার আস্বাদনে। তাঁর মধ্যে যে পরিবর্তন দেখতে পায়, বস্তুত এইগুলো পশ্চিমি গবেষকদের কাছে খুব গবেষণার বিষয় হলেও এটা একটা অখণ্ড ব্যাক্তিত্বের ক্রমবিকাশ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ একীভূত সেই ব্যক্তিত্ব। সেই ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশই ইয়োরোপ-আমেরিকায় এবং আগে-পরে ভারতে বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ এই ভাবেই নিতে হবে। আজকে কি বক্তৃতা করল, কালকে কি বক্তৃতা করল, কোথায় কি বক্তৃতা করল, সেসব আলাদা করে বলার পেছনে একটা বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে কিন্তু সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। জগত-কল্যাণে সামগ্রিক একটা রূপান্তর, সামগ্রিক একটা পরিণতি তাঁকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে গেছে। আমরা কি ভাবতে পারব বিবেকানন্দের বিদেশের শেষ দিনগুলো প্রথম দিন থেকেই শুরু হবে? তা নয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সেই মানবাত্মার ক্রন্দনেই সাড়া দিয়েছেন। একটি অখণ্ড পরিকল্পনা কালানুক্রমে খণ্ড খণ্ড রূপে প্রকাশ পেয়েছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চৈতন্য-বাহিত কর্মধারা কখনো দেশ-কাল বাধিত নয়। তার ভাষা প্রতিদিনই পাল্টেছে, গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে, সামগ্রিকতার আবেদন সেখানে আসন পেতেছে। সব কিছুর মধ্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগ্ম ব্যক্তিত্বের ছবি, যা সমস্ত মানুষের কাছে অমর দান রেখে গেছেন।

স্বামীজী যখন মিসেস বুলকে লেখেন—ভগবান সকলের বন্ধন মোচন করুন, সকলেই মায়ামুক্ত হোক—এই আমার চিরপ্রার্থনা—তখন শ্রীরামকষ্ণের চিরপ্রার্থনা-'তোমাদের চৈতন্য হোক—আমাদের খুবই মনে পড়ে।

ভগবানের পথে

শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে, 'প্রথম খণ্ডে সুনন্দা দেবীর বর্ণনায় দেখি-দক্ষিণ ভারতের তামিল কোন স্বামী-স্ত্রী ঠাকুর-মায়ের ভক্ত, তারা দুটো মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছে—একটা

খুবই ছোট, আর একটা একটু বড়-তারা যেন মায়ের সান্নিধ্য এবং ঠাকুরের ভাবধারায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে। ...এটা খুব সুন্দর জিনিস যেমন ভাবে বাবা-মা, ঠাকুরের ভক্ত-সাধক হয়ে গেছে এবং মেয়েদেরও মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। আর মেয়েরাও ঠাকুর-মায়ের ভাবধারায় উন্মুখ। মায়ের প্রতি ভক্তি শতধারে বর্ষিত হচ্ছে।

আমরা যেমন সৎভাবে ভাবিত হতে চাই, ঈশ্বরের ভাবে আপ্লুত হতে চাই-আমরা হয়ত সচেতন ভাবে চাইছি, কিন্তু আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে কোন না কোন স্তরে বিরোধ থাকে, যার জন্য আমরা মন-প্রাণ দেব বললেও দিতে পারি না। আমাদের আচরণ সর্বাত্মক হয় না। মাঝে মাঝেই ফুঁসে উঠে আমার জাগ্রত সিদ্ধান্তকে বিধ্বস্ত করতে চায়। এটা হচ্ছে ব্যাক্তিগত ভাবে একটা মানুষের মধ্যে সত্তার বিরোধ, যা সর্বাত্মক-ভাবে আপ্লুত হতে দ্যায় না। কিন্তু খুব বিরল কিছু দেখা যায় যেখানে সত্তার মধ্যে কোথাও কিছুমাত্র বিরোধ নেই, যা আছে তাও আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যায়, সর্বাত্মক ভাবটাই জাগ্রত হয়। সেই জীবন নিশ্চয় সুখের, শান্তির, সামঞ্জস্যপূর্ণ। জীবন সেখানে গতিমান। আর, এটা হওয়াই উদ্দেশ্য।

ব্যক্তিগত স্তরের এই অন্তর্লীন বিরোধমুক্ত-সর্বাত্মক অনন্ত অভিযান, এটা আরও বিরল কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় গোটা পরিবারের মধ্যেই বহমান হয়েছে। সেই সংসার নিশ্চয় খুবই ভাগ্যবান—যেখানে সমগ্র পরিবার এই অন্তর্লীন বিরোধের আখড়া থেকে মুক্তি পেয়েছে, সামগ্রিক ভাবে সেই পরিবারটা ভগবান-উন্মুখ হয়েছে, সেখানে ভগবানের আসন পাতা। যেমন একটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই কথা বললাম, এটা যদি আরও প্রসারিত করতে পারি, তাহলে দেখব কোন কোন ক্ষেত্রে গোটা পরিবারটাই কত ঈশ্বরীয় জীবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যথার্থ শান্তিনিকেতন। সেখানে নোঙর বেঁধে স্রোতের জলে বসে থাকা নেই। সেখানে 'তীরের বাঁধন দে রে খুলি, ভেসে যা তুই পালটি তুলি'। এ তো আমরা বহুবার বহু জায়গায় দেখেছি। শিবানন্দজীর, রামকৃষ্ণানন্দের জীবন-তাঁদের বাবা, মা কিরকম ছিলেন পরমার্থের আশীর্বাদ দিয়েছিলেন। সংসারে থেকেও বলরাম বসু—তাঁর বংশ পরম্পরা কি ভাবে জাগ্রত ঈশ্বরের আরাধনায় মগ্ন, মশগুল হয়েছিলেন। যেন একটা সত্যযুগের সংসার এই কলিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এদের ভাগ্যের কোন সীমাপরিসীমা নেই। জন্ম-জন্মান্তর সেই অভীপ্সা তারা জাগ্রত করছে- যেন আমরা সর্বাত্মক ভাবে শ্রীহরির সেবায় জীবন-যাপন করতে পারি। স্বামীজীর ভাষায়—জীবনের প্রতি কাজে সেই দেবত্ব বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করা। এইগুলো বিশ্লেষণ করি-কি ব্যাক্তিগত ক্ষেত্রে, কি পারিবারিক ক্ষেত্রে আমাদের অন্তর্জীবনে এবং আচরণে কি দুষ্ট ক্ষত আছে, যেটা আমরা পোষণ করে যাচ্ছি বংশ পরম্পরায়? সেটা উৎপাটিত করতে হবে। আমাদের বংশের মধ্যে কি সেই মহত্ত্বর ভাব আছে, সেটাকে জাগ্রত করতে হবে, সেটাকেই আঁকড়ে ধরতে হবে। সেই সংকল্প চাই, স্থির ভাবে সেটাই যেন জীবনে সর্বাত্মক হয়। এই ভাবটা আশ্রয় করতে হবে। ভগবানের পথ থেকে যত দূরে যাব, তত দুঃখ, অশান্তি , কষ্ট-এটা তো অবধারিত। আমরা যতই ভগবানকে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে পারব, একক ভাবে কি যৌথ ভাবে, ততই শান্তি। সেই শান্তি কেউ কোনদিন কেড়ে নিতে পারবে না। প্রত্যেক মানুষকে একক ভাবে কি যৌথ ভাবে এর জন্য চেষ্টা করতে হবে-কোন প্রলোভন যেন তাকে আঘাত না করে।

স্বামীজী—প্রেমের অবতার

আচ্ছা, 'টঙ' কাকে বলে? টঙে উঠে বসে থাকতেন কেন? আগেকার দিনে বাঁশ বা কিছু দিয়ে উঁচু জায়গা হোত। রাজারা তাদের সীমানার চারপাশে বাইরের রাজাদের আক্রমণ বা গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য তাদের লোক নিয়োগ করত, যারা সারাক্ষণ সজাগ থাকত পর্যবেক্ষণের জন্য। একে টঙ বলা হোত। পরবর্তীকালে মুসলমান রাজারা মিনার ইত্যাদি করত একই উদ্দেশ্যে। এই চলতি কথায় টঙ বলা হোত।

স্বামীজীর টঙ ছিল রামতনু বসুর গলিতে স্বামীজীর দিদিমার বাড়ীর চিলেকোঠায়, অর্থাৎ ছাদ সংলগ্ন একটা ঘর ছিল, রাস্তা থেকে সরাসরি সেখানে যাওয়া যেত বাড়িতে প্রবেশ না করেই। নামটার মধ্যে একটা মজা আছে। সেই চিলেকোঠায় স্বামীজী এসে থাকতেন। রাজারা শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য টঙে লোক রাখত, আর স্বামীজী প্রেমের অবতার, প্রেমে জগতকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন—প্লাবিত করবেন। যেহেতু রাস্তা থেকে সরাসরি সেখানে আসা যায়, বাড়িতে না ঢুকেই তাঁর মিত্রপক্ষরা সরাসরি সেখানে আসতে পারে, কোন বাধা-নিষেধ নেই, দিনে রাতে যখন খুশী আসতে পারে। এটার নাম দিলেন টঙ। আমাদের স্বামীজীর তো শত্রুপক্ষ নেই, স্বামীজীর কাছে মিত্রপক্ষ। টঙের মানেটা স্বামীজী পাল্টে দিলেন। নাম দেওয়াটার মধ্যে দিয়ে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি কত সুন্দর ছিল, সেটা আস্বাদন করা যায়। এই বাইরের দিক থেকে আসা-যাওয়ার কারণেই স্বামীজীর বন্ধুরা দিনে, রাতে কোন বাধা না পেয়ে স্বামীজীর প্রতিভার টানে, তাঁর ভালোবাসার টানে আসতেন, কেউ বা গান শুনতে ভালোবাসতেন, কেউ পড়াশোনার জন্য, কেউ নেহাত তাঁর ব্যাক্তিত্বেব আকর্ষণে ছুটে আসতেন। টঙ কথাটার মধ্যে এত মধুর একটা ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। জগতকে টঙে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে চেষ্টা তারই একটা ছোট ছবি ছাত্রাবস্থায় রেখেছিলেন টঙ কথাটার মধ্যে।

মজার কথা হচ্ছে এই—যখন দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ছুটে আসছেন সেই টঙে স্বামীজীকে ভালোবেসে, যে ভালোবাসা তিনি ছড়িয়ে দিতেন তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে, সেই ভালোবাসার আকুল স্রোতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসে হাজির হলেন, স্বামীজীকে লুকিয়ে লুকিয়ে সন্দেশ খাওয়াচ্ছেন, দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাচ্ছেন—কত ভালোবাসার ছবি।

এখানে প্রিয়নাথ সিংহের বর্ণনা আছে। ঠাকুর যেমন ছুটে এসেছেন, এত ভালোবেসেছেন, যাঁর এত কোমল শরীর যে, ভাবাবস্থায় যখন-তখন টলে পড়ছেন, কিছু ছিড়তে গেলে আঙুল ফেটে রক্ত পড়ে, দিক-বিদিক জ্ঞান থাকে না, কাপড়ের পর্যন্ত ঠিক থাকে না, তিনি ছুটে এসেছেন এই কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দকে, তখনকার দিনের নরেন্দ্রনাথকে দর্শন করতে। কিসের টান? কিসের ভালোবাসা? মনে জেগে ওঠে অন্য ছবি। ভগীরথ-এর কঠোর তপস্যায় যখন কলুষনাশিনী, জগত পবিত্রকারী গঙ্গা পৃথিবীতে অবতীর্ণা হতে স্বীকৃতা হলেন, তখন বললেন—আমি তো অবতীর্ণ হব, এই জগতের পাপ-তাপ ধুয়ে যাবে, কিন্তু অবতীর্ণ যে হব সেই স্থান কই যে আমার বেগ ধারণ করবে? ভগীরথ দেখলেন—হায়। সারা জীবনের কঠোরতম তপস্যায় যখন মা গঙ্গা অবতীর্ণ হতে চাইছেন, সেই অবতরণের বেগ ধারণ করার সামর্থ কার? মা গঙ্গা বললেন—আছেন। একমাত্র শিবজী আমার এই বেগ ধারণ করতে পারবেন, তাতেই জগত মহা পবিত্রতায় প্লাবিত

হবে। আর, শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে যখন অবতীর্ণ হতে চাইছেন, প্লাবিত করতে চাইছেন গোটা পৃথিবীকে তার পবিত্রতার প্রবাহে, আজকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর অবতরণের স্থান স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। তাই তিনি ছুটে এসেছেন টঙে। তুই এতদিন যাসনি কেন। ভাষাটা আমাদের কানে শুনতে পাই—তুই ছাড়া এমন পাত্র কোথায় পাব, জগত প্লাবনকারী সেই ধারা যে ধারণ করতে পারবে?

শরীর থেকে তামসী শক্তির নিষ্ক্রমণ

★ লীলাপ্রসঙ্গে দেখি, ঠাকুর সাধক ভাবে বলছেন—'একদিন পঞ্চবটিতে বসেছিলাম, তখন দেখলাম ভেতর থেকে মিশকালো বিশালাকায় দৈত্য সদৃশ সে বেরিয়ে এল, আর তারপরই ভেতর থেকে দিব্যকান্তি পুরুষ বেরিয়ে এসে তাকে ধ্বংস করল। তখন বুঝলাম পাপপুরুষ ধ্বংস হল। তাহলে, ঠাকুরের দেহে কি পাপপুরুষ ছিল? নিজেই তো বলেছেন।)

★★ ঠাকুর এইগুলো এবং আরও অনেক কিছু বলেছেন, রূপক বা ভাবগত অর্থেই। এই পাপপুরুষের কথা। আমাদের চণ্ডীতে আছে, মধু কৈটভ যখন ব্রহ্মাজীকে মারতে গেল, তখন ব্রহ্মা, আদ্যাশক্তি মায়ের স্তব করতে লাগল—মা লক্ষ্মী, যিনি নারায়ণের পদসেবা করছেন। ব্রহ্মার স্তবে আদ্যাশক্তি সন্তুষ্ট হলে, নারায়ণ যিনি নিদ্রাগত ছিলেন, তাঁর শরীর থেকে, বাহু, উদর, হৃদয় থেকে বিপুলা তামসী শক্তি বিনির্গত হল। তখন নারায়ণ জেগে উঠলেন। তাঁর মধ্যে থেকে কি তামস শক্তি বার হবে? এটা তো একই ধরণের। তীব্র তপস্যার মধ্যে দিয়ে শরীরের উপাদানগুলো পাল্টায়। এই শরীরের যে-সমস্ত উপাদান বিপুলা আত্মিক অবতরণ সইতে পারে না, সেসব উপাদান শরীর থেকে বার হয়ে যায়। প্রথমে বিন্দু বিন্দু, পরে পুঞ্জিভূত হয়ে এইগুলো শরীর থেকে বার হয়ে যায়, এই উপাদানগুলো। এক কথায় তামসী বলেছে। প্রথমে দেহ সত্ত্বময় হয়, আরও গভীর বা উচ্চ অবস্থা পেলে বিশুদ্ধ সত্ত্বের দিব্য পরমাণু সাধকদের সত্ত্বায় ক্রোমোচ্চ স্তরে সঞ্চিত হয়ে দিব্য শরীর গঠন করে। এই যে প্রক্রিয়া, সাধকের শরীর, মন-লিঙ্গ শরীর জুড়ে হয়, এটা সাধকদের সূক্ষ্ম বা দিব্য দৃষ্টির গোচর হয়। সাধক দেখতে পায়, বুঝতে পারে তার অবিনাশী সফলতা। সাধারণ মানুষের মত দেখতে হলেও ক্রমশ তার শরীরের উপাদান পাল্টে যায় এবং অধিকাধিক পারমার্থিক সামর্থবান হয়ে ওঠে। এটাকেই ঠাকুর পাপপুরুষ বলে উল্লেখ করেছেন। অন্তর্দৃষ্টিতে শরীর আরও জ্যোতির্ময় হয়। লিঙ্গ শরীর পুষ্ট হয়ে ওঠে। লিঙ্গ শরীর বলছি এইজন্য যে, সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে স্থূল শরীরের সূক্ষ্ম উপাদান থাকেই থাকে। তার আগে সূক্ষ্ম শরীর যথার্থ অর্থে সূক্ষ্ম হয় না। জন্ম-জন্মান্তরেই পাপ-পুণ্যের দায় বহন করে। সুতরাং এক্ষেত্রে উপাদান যা বেরিয়ে যায় এবং যা যুক্ত হয়, একেই ঠাকুর সম্ভবত পাপপুরুষ ধ্বংস হওয়া এবং দিব্য পুরুষের আবির্ভাবের কথা বলেছেন। যেমন লীলাপ্রসঙ্গের গুরুভাব পূর্বার্ধে আছে কামকীট বেরিয়ে যাওয়া। স্থূল কোন পোকা-টোকা তো থাকে না। কিন্তু সাধনার ভালো অবস্থা প্রাপ্ত হলে যে-সমস্ত নাড়ী এবং গ্রন্থী শরীরে পুরুষ বা নারীর বোধকে জাগ্রত করে তা নির্বাপিত হয় চিরদিনের মত। প্রথমে দেহের স্তরে, পরে মনের স্তর থেকেও। একেই ঠাকুর সম্ভবত প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে পোকা বেরিয়ে যাওয়া বলে উল্লেখ করেছেন। সাধক ভাবে যা কিছু, তা সাধকদের হিতের জন্যই। শাস্ত্রের কোন কিছু গাল-গল্প নয়।

এরকম অনেক কথাই কথামৃতে আছে, যা ঠাকুরের নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করে গিয়েছেন। সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকটা আধ্যাত্মিক পরম্পরার মধ্যে সহস্র যোগীর, সহস্র মুনি-ঋষিদের উপলব্ধি বিধৃত আছে। এই যে আধ্যাত্মিক প্রবহমানতা, এদের নিজস্ব পরিভাষা আছে। কিন্তু অবস্থা সাপেক্ষে কথাটা একই। যার উপলব্ধি হয়েছে, সেই স্তরে তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারবে।

তবে এইগুলো সাধনার উপরের দিকের কথা। সাধারণ ভাবে সাধকদের ঐসব অভিজ্ঞতা হবার কথা নয়। অনেকে আরোপিত ভাবে ভাবতে পারে আমার এটা হচ্ছে, ওটা হচ্ছে। এইজন্য বিস্তৃত ভাবে কিছু বলার উপায় নেই এবং উচিতও নয়। ঠিক একই কারণে বিনা অনুমতিতে কোন মহাপুরুষের ব্যাক্তিগত ডায়েরি, দিনলিপি বা আংশিক কথা-বার্তা কখনই প্রকাশ করা উচিত নয়। কেননা ভুল বোঝার সম্ভবনাই বেশী।

স্বামীজী

'স্মৃতির আলোয় স্বামীজী' বইতে হাবুলকে স্বামীজী বলছেন-' অমরনাথ থেকে ফিরে আসা অবধি আমার প্রাণ বড় শান্তির প্রয়াসী হয়েছে।' স্বামীজীর তো অমনিতে কোন অশান্তি ছিল না। সাধারণ অর্থে শান্তি, অশান্তি এই ধরনের কথা ওঁনার ক্ষেত্রে নয়। মন যখন দ্রুত আরও গভীরে চলে যেতে থাকে, তখন মনের বর্তমান স্থিতিটা মনে হয় খুব গোলমেলে, ঝঞ্ঝাটের, অশান্তিপূর্ণ। এর কারণ, মনের একটা অংশ তো আরও অধিকাধিক গভীরে চলে যাচ্ছে, সেই গভীরতাটাই ইপ্সিত। কাজেই, যে অবস্থাটা ছেড়ে চলে যাচ্ছে মনের, সেই দিকটা খুব কোলাহলপূর্ণ বলে মনে হয়। মনের তুলনামূলক অবস্থা সাপেক্ষে এটা।

সারদা মা

সারদা মায়ের ঠাকুরকে দেখার ইচ্ছে হয়েছে। ভয়ানক ইচ্ছে। কিন্তু ছেলেমানুষ, বলতেও পারছেন না কাউকে। অথচ কিছুতেই চেপেও রাখতে পারছেন না। এমন সময় শুনলেন কোন একটা যোগ উপলক্ষ্যে গ্রামের মেয়েরা গঙ্গা স্নানে যাচ্ছে। বাবাকে বলছেন- 'ভেবেছিলুম ওরা সবাই গঙ্গা স্নানে যাচ্ছে, আমিও যাব'। সারদা মায়ের বাবা বললেন, তা যাও। বুঝতে পেরেছেন মেয়ের মনের ইচ্ছে। হাঁটছেন হাঁটছেন, সেই জয়রামবাটি থেকে কত পথ। শেষ পর্যন্ত আর পারে না। পিছিয়ে যাচ্ছেন। তেলোভেলোর বিস্তীর্ণ মাঠে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। মা সঙ্গীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত সঙ্গীরা সকলেই এগিয়ে গেল। নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য বলা হয় একাই ছিলেন, কিন্তু সারদা মা বলেছেন-না, সঙ্গে কেউ একজন মেয়ে ছিল।—তারা সবাই এগিয়ে গেল, তাদের সঙ্গে সারদা মায়ের যাওয়া হল না।

এই যে যাওয়া হল না, তাদের সঙ্গে, তিনি চলতে পারছেন না, পিছিয়ে যাচ্ছেন, এমন কথা ভাবা যাবে না। বস্তুত এটাই স্বাভাবিক-এই পিছিয়ে যাওয়াটা। তিনি তাদের সঙ্গে যাচ্ছেন না, তাদের সঙ্গে যাবেন না, এটাই স্বাভাবিক। কেননা তাদের যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল গঙ্গা স্নানে, গঙ্গা স্নান করা। আর মায়ের যাওয়ার উদ্দেশ্য-নিজেই গঙ্গ

া হয়ে যাওয়া। দুটো উদ্দেশ্য এক নয়। যাওয়াটাও একসঙ্গে হবে না, হতে পারে না। উদ্দেশ্যের ভিন্নতা। মা তাঁর নিজের মহিমায় দক্ষিণেশ্বর এসেছিলেন। মা নিজেই বলেছেন পরবর্তীকালে উদ্বোধনে যে, আমি নিজেই গঙ্গা হয়ে গেছি। সেই সাথীরা এসেছে গঙ্গা স্নানে, আব তিনি এসেছিলেন গঙ্গা হয়ে যেতে।

মাঝখানে আর একটা জিনিস হয়ে গেল। ডাকাতরা দেশে দেশে, কালে কালে কালী পূজা করেছে। কিন্তু এই এক জায়গায় দেখি ডাকাতদের যে কালী পূজা, তার মধ্যে এ একজন ডাকাত সাক্ষাৎ মায়ের দর্শন পেয়ে গেল। তার সেই সুকৃতি, শ্রদ্ধা নিশ্চয় ছিল। কত ডাকাতই তো কত কালী পূজা করে, কিন্তু তাদের মধ্যে এক ডাকাত সাক্ষাৎ কালীর দর্শন পেয়ে গেল, বাবা বলে ডাকটা পেয়ে গেল। যত ডাকাত কালী পূজা করেছে, তাদের মধ্যে একজন সেই ভাগ্যের অধিকারী হল।

এরপর আর একটা জিনিস আমার মনে হয়। দক্ষিণেশ্বরে নহবতে সবাই এসে বলে- আহা, মা এতটুকু ঘরে ছিলেন। একটা মা একটা মেয়েকে বলে, —দেখ, মা এতটুকু একটা ঘরে ছিলেন। এটা তো কথা নয়। কলকাতার কত মা কতটুকু ঘরে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছেন। এর চেয়েও ছোট ঘরে কলকাতার কত মায়ের জীবন কাটছে, হয়ত আলোও আসে না। এখানে মায়ের মহিমা নয়। মা ঐ জয়রামবাটির খোলামেলা পল্লীগ্রামের জীবন, বিস্তীর্ণ মাঠ, আমোদর নদ, গাছপালা, খোলামেলা ঘরবাড়ির সব ছেড়ে নহবতের ঐ একটুখানি ঘরে থাকতে এসেছেন। আকাশের পাখী খাঁচায় ইচ্ছে করে বন্দী হয়েছেন। তার পেছনে একটাই দিক আছে—তিনি ঠাকুরকে ভালোবেসেছিলেন। ঠাকুরের জীবনকে ভালোবেসে তিনি এইসমস্ত কষ্টকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। নহবতের এতটুকু সংকীর্ণতার মধ্যে পরমানন্দে জীবন কাটিয়েছেন। নিজেই বলেছেন-দিন রাত কোথা দিয়ে কেটে যেত। কত আনন্দ সারাদিন ধরে, সেসব দেখতাম। ঠাকুরকে ভালোবেসে, ঠাকুরের জীবনকে ভালোবেসে তিনি এই এতটুকু জীবনকে পরমানন্দের জীবনে পরিণত করেছিলাম। এটাই আমাদের ভাবতে হবে।

সারদা মা সম্বন্ধে আর একটা কথা বলি। সবার মা সারদা , সমষ্টিভূতা মা। নিখিলের যে মাতৃত্ব আছে, সব একত্র করে। ভালো কথা। নিখিল মাতৃত্বের একীভূতা প্রতিমা। তবুও আমার মনে হয় বলা খুব ছোট হয়ে গেল। আমাদের যে ঘরের মা আমরা প্রতিদিন দেখি, তিনি মা, তিনি ভালোবাসেন। তবে, তার মাতৃত্ব, সে তো আমাদেরই মা, মায়ায় আবদ্ধ একটা অসহায় মানুষ, তার অতি সীমিত মাতৃত্ব দিয়ে আমাদের রক্ষা করছেন। সেই মাতৃত্ব খণ্ডিত, আবরিত, সেই মাতৃত্বের মধ্যে মানুষের অখণ্ড জীবনের প্রতি যে অভীপ্সা তার সামান্য মাত্রই প্রতিফলিত হয়। এই মাতৃত্ব আমরা সব জায়গায় দেখি। একটা পাখী তার বাচ্চাকে রক্ষা করছে, একটা গরু তার বাচ্চাকে দুধ দিচ্ছে। এই পথ ধরেই মানুষের মধ্যে মানুষের মাতৃত্ব তার সব কিছু জড়তা, দীনতা, তুচ্ছতার মধ্যেই। তার মাতৃত্ব আবরিত হয়ে আছে। এ কোন মাতৃত্ব? তার একীভূত মূর্তি সারদা মা, তা কক্ষনো নয়। সারদা মা চৈতন্যময়ী, জ্ঞান-বিজ্ঞান-মোক্ষ দাত্রী। তিনি আমাদের পরমার্থের প্রসাদ দান করছেন। তিনি তাঁর অভ্রান্ত দৃষ্টিতে, অমোঘ শক্তিতে আমাদের সমস্ত জীবনটা সেই আলোর দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, সেখানেই সকলের মা সারদা। সার দান করছেন। এই জীবনের মধ্যে যে সারটুকু সংগুপ্ত আছে, যে-সম্ভবনা লুকিয়ে আছে, তাকেই তিনি সফল করবেন, জীবনকে সেইদিকেই নিয়ে যাবেন, সেইজন্য তিনি সারদা। আমরা এই

মাতৃত্বের ভাবনায় বিভোর থাকি। আমাদের এই অভীপ্সা। যেখানে যতটুকু আমরা সেই মাতৃত্বের অভিসারী হব, সেই মাতৃত্বের আস্বাদন লুব্ধ হব, ততখানি সেই মা আমাদের মধ্যে জেগে উঠবেন—এটা মনে রাখতে হবে। সারদা মায়ের এই দাবী। আমাদের মধ্যে সেই ক্ষুধা জেগে উঠবে। সেই বিশাল মাতৃত্বের চরণছায়ায় যাওয়ার জন্য আমাদের মধ্যে যদি তৃষ্ণা জেগে ওঠে, যতখানি জেগে উঠবে, ততই সেই সারদা মাকে মা বলার অধিকার আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে। এ বড় কঠিন ভাব। এ বড় মহৎ ভাব। জীবনের কাছে এই দাবী তিনি রেখেছেন।

চেতন সমাধি

সমাধির মধ্যে অনেক জটিল রহস্য আছে। রামপ্রসাদের গান আছে "আমায় দে মা তবিলদারি।" দৃষ্টি খোলা একটা আলাদা জিনিস। সন্তদাসজীর জীবনী পড়েছ-যোগসাধন করে নির্বিকল্প স্থিতি পর্যন্ত হচ্ছে কিন্তু তখনও কিছু পাননি, যখন রামদাস কাঠিয়াবাবার কাছে গেলেন। বললেন-'আমার অধ্যাত্ম জীবনে কিছুই পাইনি। রামদাস কাঠিয়াবাবা বললেন-হ্যাঁ, হৃদয়মে কমল হায়, উহ রোক দেতা' বলা বাহুল্য সেটা অনাহত চক্র নয়। একটা গাছ বাইরে মাথায় মাথায় হয়ে যেতে পারে, কিন্তু ফল ধরা আলাদা। সেই ফলটা পুষ্ট হবে, সেই ফলটা ঝরে পড়বে। কোথায় ঝরে পড়ছে? এই ফলটা ঝরে পড়ছে অনন্ত আকাশে। অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর স্বরূপানন্দজীর কথায়-ফলটা পেকে ওঠে আর ঝরে পড়ে অনন্তের কোলে। সুতরাং, এই প্রাণের ধারার সাধনা ছাড়াও ফল পুষ্ট হওয়া, ফল ঝরে পড়ার ব্যাপার আছে। যার জন্য শ্রীগুরু গীতায়-'হৃদয়াকাশমধ্যস্থং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভম্'। আত্মগুরুর কথা। বলেনি সহস্রারে, বলেনি দ্বিদলে, বলেছে 'হৃদয় কমল মধ্যে।' ওটা একটা আলাদা দিক। আরও কত সুন্দর কঠোপনিষদ্ এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-এর শ্লোক আছে-'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃপুরুষোহন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। মুণ্ডক উপনিষদে আর একটা-'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়া। এরকম বহুতর শ্লোক ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে।

বাড়ীতে থাকার সময়, জ্যোতি দেখতে দেখতে স্বামীজী তার মধ্যে হারিয়ে যেতেন, এটা কখনো ঘুম হতে পারে না। ঘুমটা সবসময় তমোগুণের ক্রিয়া। তার মানে, যে ঘুমোচ্ছে সে তমোগুণী, এটা ধরলে হবে না। একটু বুঝিয়ে বলছি। একটা বলের কালো, লাল, সাদা, তিনটে রঙ করা আছে। যখন কালোর সীমানায়, তখনও লাল আছে, সাদা আছে। সুতরাং প্রকৃতি যখন বলছ, কম-বেশী ঐ তিনটে বন্ধন আছেই। মুক্ত হলে সে স্বরূপেই আছে। কিন্তু যতক্ষণ প্রকৃতির বন্ধনের মধ্যে আছে, যতটুকুই বন্ধনের মধ্যে থাক, সে কমিয়ে আনতে পারে, কিন্তু মুছতে পারে না। একটা মুছতে গেলেই প্রকৃতির বন্ধনটা ভেঙে ফেলা হয়। সুতরাং তমোগুণের সীমানায় আছে বলেই সে পুরো তমোগুণী নয়। রজোগুণের সীমানা যেখানে, সেখানে তমোগুণের প্রভাবটা কমে যাচ্ছে। যখন সে সত্ত্বগুণের সীমানায়, তখন রজো আর তমো গুণ বিলীন প্রায়, একটু আছে। প্রভাবটা কমে যাচ্ছে। কিন্তু যতক্ষণ সে সাধক, ততক্ষণ সে ত্রিগুণের কোন একটাকে একদম বাদ দিতে পারে না। কেননা, তাহলে মায়ার খেলাটাই ছিন্ন হবে। এমন একটা কার্য

কারণ আছে। ঘুম হচ্ছে যেখানে, সেখানে এক বিন্দু হলেও তমোগুণের আশ্রয় নিচ্ছে, না হলে ঘুম হতে পারে না। আর স্বামীজী যখন জ্যোতি দেখতে দেখতে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছেন, তখন সেটা আর কোন রকমেই ঘুম নয়। কিন্তু লোকে তো এটাকে ঘুমই বলবে। সমাধির কোন একটা অবস্থায় সে যাচ্ছে—যে স্তরেই যাক কিন্তু সেই সমাধির সচেতনতা তাঁর মধ্যে নেই। যার জন্য, দক্ষিণেশ্বরে যখন ঠাকুর ওঁনার বুকে হাত রাখলেন, তখন বললেন,— আমার এ কি করলে গো, আমার যে বাপ, মা আছে? তখন ঠাকুর বলছেন- তবে থাক এখন। সমাধির সচেতনতা আসেনি। ঠিক একই প্রশ্ন—কাশীপুরে স্বামীজীর সমাধি হল। তারপর পাওহারি বাবার কাছে গেলেন রাজ যোগের দীক্ষা নিতে। তাহলে কি সমাধিটা মিথ্যে? ঐ সময় গাজিপুর থেকে প্রমদাদাসবাবুকে লিখছেন—'মনের মধ্যে নরক দিবারাত্রি জ্বলিতেছে-কিছুই হইল না, এইজন্ম বুঝি বিফলে গোলমাল করিয়া গেল। আবু পাহাড়ে প্রয়োপবেশনের সঙ্কল্প—কিছু হল না, দেহত্যাগ করব। সমাধি হলেও তার প্রাপ্তির একটা ব্যাপার আছে। এক সিন্দুক ভর্তি টাকা নাও, কিন্তু সিন্দুকের চাবিকাঠি আমার। ঠাকুর নিজেই তো বলেছিলেন, চাবি দেওয়া রইল, সময় হলে খুলব।— আছে তো এসব কথা? পরবর্তীকালে আলমোড়ার কাছে কাঁকড়িঘাটে স্বামীজীর সেই মহাপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সঙ্গী অখণ্ডানন্দজীকে সেই কথা মুক্ত কণ্ঠে প্রকাশ করেছেন 'দ্যাখ গঙ্গাধর, এই বৃক্ষতলে একটা মহা শুভ মুহূর্ত কেটে গেল। আজ একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। বুঝলাম সমষ্টি ও ব্যষ্টি একই নিয়মে পরিচালিত।' সুপ্রাচীন মহাযোগী গোরক্ষনাথজী সম্যক জ্ঞানী মহাযোগীর কথায় ঠিক এই কথাই ব্যক্ত করেছেন-'পিণ্ডমধ্যে চরাচরং যো জানাতি। স যোগী পিণ্ডসংবির্ত্তিভবতি। যথার্থ যোগের লক্ষণ প্রসঙ্গে- 'সংযোগো যোগ ইত্যাক্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-পরমাত্মনোঃ।

নরলীলা

★ ঠাকুরকে গোঁসাইজী ঢাকাতে দর্শন করেছিলেন, স্থূল ভাবে, স্পর্শ করেছিলেন। শুনে ঠাকুর বললেন-এইবার বোধহয় শরীরটা ছেড়ে দিতে হবে। আত্মা যে শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এটা ভালো নয়।—আমার প্রশ্ন হচ্ছে-মহাপুরুষরা তো এরকম করেনই, তবে ঠাকুর কেন এরকম কথা বলছেন?

★★ ঠাকুর তো অবতার। তিনি স্থূল লীলায় অবতীর্ণ হয়েছেন। লীলার যে সূক্ষ্মতর দিক, সেটার দিকে ঝোঁক চলে যাচ্ছে। অবতার বলেই এই কথাটা। সিদ্ধ পুরুষদের কথা এটা নয়। ঠাকুর যখন আপাত ভাবে পূর্ণাবস্থা পেলেন, তখন এরকম বলতেন— জগন্নাথকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙে গেল, জানিয়ে দিলে, তুমি শরীর ধারণ করেছ-এখন নররূপের সঙ্গে সখ্য বাৎসল্য এই সব ভাব নিয়ে থাক।—সেই লীলাটা কালানুক্রমে আর দেহনিষ্ঠ থাকছে না, সূক্ষ্মতর, দিব্যলীলা ছড়িয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর সেইজন্য বলছেন-এটা ভালো না। এটা ভক্তদের দিক থেকে-তাঁর তো আর ভালো-মন্দ নেই। প্রেমে অবতরণ তো, স্থূললীলা কম পড়ে যাচ্ছে।

অবতরণের একটা বিশেষ তত্ত্ব এই—পূর্ণ থেকে নেমে আসা বিশেষ করুণার সংকল্প নিয়ে। কাজটা যেমন যেমন হয়, পূর্ণের সঙ্গে মেশার টানটা বাড়তে থাকে। এই লীলাটা

ছড়িয়ে যাচ্ছে। ঢাকায় গোঁসাইজী দেখেছিলেন শরীর স্পর্শ করে। যেমন তুমি একই ভাবে বলতে পার-ঠাকুর তখন কলকাতায় কোথায় গিয়েছিলেন, কয়েকজন ভক্ত ঠাকুরের ছবিতে ভোগ দেখিয়ে খেয়ে নিল। লোকেরা মাকে বললে, মা বললেন—এটা ভালো নয়। তিনি আছেন, আর তাঁর ছবিতে ভোগ দেখিয়ে খেল। এইরকম কথা আছে। কাশীপুরে বলেছিলেন-অনেক দূরে কোথায় গিয়েছিলাম, তারা সব সাদা সাদা। তারা এখানকার ভক্ত। —যেটা বললাম, লীলাটা ছড়িয়ে যাচ্ছে, দেহনিষ্ঠ থাকছে না। শেষের দিকে কাশীপুরে ঠাকুর বলছেন—দেখ গো, এখন আমার সবসময় অখণ্ডের উদ্দীপন হচ্ছে। মা চোখের জল ফেলতে লাগলেন। যিনি এই খণ্ডিত জগতে, আপেক্ষিক জগতে এসেছেন, তিনি বলছেন—এখন সবসময় অখণ্ডের উদ্দীপন হচ্ছে। তার মানে, ও দিকের টানটা বেড়ে যাচ্ছে। তিনি তো অখণ্ড, তিনি তো অদ্বৈতের। আবার দেহত্যাগের পর মাকে দেখা দিয়ে বলছেন—'গেছি আর কোথায়, এ ঘর আর ও ঘর'। এই যে ও ঘরে গেছেন, সেটা আর ঠাকুরের এই ঘর নয়। যেমনটা প্রকট লীলা, তেমনটা নয়। এখন ঘর হচ্ছে লীলার সূক্ষ্মতর, দিব্যতার দিক। ও ঘরটা হচ্ছে নিত্যলীলার দিক। ঠাকুর থাকতে যে এই ঘর, সেটা ঐ ঘর নয়। তাই যদি হোত, তাহলে মা কাঁদছেন কেন? স্থূল লীলার যে আস্বাদনের দিক, সেটা তো থেমে গেছে, লীলার সূক্ষ্মতর, দিব্যতর চিরন্তন দিক, সেটাই আছে। এটা চিরন্তন হলেও ফারাক আছে। এই সবগুলো কথা বিশ্লেষণ করলে ঐ একই জিনিসটা আসে। অবতার বলতে পূর্ণ অবতার বা স্বামীজীর মত আদিষ্ট অবতার-নানক, কবীর, সবাইকেই তো স্বামীজী অবতার বলেছেন—উভয় শ্রেণীর অবতারের ক্ষেত্রেই। অবতরণ যেখানে, সেখানেই এই নীতিটা বজায় আছে। ঠাকুরের কথা পড়, অন্যান্য অবতারের কথা পড়। চৈতন্যদেবের শেষের দিকটায় নিরন্তর বৃন্দাবনের উদ্দীপন হচ্ছে। নিরন্তর ভাবছেন-আমি বৃন্দাবনেই আছি। নিত্য বৃন্দাবন। বাহ্যবোধ আসলেই ভয়ানক বিরহ জ্বালা। বড় পাগল করা সে সব অবস্থা। 'উদ্‌ঘূর্ণা প্রলাপ প্রভুর রাত্রি দিনে' আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলোয় অন্তরঙ্গেরা স্তব্ধ হয়ে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তলীলা

ঠাকুরের সর্বশেষ স্বচ্ছন্দ প্রকট-লীলা হচ্ছে পানিহাটি-লীলা। লীলাপ্রসঙ্গে এই ভাবে বর্ণনা করা আছে-ঠাকুরের সামান্য অসুস্থতা ছিল, পানিহাটিতে ভাবে বিভোর হয়ে নাচ-গান করে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে ওঁনার ক্ষত বেড়ে যায় এবং সেই থেকে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন, উনি সুস্থাবস্থায় আর ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ করতে পারেন নি।

পানিহাটির পর থেকেই ঠাকুরের অন্তলীলা শুরু হয়েছে। ভেতরের কারণ এখানে উল্লেখ আছে, যেটা অক্ষয়বাবু পানিহাটি প্রসঙ্গে পুঁথিতে উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক অবতারপুরুষ বা ঈশ্বরকল্প মহাপুরুষদের ক্ষেত্রেই দেখা যায় একটা ঘটনাকে ধরে অন্তলীলা শুরু হয় এবং লীলার অন্তর্ধান হয়। চৈতন্যদেব যেমন অদ্বৈত গোঁসাইয়ের চিঠি উপলক্ষ করে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্রের দুর্বাসা মুনির ঘটনা। বামদেবের যেমন, একজন ভয়ঙ্কর কালপুরুষ এসে হাসতে লাগল বলল, আর কেন? এবং তারপরই দেখা গেল বামদেব স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

এখানেও তেমনি একটা ঘটনা আছে। রাঘবের পাটে গিয়ে ঠাকুর অভূতপূর্ব সমাধিমগ্ন হয়ে গেলেন, গভীর সমাধিতে তিনি মগ্ন হয়ে গিয়েছেন, বাহ্যজ্ঞান আর ফিরে আসছে না। অন্য সময় হলে দেখা গেছে এক ঘণ্টা আধ ঘণ্টা পর সারদা মা বা ঠাকুরের সন্তানরা ওঙ্কার, রামনাম বা কালীনাম শোনালে বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসত। এখানে তার ব্যাতিক্রম দেখা গেল। দীর্ঘ সময় নাম শোনালেও ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসছে না, ঠাকুর নিথর হয়ে গিয়েছেন, তাঁর স্বধামের কথা মনে পড়ে গেছে। যখন তাঁর সন্তানরা আশা ছেড়ে দিয়েছেন প্রায়, তখন আস্তে আস্তে তিনি বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেলেন। পুঁথির ভাষায় —

'বীজমন্ত্র শ্রুতিমূলে, সমাধি সময়ে দিলে,
হয় মহাভাব-অবসান।
হেথা রাঘবের পাটে, সে বিধান নাহি খাটে
ভক্তবর্গে সভীত পরাণ

ঠাকুরের অন্তলীলার মোড় এখান থেকেই। তাঁর বাহ্য চেতনা আর ফিরে আসতে চাইছে না, তিনি তাঁর স্বলোকে ফিরে যাচ্ছেন, তাঁর মানস-সত্তা আর ফিরে আসতে চাইছে না, নিত্য ধামের দিকে অধিকাধিক মন চলে যাচ্ছে, ঢল চলে যাচ্ছে। দীর্ঘসময় পর অতিকষ্টে কিছুটা মন এল বাহ্যভূমিতে। নিত্যের ঝোঁকটা বেড়ে যাচ্ছে, লীলা সেখানটায় কম পড়ে যাচ্ছে, সেজন্য সমাধি লাগলে আর ভাঙতে চাইছে না। যে লীলার জন্য তিনি এসেছেন, তার প্রয়োজন কমে যাচ্ছে।

সুতরাং বাহ্যিক ভাবে যে বিশ্লেষণ করা হয়, পানিহাটিতে ভাবাবেশে নাচগান করে ঠাকুরের ব্যাধি বেড়ে গেছে, তা নয়। ঠাকুরের অন্তলীলায় প্রবিষ্ট হওয়ার ঘটনাটা অসুখ হয়ে তিনি শয্যাশায়ী হলেন, এটাই হয়ে গেল। ঘটনাটা তো নিছক তা নয়। অন্তলীলা, বিচিত্র ঘটনার মধ্যে অসুখটা একটা লীলা। পুঁথিকার বলেছেন, এরকম আর কখনও হয় নি। "হেন ভাব কখন না শুনি।' "নিম্নে মন আসিতে না চায়।"

আমি পুঁথিকারকে খুব বাহাদুরি দিই, সামান্য স্পর্শ করে বেরিয়ে গেছেন। লীলার গভীরতম দিক। তাতে পুঁথির স্বাভাবিক ছন্দ, গতিটাও বজায় থেকেছে, আর দুর্জ্ঞেয় দিকটা, গূঢ় কার্যকারণ দিকটাও ছুঁয়ে গেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন, তাঁর সাধনা-উজ্জ্বল বুদ্ধির এবং কৃপার মধ্যে দিয়ে। রামকৃষ্ণ লীলা এবং পুঁথির সহজ-সরল ভঙ্গিমার অন্তরালে যথাযোগ্য স্থানে যথাযোগ্য অন্তঃশ্চারী তাৎপর্যগুলো স্পর্শ করে গেছেন। এই জন্যই পুঁথি সবচেয়ে সরল বই, সবচেয়ে মূল্যবান বই, সবচেয়ে জটিল বই। এখানেই অন্তলীলার মোড়, এটাই মূল ঘটনা। 'নৃত্য গীতে অসুখ বাড়িয়া গেল' এহ বাহ্য।

চৈতন্য আর নিত্যানন্দ তো অভেদ কলেবর। নিত্যানন্দ প্রভু ওখান থেকেই হঠাৎ অপ্রকট হন। আর রামকৃষ্ণদেবও ওখান থেকেই তাঁর বাহ্যিক লীলার ব্যাপকতর পর্যায় শেষ করেন।

অরূপ কথা

শ্রদ্ধা

...... একসময় পাহাড়ের গায়ে নির্জন কোন প্রাচীন সিদ্ধ স্থানে ছিলাম। চারিদিকে ছড়ানো সাধুদের সমাধি, এখানে ওখানে ভাঙা শিব মন্দির। তারি একপাশে আকাশ-বৃত্তি-নির্ভর ছোট্ট আশ্রম। সন্ধ্যেবেলা সব কিছু যেন আরো সজীব হয়ে উঠত। আমি তখন একটা পাত্রে কিছু ধুনো জ্বালিয়ে ঘুরে ঘুরে একাত্মতার আস্বাদনে বিভোর হতাম।

একদিন সকালবেলায় সেই পথেই যেতে গিয়ে দেখি—সদ্য ছাড়া বিশাল এক সাপের খোলস। থমকে দাঁড়ালাম। তাইতো, তার গর্তের উপর দিয়েই হয়ত কতবার যাওয়া-আসা করেছি। সন্ধ্যেবেলা আরো কত কিছু।

ভাবনার মাঝেই দেখলাম, আমার পরিচিত এক পাহাড়ি লোক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে আমায় বলল—'কি বাবা, কি ভাবছ? বুঝেছি, ভাবছ, তোমরা এমনি খোলস ছেড়ে বার বার ফিরে ফিরে আস নতুন করে তপস্যার আনন্দ পাওয়ার জন্য। তাই না? তোমার কোমল, নবীন শরীর দেখে আমিও তাই ভাবি।'

সেই মুহূর্তে মনের তাৎক্ষণিক দুর্বলতা সব কোথায় বিলীন হয়ে আমার প্রাণে নব বলের সঞ্চার করল। একটা সামান্য পাহাড়ি মানুষ, তার যে শ্রদ্ধা, তা আমার অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং এই পথে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করল। আমি যেন একটা অন্য মানুষ হয়ে গেলাম এবং তারপর থেকে আর কোনদিনের জন্যও আমার ভয় লাগেনি। উপনিষদে আছে অভিমন্ত্র! সেদিন সেই পাহাড়ের নির্জন প্রান্তরে এক অশিক্ষিত জংলী মানুষ আমাকে সেই অভিমন্ত্র শুনিয়েছিল। তাই, শ্রদ্ধা এমনই জিনিস, যা আমরা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে জাগ্রত করতে পারি। আমাদের পরমার্থ নিষ্ঠা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে।

রূপ-অরূপ

মানুষ একটা দেখাশোনার স্তরে আছে, আর তাতেই বিভোর। যখন সে ঈশ্বর-মনস্ক হয়, সাধন-ভজনের মধ্যে ডুব দেয়, তখন আর এক ধরনের দেখা শোনার স্তরে যায়। এটাও দেখাশোনা, ওটাও দেখাশোনা, তবে দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সাধারণভাবে মানুষ যে দেখাশোনার স্তরে আছে, সেটা সারাজীবন কেন, জন্ম-জন্মান্তর ধরে চলছে। এই দেখাশোনার সাধ কোনদিন মেটেনি, আর মিটবেও না। যত দেখবে তত শুধু মন অস্থির, অশান্ত হয়ে যাবে। অথচ কোনও লাভও নেই। কিন্তু যখন মানুষ

ভগবানের ভাবে বিভোর হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে সেই দেখাশোনা শুরু হয়ে যায়। তলে তলে এই দেখাশোনার মধ্যে দিয়ে দেখাশোনার সাধটা আস্তে আস্তে মিটতে থাকে। এই দেখাশোনা আর ভালো লাগে না। তখন ধীরে ধীরে সে নিজের মধ্যে নিজে ডুব দেয়। বৈষ্ণব কবি যেমন গায়—'কৃষ্ণ রূপের সাগরে চোখ গেল আর ফিরে এল না।' চোখ সেই রূপ দেখে তৃপ্ত হয়ে গেছে। অন্তর ভরে গেছে। প্রাণ সেই বাঁশির সুর শুনে আর ফিরল না। সেই দেখাশোনাও থেমে যাবে, সে একদিন আত্মস্থ হবে।

প্রত্যেকটা দিব্য দেখা-শোনা-জানার মধ্যে দিয়ে তার এমন শক্তি সঞ্চয় হয়, মনটা উঠতে থাকে, মনের যে ক্রিয়াশক্তি, সেটাই পরিবর্তিত-উর্ধ্বায়িত হয়ে যায়। ধরে নেওয়া হচ্ছে সাধন-ভজন তার চলছে, এক জায়গায় সে থাকতে পারবে না। তাকে ক্রমেই আত্মস্থ করে। রূপের গভীরে যে আনন্দ, সেই আভাসের দিকে সে যায়। এ যদি না হয়, তাহলে দর্শনাদি তো পাগলামি। পাগল নিজের মত দেখছে, শুনছে, হাসছে, কত কি করছে। সে তো দর্শন নয়। নিজের স্বরূপ আনন্দে মানুষ বিভোর হয়ে যায়, আত্মানন্দি হয়ে যায়, সেদিকে তো যাবে। জীবনের সমস্ত অস্তিত্বটা পাল্টায়।

ব্যাকুল বলতে আমরা যা বুঝি সেটা পাল্টায়। চলতি যা ব্যাকুলতা, তার মধ্যে ছেদ আছে, নিরন্তর যে ব্যাকুলতা, তার মধ্যে কোন ছেদ নেই, তা গভীর, তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। সেই শান্ত ব্যাকুলতা তাকে অধিকার করে, যেখানে সে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়। অভেদানন্দ একবার কি কি দেখেছিলেন—অনেক কিছুই দেখতে পেতেন—ঠাকুরকে বললেন, আমার এই এই দর্শন হচ্ছে। দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—যা, তোর বৈকুণ্ঠ দর্শন হয়ে গেল, আর দর্শনাদি হবে না। শুনে অভেদানন্দ কি কাঁদল ভেউ ভেউ করে? না, দর্শনের উত্তর স্থিতির যে আনন্দ, তার আভাস তিনি পেয়ে গেছেন। এই সংসারে আমরা তো অকটোপাসের মত সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জগতকে জানছি, বুঝছি, অস্থির হয়ে আছি— কোন কিছু যেন বাদ না যায়। এরকম জীব অবস্থার পারে দিব্য দর্শনাদির, দেখাশোনা, জানার একটা বিশাল জগত, সেই ভাবের সাগর সাঁতরে সাধক আত্মস্থ হয়। তার পরে সেই জগত, যেখানে আস্বাদক, আস্বাদ্য বস্তু আর আস্বাদন একীভূত হয়ে যায়। আনন্দ আস্বাদনের জগত থেকে পরমানন্দের স্থিতি সেটা। ভাবের রূপ সাগরে ডুব দিয়ে অরূপ রতন পাওয়া, আর সেই অরূপ রতন সে নিজে।

* বলে, কারো রূপের দর্শনের সংস্কার থাকে, কারো থাকে না—

** রূপের দর্শনের সংস্কার থাকলে কেষ্ট-বিষ্টু দেখবে। রূপের দর্শনের সংস্কার যদি না থাকে অন্য কিছু দেখবে। আগুন জ্বলছে, শ্মশান, আলোর ঝর্ণা, এসব দেখবে। রূপ তো বটেই। রূপ চলে যাচ্ছে অরূপের ঘরে। রূপের সংস্কার আছে, রূপের সংস্কার নেই, মানে কি? ছাপ থাকে। জগত সংস্কার যখন মুক্ত হচ্ছে তখন সে মুক্তির দিকে যাচ্ছে। কিন্তু এই জগত-সংস্কারের একটা পরোক্ষ প্রভাব তার মধ্যে কিছুকাল থাকে। যার জন্য এই ভাবে ভগবান তাকে নিয়ে যাচ্ছেন আস্তে আস্তে। ভগবান দয়ালু তো। তাঁর যে শরণ নিচ্ছে তাকে তো তিনি নিয়ে যাবেনই। তার যাতে ভালো লাগে। তুমি কেষ্ট দেখ কি আগুন জ্বলছে দেখ, যে আলোতে দেখছ সেই আলোটা তো একই। সেই আলোটাই তো নিয়ে যাবে। কালী দেখ আর কৃষ্ণ দেখ, সেই একই তো। দেখছ তো সেই আলোতেই। নিজের আলোতেই তো দেখছ। সেই আলোটাই তোমাকে নিয়ে

যাবে। হয়ত একটা নীল ফুল দেখছ। বস্তুত সেই নীল জ্যোতিই দেখছ, কিন্তু তখনো তোমার দেখার সামর্থ তেমন পুষ্ট হয়নি, তোমার সংস্কার ছাড়া তো ভাবতে পারবে না। ভগবান কত দয়ালু, তিনি নিজের মত করে মানুষকে তৈরী করেছেন তো, তিনিই মানুষকে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর স্বরূপে, আস্তে আস্তে। এইগুলো বুঝতে পারলে খুব ভালো।

বহুকাল আগের কথা। সমীর বলে আমার এক বন্ধু ছিল। সে স্বপ্নে ঠাকুরকে দেখছে। স্বপ্নেই বলছে—আমি বুঝেছি, তুমি গুরুদাস। তখন ঠাকুর বললেন, 'আমি গুরুদাস নই, আমি সত্যি ঠাকুর।' ... তা, এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা। তিনি এই ভাবে নিয়ে যাচ্ছেন হাত ধরে ধরে। তিনি একদিন বলবেন—না, আমি গুরুদাস নই, আমি সত্যি ঠাকুর। তিনি তো দয়াল হরি, ফিরে তো যাচ্ছেন না, ফিরে তো যাননি।

ঈশ্বর মনস্কতা

যতক্ষণ সচেতন ভাবে, গভীর ভাবে তুমি চাইছ, তিনি আসছেন। তখন ভগবানের কথা গোটা মনের মধ্যে ভরে আছে। এটা যদি আমার অখণ্ড হয়, তাহলে কি হবে? ভগবান এসে বাকিটা পূর্ণ করে দেবেন। তখন দেখবে, যখনই কোন কাজের একাগ্রতার মধ্যে আছ, তিনি এসে যাবেন মনের নিভৃত স্তব্ধতার গভীরে—এই যে আমি এখানেও আছি। সাধকের জীবনটা যদি যথার্থ সাধকের জীবন হয়। হাবিজাবি করে বেড়ালে কি ভগবান বলবেন আমি আছি? এমন কি, কোন মহৎ জিনিস, অথবা বিশালতার ব্যাপ্তি দেখে আমি আপ্লুত হচ্ছি, তার মধ্যেও তিনি এসে বলবেন, আমি আছি। এই আছি—এ হতেই হবে। কোন কালে, কোন যুগে, কোন দেশে এর ব্যত্যয় হবে না। শর্ত শুধু একটাই—আমার সচেতনতার সীমা আমি পূর্ণ করতে পেরেছি তো?

☆ দেখছি, সব সময় যদি নাম করার চেষ্টা করি, অনেক ক্ষণ করার পরে দেখছি মনটা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছে।

☆☆ না, সেই ভাবে নয়। আধ্যাত্মিক সচেতনতার কথা বলছি, শুধু নাম করার কথা বলছি না। সামগ্রিক ভাবে ঈশ্বর মনস্কতার কথা বলছি, তা সে যে কোন ভাবেই হোক। মানসিকতাই বড় কথা।

☆ এর মধ্যে কোন মহাপুরুষের ভাবনা পড়ে?

☆☆ নিশ্চয়ই। এমন কিছু বলিনি, যা নেহাত বই পড়া, যা বলি তা নিজে করেছি। বই পড়া জিনিস বললে স্কুল-কলেজ হয়ে যাবে। কোন বই-এর উপমা দিতে পারি, নিজেকে ব্যক্তিগত ভাবে সেখান থেকে সরিয়ে রাখার জন্য এবং শাস্ত্রের সমর্থন।

কর। জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য নিজের সবসময় জাগিয়ে রাখা যায়। পারবে না সে, যার জীবন কপট আর জাগতিক উচ্চকাঙ্ক্ষায় ভরে আছে। এটা রেখে ওটা করলে ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাবে। আর, যার এসব নেই, সে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারবে। রবীন্দ্রনাথের একটা গান—

'যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু,
এবার এ জীবনে............
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।'

আমার বাবা একা একা থাকতে ভালোবাসতেন আর বিড়বিড় করে কি বলেন। একদিন দাঁড়িয়ে আছেন জানালার কাছে, ঐরকম বিড়বিড় ক'রে কি বলছেন। আমি পেছন থেকে এসে দাঁড়িয়েছি, কি বলছেন শুনব। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বলছেন আপন মনে—' যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।' অনেক কথা আমি শুনেছি, যেন গান নয়, মন্ত্রের মত বলছেন ধীরে ধীরে। অনেকে ভাবে, হয়ত অফিসের কথা বলছে, ভাবছে। ...তা, এই যে মানসিকতা, এটা খুব বড় কথা।

তা, ঐ 'যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই, শয়নে স্বপনে' সেটা তো মন দিয়ে বলেছিলেন। তাহলে ঈশ্বর মনস্ক থাকা যায়, সম্ভব। যারা বৈরাগী, তারা তো আরো বেশি পারবে। যখনই নিবিষ্ট হয়ে যাবে, যে কোন কাজে, ভেতর থেকে গভীর আধ্যাত্মিকতা গ্রাস করবে। ... মনের মধ্যে একটা আকুলতা ভেতরে ভেতরে জেগে থাকে—টিক্‌টিক। খাওয়া-দাওয়া, হাসি-গল্প, তার মধ্যেও। ক্রমে সেটাই সর্বাত্মক হয়ে ওঠে।

☆ ঐটাই ভাবছি, সবসময় তো জপ রাখা যায় না, মেন্টাল ফ্যাটিগ্ এসে যায়।

☆☆ কারণ মন্ত্রটা তার সহজ শক্তিতে সোজাসুজি এগুতে চায় তো। সেখানে সামগ্রিকতা বা ইচ্ছাশক্তিটা এই ভাবে জাগিয়ে রাখা যায়। আর, এই ঈশ্বর মনস্কতায় মনটা সেখানে ভেতরে ভেতরে আপ্লুত করে নেবে, সেখানে যদি ক্ষেত ভরা ধান দেখ, আকাশ ভরা তারা দেখ, একটা গরীব লোক পেট ভরে খাচ্ছে দেখ, আকাশে ঝিলিক দিচ্ছে বিদ্যুৎ দেখ, তাহলে দপ ক'রে জ্বলে উঠবে। কখনো বা অকারণেই।

মনে কর একটা দেশের সঙ্গে আর একটা দেশের যুদ্ধ হচ্ছে। একটা দেশ খুব শক্তিশালী, আর একটা দেশ দুর্বল,—তাও যুদ্ধ লেগে গেছে। সেক্ষেত্রে দুটো দেশ কি যুদ্ধ-কৌশল নেবে? যে দেশটা দুর্বল, সে চাইবে যুদ্ধটা খুব সীমাবদ্ধ রাখতে। আর যে দেশটা শক্তিশালী, সে চাইবে যুদ্ধের এলাকাগুলো বাড়িয়ে দিতে, ছড়িয়ে দিতে—আকাশ, জল, পাহাড়, মরুভূমি, সব জায়গায়। ঠিক তো? তেমনি সমর্থ সাধক যে, সে চাইবে যুদ্ধের এলাকা সর্বগ্রাসী হোক, যাতে একেবারে সমাধান হয়ে যায়।

আত্মমর্যাদা

প্রচ্ছন্ন হোক আর প্রস্ফুটিত হোক, অহংকার-অহংকার। অনেকেই বিনয়ের মূর্তি। প্রচ্ছন্ন আছে কিনা বুঝবেন কি ক'রে? তাকে প্রশংসা করুন তার বুদ্ধিটাকে অতিক্রম করে, যাতে সে বুঝতে না পারে, তখনই স্বরূপ দর্শন করাবে। অহংকার কি চেপে রাখা যায়, সে অন্ধকারের জিনিস।

আর আত্মবিশ্বাস। আত্মার প্রতি বিশ্বাস, আত্মার মহত্ত্বে বিশ্বাস। সে জীবনে কখনো কোন হীন কাজ করতে পারবে না। আমার মধ্যে তিনি আছেন, তাঁর মহত্ত্বেই আমার মহত্ত্ব, তাঁর সততাতেই আমার সততা, তাঁর নিষ্ঠাতেই আমার নিষ্ঠা। এই তো সত্যিকারের আত্মবিশ্বাস। একটা সম্পূর্ণ নিচের জিনিস, আর একটা সম্পূর্ণ উপরের জিনিস। এই যে ইংরেজিতে প্রেস্টিজ, পার্সোনালিটি যেসব কথাগুলো আছে, এইগুলো অপেক্ষাকৃত গোলমেলে। কিসের প্রেস্টিজ? আত্মারই প্রেস্টিজ। যার আত্মার সম্মান, আত্মসম্মান বোধ

আছে, সে কখনো কোন তুচ্ছতার-কপটতার মধ্যে যেতে পারবে? পারবে না। সেদিক থেকে সংস্কৃত বল, বাংলা বল, কথাটা খুব চমৎকার। যে ঠিক ঠিক আত্মবিশ্বাসী, সে যেমন নিজেকে সম্মান দিয়ে চলবে, অন্যের মহত্ত্বকেও তেমনি সম্মান দিয়ে চলবে। আত্মা তো স্বরূপতঃ একই। নিজের হীনতায় যেমন লজ্জিত, কুণ্ঠিত হবে, অন্যের হীনতাতেও তেমনি কুণ্ঠিত, লজ্জিত হবে। সে নিজের আত্মার গৌরব যেমন পছন্দ করে, তেমনি অপরের আত্মার গৌরবও পছন্দ করে। কার প্রেস্টিজ? প্রেস্টিজ যদি কিছু থাকে, নিজের স্বরূপ, নিজের মহত্ত্ব, তারই মর্যাদা। ইংরেজিতে প্রেস্টিজ আর ইগো অনেক সময় মিশে যায়। দেখবেন, নিবেদিতা, সারদা মা সম্বন্ধে ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—তিনি উন্নত মর্যাদা ও নারীত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠাতা। ভারী সুন্দর কথা। নম্র, ধৈর্যশীলা, বিনীতা, আবার নিজের মহত্ত্বে পরিপূর্ণা, সম্ভ্রান্ত সৌজন্যে পূর্ণা। মানুষকে এটা খেয়াল রাখতে হবে।

সাধারণ অজ্ঞ মানুষ অহংকার আর যথার্থ আত্মবিশ্বাস গুলিয়ে ফেলে। আত্মবিশ্বাস বলতে অহংকার, দাম্ভিকতার কথাই বোঝে। অথচ প্রচণ্ড ভাবে সে নিজের আত্মাকে ধিক্কার দিচ্ছে, অপমান করছে। কিন্তু মহৎ মানুষের মধ্যে বিনয়, নম্রতা, ধৈর্য-স্থৈর্য—নিজেকে নত করছে। আবার নিজের আত্মার মহিমায় অভ্রভেদী হয়ে আছে। কারণ, তাঁরা জানেন কোনটা দাম্ভিকতা, কোনটা আত্মসম্মান, কোনটা আত্মম্ভরিতা, কোনটা আত্মবিশ্বাস। দুটোর পার্থক্য তাঁরা বোঝেন। মহৎ মানুষের, সাধারণ হীন বা বেগুণওয়ালা মানুষের সংস্পর্শে যে তুচ্ছতার—হীনতার অভিজ্ঞতা হয়, তা তাঁকে কখনো বিচলিত করে না। যে যথার্থ আত্মবিশ্বাসী, সে নিজে জানে—আমার সত্যিকারের মহত্ত্ব কোথায়। নিজে যদি সৎ থাকি, আদর্শনিষ্ঠ থাকি, তাহলে জগতের কোন কিছুই তার মর্যাদাকে নষ্ট করতে পারে না। সেখানে আমি অচল, অটল হয়ে আছি অভ্রভেদী মহিমায়। তার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিই আলাদা, তা কখনো কোন পরিস্থিতিতেই ক্ষুণ্ণ হবে না। বল ঠিক কিনা দুলুবাবু? আমি যদি না আমার মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করি, কেউ আমার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না। আর আমি যদি আমার নিজের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করি, তাহলে জগতের কেউই আমায় মর্যাদা দিতে পারবে না। আমার মর্যাদায় নিয়ত সত্যস্থিত থাকব। এটাই আত্মমর্যাদা।

☆ ক্ষেত্র বিশেষে খেয়াল রাখা শক্ত।

☆☆ খেয়াল আবার কি রাখবেন? নিজের যথার্থ আত্মিক বিকাশ যত বেশী হবে, সে তত বুঝতে পারবে কোথায় আত্মার বিকাশ, আমার আত্মমর্যাদা কোথায়। কোথায় আমি মহৎ, সত্যস্থিত। নজরুলের কবিতা পড়বেন—

"বল বীর, চির উন্নত মত শির
শির নেহারি আমার নত শির ঐ শিখর হিমাদ্রির।"

বলছেন, আমি যে বীর, আমি সমস্ত অসত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি, তোমার ঐ খোদার আসনকে ছাপিয়ে আমার মাথা উঁচু হয়ে আছে। কত বড় কথা। আবার রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পৃথিবী' কবিতায় বলছেন,—যদি এই তুচ্ছতার খেলাঘরে জীবনের একটি মুহূর্তকেও সত্য-মূল্য দিয়ে থাকি, তবে সেই মুহূর্তটি নিজ মহিমায় শাশ্বত কালের আসনে স্থান

পেয়েছে। এইরকম কথা। কতখানি তাঁরা আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই ঠুনকো জগতে কি মহিমার কথা বলে গিয়েছেন। সোনার রেণু সব ছড়িয়ে আছে।

মহাপুরুষের জীবনী

যখনই কোন মহাপুরুষের জীবনী পড়বে, ভাববে যে তিনি আমার সামনে উপস্থিত, আমি তাঁর সামনে উপস্থিত। তিনি আমার মধ্যে, আমি তাঁর মধ্যে। এসব ভাববে, তাহলে মনের একাগ্রতার জোর থাকলে পৌঁছে যাবে। যে কোন ভাগবত-স্বরপ মহাপুরুষ তিনি তো ভগবানই। কাজেই সবসময় আছেন, সবখানে আছেন। এ যদি না হয়, তাহলে তিনি ভাগবত স্বরূপ হলেন না। তিনি উপস্থিত, অন্ততঃ এটুকু ভাববে। ভাবনা যদি গভীর হয়ে যায়, তাহলে অধিকতর সার্থকতা, সেখানে জীবনটাকে স্পর্শ করা যায়। একজন মহাপুরুষের জীবনের কথায় তাঁর জাগ্রত উপস্থিতি। ভাববে, যেমনটা ছিলেন, তেমনটাই আছেন। এটা বাস্তব সত্য ভাবতে বলছি। আগেকার দিনে বলত ৩৩ কোটি দেবদেবী। এখন যদি বলি ৩৩ হাজার কোটি দেব-দেবী, তাহলেও ভুল হবে না। যাঁরা ভগবানকে পেয়েছেন, তারাই ভগবান হয়ে গেছেন। কাজেই সবই তো দেবদেবী। দেব-দেবীর সংখ্যা তো বেড়েই যাচ্ছে। সকলেই ভগবান। কাঠিয়াবাবার একটা ছবি ছিল, তিনি সেটা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই প্রণাম করলেন। একজন শিষ্য ছিল, সে জিজ্ঞেস করল—আপনি প্রণাম করলেন। তিনি বলছেন—'এ তো সাক্ষাৎ ভগবানের ছবি।' এ যদি না হয়, তাহলে তিনি ভগবান নন। তোমার যতটুকু উপলব্ধি, অনুভূতির সীমা—একজন যথার্থ মহাপুরুষের ছবি দেখ, জীবনী পড়, কথা শোন শ্রদ্ধা নিয়ে, নিষ্ঠা নিয়ে, যতই সামনা-সামনি হয়ে যায় ততই তোমার সীমাটাই আল্গা হয়ে যায়। তোমার যতদূর ক্ষমতা তাঁকে অনুভব করছ। যেন একটা এমনি তার আর বিদ্যুৎ গেছে এমন একটা তার। মহাপুরুষের জীবন হচ্ছে ঐ বিদ্যুৎ যাওয়া তার। যদি তুমি ছুঁতে পার নিজেই বুঝতে পারবে। দেহ রেখেছেন— সেটা পার্থিব মাটির দেহটা পড়ে গেছে, কিন্তু সেই অবিনা, শাশ্বত, চিন্ময় দেহ তো তৈরী হয়ে গেছে, সেটা চিরকালই থাকবে। আর ঐ কথা—সবখানেই আছেন, সবসময় আছেন।

পড় সেই একাগ্রতা নিয়ে, সেই শ্রদ্ধা, সেই নিষ্ঠা নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে। নিবিষ্ট হব বললেই তো আর হওয়া যায় না। জীবনের মধ্যে সেই নিবিষ্টতা লাগবে। এ তো সার্কাসের খেলা নয় যেটুকু দরকার করল আবার যেমন-তেমন হয়ে গেল। এই নিবিষ্টতা তো সুগভীর। কাজেই এই নিবিষ্টতা আনতে গেলে পুরো জীবনের মধ্যে সেটা আনতে হবে। নাহলে তো স্পর্শ করা যাবে না। সেই নিবিষ্টতা নিয়ে মনন করলে জীবনের সঙ্গে সেই মহাজীবন যুক্ত হয়ে যাবে। সেই জীবনের তাপ লাগবেই। সব মহাপুরুষের ভাব বিচিত্র হলেও একই ভগবানের তাপ। সেই এক গঙ্গাজল আছে, যে পাত্র থেকেই নাও। কাজেই, যতই জীবনী পড়, সেই এক তাপ আসছে, গভীর থেকে গভীরতর হয়ে। তখন বই খোলা রইল কি বন্ধ রইল।

এইজন্য আমি এখানে খুব প্রেরণাদায়ী, জ্বলন্ত জীবনীগুলো পড়তে বলি, সেখানে জীবনের স্পর্শ আছে। মানুষ যে মহাপুরুষদের জীবনী পড়ে প্রেরণা পায় বা উদ্দীপ্ত হয়, তার কারণটা বুদ্ধিগত নয়, সেই প্রেরণাটা বুদ্ধির অতীত স্তর থেকেই আসে।

মহাপুরুষের জীবনের যে সার বোধ, সেই চৈতন্য স্বরূপতা থেকেই প্রেরণা পায়। সেইজন্য কোন মহাপুরুষের জীবনী যদি অন্য কোন মহাপুরুষ লিখে থাকে, সেটা আরও ভালো, সেখানে আরও শক্তি থাকে। ভাগবতে বলছে—"তপ্তজীবনম্-তব কথামৃতম্।" গোপী গীতা। তাঁর জীবনটা হচ্ছে তপ্ত জীবন। তপ্ত জিনিস স্পর্শ করলে তো তাপ লাগবে। সেই নিঃশ্বাস গায়ে লাগে, প্রেরণা আসে। 'মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তীতত্র তিষ্ঠামি নারদ।'

ভগবান তো সর্বত্রই আছেন, যে তাঁকে আবাহন করবে, তার কাছেই প্রকাশিত হবেন। যখন তুমি সেই জীবনের মধ্যে অবগাহন করে অভিভূত হয়ে যাচ্ছ, তখন তোমার বুকের মধ্যেই তাঁর আসা-যাওয়া। এতে উদ্দীপ্ত হয় মানুষ। যথার্থ মহাপুরুষের জীবনী জীবন্ত। মানুষ যেমন হাত পা নেড়ে ঘুরে বেড়ায়, এই বইগুলোও ঘুরে বেড়ায়। আন্তরিক নিষ্ঠাবান সাধক কোন বই পড়তে ইচ্ছে করেছে, সেই বইটা কোন না কোন ভাবে এসে যাচ্ছে। কোন কথা জানতে ইচ্ছা করলে সেই কথাটা এসে যাচ্ছে। এ তো হরদমই হয়। মানুষের বুদ্ধির সীমানায় যেটুকু বলা যায়, সেটুকুই বলা। গোঁসাইজীর জীবনীতে আছে, একটা বই অভিযোগ করেছে—আমাকে উল্টো ক'রে রেখেছে। তিনি কুলদাকে বলতে সে গিয়ে দেখে স্তম্ভিত। উল্টো করেই রাখা আছে। এযে পাতায় পাতায় তাঁর কথা আছে। ছবির মধ্যে, মূর্তির মধ্যে প্রাণ থাকে, আর বই-এর মধ্যে থাকবে না যেখানে এত কথা আছে। আলবত আছে। যাতে প্রেরণা পাওয়া যায়। জানার কথা নয়, বোঝার কথা। জানার কথা দ্বিতীয় কথা, প্রথম কথা বোঝা। অন্তরে তার প্রেরণা পাওয়া। তাই হিন্দুরা-শিখেরা বই পুজো করে। একটা গান আছে—'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা'। আর এমন এক একটা বই আছে যে, ধাক্কা মারে। তখন আমি বলি—আমার ঘাড় ধ'রে তুমি নিয়ে চল সখা। তুমি সেই নিষ্ঠা নিয়ে, সেই প্রেরণা নিয়ে পড়। আর যখন নিজেই কিছু বুঝতে পেরে গেলে—তখন আরও আনন্দ।

অবলম্বন

আমার এই চেয়ারটা যেমন এখন আমার শারীরিক ভারসাম্য রক্ষা করছে, তেমনি মানুষের মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করছে তার পরিচিত জগতটা কিন্তু ভগবানের আনন্দ, ভগবানের ধ্যান হচ্ছে নিরপেক্ষ, নিরালম্ব। এটা বাস্তব সত্য যে, আমার ভালো লাগা না লাগা—আমার মনের পরিচিতি যেখানে নির্ভর করে আছে, ভগবান তো সেখানে নেই। ভগবান অলখ নিরঞ্জন। ভগবানের আনন্দ-এই যে বলি না মুক্ত আনন্দ-মুকুন্দ, একটা শিশু তার পায়ের বুড়ো আঙুল চুষেই অপার আনন্দে ভাসছে। তেমনি আমার মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করছে আমার পরিচিত বা সম্পর্কিত পৃথিবী। মনে করুন, আমরা তো জানি, যাঁরা উচ্চকোটির সাধক, তাঁরা নিরালায়, একান্তে চলে যান—এই পরিচিত সমাজের বাইরে, সেখানেই তাঁদের স্বস্তি, স্বানন্দ। কেননা তাঁরা আত্মার আনন্দকেই জীবনের সর্বোত্তম সত্য ও একমাত্র অবলম্বন করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটা তো একদম জেলখানা। কেননা তার পরিচিত জগত, ভালো লাগার জগতটা তো সেখানে নেই। সাধক কোথায়, একান্তে আসন পাতে। অনেকে পরিব্রাজক জীবনে ব্রতী হয়। সেখানে শুধু উন্মুখ অন্তর গভীরভাবে প্রত্যাশী হয়ে আছে।

অভ্যস্ত জগতের মধ্যে ভালো লাগা, না লাগা আছে। ভালো লাগা থাকলে না-লাগাও আছে। দুটো জিনিস আছে—সেটা আমার মনের অবলম্বন। মানুষের আধ্যাত্মিক বিবর্তনের স্তরে স্তরে সে ক্রমশ স্থূল অবলম্বন ছাপিয়ে সাংস্কৃতিক তথা নৈতিক অবলম্বন এবং প্রান্তিক স্থিতিতে একমাত্র আত্মার গৌরবেই মহিমান্বিত হয়। মনের গভীরে নিরপেক্ষ হতে হবে। যেমন স্থূল জীবন বহন করছে, মানসিক জীবন বহন করছে, শুধু তা নয়, চরমে আধ্যাত্মিক জীবন বহন করতে হবে। একটা ভ্যাবা গঙ্গারাম, তার ভালো লাগা না লাগার কোন জগত নেই, সে একটা চরম মানসিক জড়তার মধ্যে বিরাজ করছে। সেটা তো এখানে অভিপ্রেত নয়। এমনকি নৈতিক স্থিতির জড়তাও অভিপ্রেত নয়। এখানে আধ্যাত্মিক আনন্দের মধ্যে সে স্থিতি লাভ করবে, মানুষ জীবনের সেটাই সর্বোত্তম সফলতা। সেটা তার দিব্য অস্তিত্ব বলা যেতে পারে। মনের অতীত-আনন্দে স্থিতিলাভ করেছে। এইজন্য কথামৃতে দেখবেন, ঠাকুরের কথা-আগের সব শাস্ত্রে বলেছে—বৈরাগ্য হচ্ছে বিষয়ে অনাসক্তি কিন্তু ঠাকুর বলছেন—না, শুধু বিষয়ে অনাসক্তি নয়, ঈশ্বরে প্রেম হয়ে বিষয়ে অনাসক্তি। —এত কথার পরিপ্রেক্ষিতে দেখ এই কথাটা কত সত্যি। আর সাধনার পথে পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তিত অবলম্বন-জনিত যে উন্নত বা পরিবর্তিত মূল্যবোধ, তাকে যাতে সহজেই গ্রহণ করতে পারি-সেজন্য যারা সাধক, তাদের বলছেন—মাঝে মাঝে নির্জনবাস।

তপস্যা

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তীর্থ হচ্ছে নিজের ঘরের কোণের নিজের আসনটি। এর চেয়ে বড় তীর্থ নেই। তীর্থে যাওয়া আমি অস্বীকার করছি না, সেটা উদ্দীপনের জন্য, আমিও যাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, উদ্দীপন উপলক্ষ মাত্র। লক্ষ্য নয়। সাধু বলতে, যারা ভগবানের পথে চলতে চায়। তপস্যাই তার সবচেয়ে বড় দরকার অধিকার। অধিকার প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল, সুফি সাধকদের বলতে শুনেছি—নমাজ আদায় করা। তাই নিজের আসনের নিষ্ঠা, নিজের আসনের মর্যাদা, যেন প্রাণ গেলেও ক্ষুণ্ণ না হয়। কেননা, তাহলে এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তীর্থের অমর্যাদা করছ। আসন যেন উপবাসী না থাকে।

আমাকে একজন বলল, 'ওসব জায়গায় যাই অনন্তের ভাবনার জন্য'। আমি বললাম, যদি বলি সাগর অনন্ত, হিমালয় অনন্ত, আর আমার ঘটি-বাটির মধ্যে অনন্ত নেই, তাহলে অনন্ত কথাটার মানেটাই হারিয়ে যায়। ঠিক কিনা? আমার মুঠোর মধ্যে অনন্ত। যখন অনন্ত বলছি, সব জায়গায় অনন্ত। অনন্ত একটা ভাবনা, যখন আমাদের ব্যাপ্তির ভাবনা অনুভবের সীমিত সামর্থ স্পর্শ করে, তখন আমরা বলি অনন্ত। যা কিনা বলা যায়—অনন্তের শান্ত মূর্তি। আর পরের কথা হচ্ছে, অনন্ত একটা অখণ্ডের বোধ। অনন্তের ভাবনা যদি আনতে পারি, তাহলে সব জায়গায় অনন্ত। কাজেই, আমরা যদি বলি, আঃ! কি অনন্ত। এটা একটা বিলাসিতা। নিষ্ঠাবান জীবনে তপস্যার গভীরতায় সাধক যখন ধ্যানের সামর্থ লাভ করে, তখনি সে কিঞ্চিৎ অনন্তের আভাস পায়।

স্বপ্ন নিয়ে অনেকেই বলে, আমি এই স্বপ্ন দেখেছি, ঐ স্বপ্ন দেখেছি। আমি পুরনো

একটা গল্প বলি—দিলীপ সেনের মা স্বপ্ন দেখেছে আমাকে রসগোল্লা খাওয়াচ্ছে, তাই ছেলেকে দিয়ে এক হাঁড়ি রসগোল্লা পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি বললাম, আমি তো নিতে পারব না।

কেন?

বললাম, এর পরে যদি দেখে কান মুলছে, তখন তো কানটা বাড়িয়ে দিতে হবে।

মজার কথার মধ্যে একটাই কথা, আমি যে স্বপ্ন দেখি, তার একটাই উদ্দেশ্য, একটাই তাৎপর্য, সেটা আমার জীবনে ঈশ্বর-উদ্দীপনা, ঈশ্বর মনস্কতা, তপস্যার প্রবণতা আনতে পারছে কি? এ যদি না হয়, গোলক, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, যাই দেখি সব ভুয়া। এই জীবনটাই তো একটা স্বপ্ন, তার উপর আবার স্বপ্ন। স্বপ্নের ডামাডোল। সুতরাং, তার কি মূল্য থাকতে পারে? আর যদি বা কিছু মেলে—সেটা কাকতালীয় ব্যাপার।

তেমনি তীর্থে যাওয়া বা জীবনের যে কোন আনন্দ-আস্বাদনের একটাই সার্থকতা, আমাকে ভগবানের পথে কতখানি প্রেরণা দিচ্ছে। এছাড়া আর কিছু নয়। দুনিয়ার লোক তীর্থ করে বেড়াচ্ছে। লোককে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। তাতে তো বন্ধন ছাড়াতে গিয়ে আরও বন্ধন। কিঁউ বন্ধনমে যাওগে?

বাবা-মা

★ 'বাপ-মাকে যে ফাঁকি দেবে, তার কিছু হবে না'—এটা কি অর্থে বলেছেন?

★★ 'লৌকিকভাবে মানুষের কিছু দায়-দায়িত্ব আছে। জাগতিক ভাবে তাদের দেখাশোনার একটা দায়িত্ব আছে, সেটা সে অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু জীবনের দায়িত্ব তো শুধু লৌকিক নয়। দায়-দায়িত্ব তিনটে লৌকিক, মানবিক, পারমার্থিক দায়-দায়িত্ব।

বাবা, মা লৌকিক জীবনের বাবা, মা তো বটেই, মানবিক এবং চরমে পারমার্থিক আদর্শের রূপায়ন যদি সেখানে অব্যাহত-প্রবাহিত থাকে, তবে শ্রদ্ধা সেখানে সীমাহীন। নৈর্ব্যক্তিক ভাবে পারমার্থিক জীবনের যে আদর্শ, সেই পারমার্থিক মূল্য, আদর্শটুকুই বাবা, মা। আত্মিক জীবনের যে আনন্দের আদর্শ, সেই অর্থে আত্মিক জীবনের বাবা, মা। একটা আর একটাকে অতিক্রম করে না। লৌকিক জীবনের দায়-দায়িত্ব সে নিশ্চয় পালন করবে, লৌকিক জীবনের পথে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ দায়িত্ব আছে। ঠাকুর বলে গেছেন, ভগবানের জন্য বিভীষণ দাদার কথা শোনেনি, প্রহ্লাদ বাবার কথা শোনেনি। সুতরাং, এসব নামগুলো তো তিনি করেছেন। সেইগুলো তিনি সমর্থন করেছেন। কাজেই কর্তব্য বা আদর্শের স্তর আছে। একটা স্তর যদি আর একটা স্তরকে অস্বীকার করে, সেখানে সত্যকে অস্বীকার করার সমস্যা নিশ্চয়ই হ'তে পারে। নিচের স্তর যদি উপরের স্তরকে গ্রাস করতে চায়, সেটা তো সম্ভব নয়। সবটারই স্তর আছে। লৌকিক ভাবে কর্তব্য আছে। কিন্তু শ্রদ্ধা তখনই হবে, যখনই লৌকিক স্তরটা পারমার্থিক স্তরের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে মানুষকে। যদি লৌকিক জীবনের মধ্যে সেই মানবিক জীবন, এবং আত্মিক জীবনের প্রসার বা স্বীকৃতি না থাকে, তাহলে মানুষের শ্রদ্ধা কি করে আসতে পারে? কাজেই কর্তব্য একটা, শ্রদ্ধা একটা। ঠিক কিনা? কর্তব্য লৌকিক ভাবে। শ্রদ্ধা কি কেউ জোর করে আদায় করতে পারে? শ্রদ্ধা হচ্ছে অবাধিত, স্থূলতাব কোন

মানা সে মানে না। ঠাকুর বাবা, মা বা গুরুজন সম্বন্ধে যা বলে গিয়েছেন, আমার মনে হয়েছে এই কথাটাই।

অন্তর্জীবনে বিরোধ

গীতা — গুণত্রয় বিভাগ যোগ

১০. সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়।

১১. যখন এই দেহে শ্রোত্রাদি সর্ব ইন্দ্রিয় দ্বারে জ্ঞানাত্মক প্রকাশ অর্থাৎ নির্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন জানিবে যে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

সাধারণ মানুষ, যাদের চেতনা নীচের স্তরে, তাদের মন-বুদ্ধি শুধু আলাদা কাজ করে তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই একটা পারস্পরিক বিরোধ এসে যায়। মন বলে এটা কর, বুদ্ধি বলে—না করো না। আবার উল্টোও হ'তে পারে।

উন্নত পুরুষের, মহাপুরুষদের মন-বুদ্ধির সাম্য থাকে। মন যা বলে, বুদ্ধিও তাই বলে। দুটো কখনোই আলাদা হবে না। এটা একদিকে যেমন তাঁর গভীরতর আত্মিক সত্তার আবির্ভাবের কথা ঘোষণা করে, অন্যদিকে তেমনি তাঁর ব্যবহারিক জীবনের প্রশান্ত ব্যক্তিত্বের কারণও বটে। সাধনার মধ্যে দিয়ে সংশয়াত্মক মন, সংকল্প-বিকল্পাত্মক বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক হবে। তখন দুটোর সাম্য হয়। কেননা পরম চেতনার অনুবর্তী হয়।

নীচের দিকে যাওয়ার রাস্তা বিরোধ-বৈচিত্রের পথ ধরেই। আর উপর দিকে যাওয়ার রাস্তা বিরোধ-বৈচিত্র উত্তরণের মধ্যে দিয়ে।

যাদের মন বুদ্ধির সাম্য হয়েছে, তারা পথে বেরুলে যে দৃশ্য দেখবে না মনে করে, তা দেখবে না ; আর যে দৃশ্য দেখবে মনে করে, তাই দেখবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কি হয়? যারা অল্পদিন সাধন-ভজন করছে, বিরোধ যাদের যায়নি, তারা ওদের কথায় বলে—এইগুলো কি সম্ভব। হ্যাঁ, সম্ভব। শুধু পথে-ঘাটে কেন, ক্রমশ গোটা জীবনেই এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার এক পরম অভীপ্সায় জেগে থাকে।

উন্নত সাধকদের জীবন-পরম চেতনার অনুবর্তী জীবন। দেহ্-মন-বুদ্ধির সাম্য হয়েছে। বুদ্ধি যা বলবে, মন তাই বলবে শুধু নয়, দেহও তাই বলবে। দেহ তো মনেরই অনুবর্তী। তাঁদের বেচাল কিছুই হবে না। কেননা, তাঁরা বা তাঁদের জীবন পরম চেতনার অনুবর্তী। মহাপুরুষদের তো কথাই নেই। স্বামীজীর অসুখের সময় কবিরাজ বলল, 'জল খেতে পারবেন না।' স্বামীজী বললেন, 'জল খাব না।' গুরুভাইরা বললেন, 'সে কি করে সম্ভব, তুমি এত জল খাও। তিনি বললেন, 'সে কি রে? যখন বলেছি জল খাব না, তখন গলায় ঢেলে দিলেও ঢুকবে না, গড়িয়ে পড়ে যাবে।' তাঁর জীবন তো পরম চেতনায় প্রতিষ্ঠিত যা মনে করবেন, তাই হবে।

আমি যে ভাবে বলছি, জিনিসটাকে সেই ভাবে নাও। পতঞ্জল যোগসূত্রে 'সিদ্ধসংকল্প' ইত্যাদি বলেছে, সেদিক দিয়ে নিও না। এই ভাবে নিলে জিনিসটাকে ছোট করা হয়। অনেকে ত্রাটক ইত্যাদি করে, কিন্তু মন শুদ্ধ না হলে ওসব কোন কাজে আসে না।

ঠাকুর মনে করেছেন ধাতুর দ্রব্য স্পর্শ করবেন না; তা, তাঁর অজান্তে বিছানার নীচে ধাতু রেখে দেওয়াতেও তিনি যন্ত্রণায় কাতর হচ্ছেন দেখতে পাই। ঠাকুর একটা কথা বলেছেন, 'যে নাচতে জানে, তার বেতালে পা পড়ে না।' কথাটার অর্থ এই—জীবন পরম চেতনায় একীভূত, একাকার।

আমাদের উপনিষদের কথা আছে—.......। যা ভদ্র, শোভন, সুন্দর, তাই যেন কানে শুনি, চোখে দেখি, মুখে বলি। এ বলব বলে বা করব বলে নয়, এ হবেই। যার জীবন পরম চেতনায় প্রোজ্জ্বল হয়েছে, তারই হবে, তাকে করতে হবে না। ঐ যে গান্ধিজীর বাঁদরের কথা আছে, 'খারাপ জিনিস দেখব না, খারাপ জিনিস শুনব না, খারাপ কথা বলব না,'—তিনটে বাঁদরের মূর্তি আছে দিল্লিতে—লোকে ছবি তোলে, সে অনেক নীচের জিনিস, অনেক ছোট জিনিস। উপনিষদের কথাটাই সঠিক। 'সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু'—এ ঋষির ঋত প্রজ্ঞা নিসৃত আশীর্বাণী। আমাদের ভিতর বিরোধ আছে, তাই যেটা ভাবছি করব না, সেটাই ক'রে ফেলছি, যেটা ভাবছি বলব না, সেটাই বলে ফেলছি, যেটা ভাবছি দেখব না, সেটাই দেখে ফেলছি। কিন্তু কেন পারব না? ঘুমের মধ্যে গায়ে মশা বসলে তো তাড়িয়ে দিই। তাহলে জেগে তা বটেই, এমন কি ঘুমের মধ্যেও অন্য চিন্তা আসলে কেন তা তাড়াতে পারব না? সেসব পারি না, কারণ সেসবের প্রতি আমাদের ভেতরে কোথাও সমর্থন থাকে, সহানুভূতি থাকে। অন্তর্জীবনে বিরোধ-বিসংবাদের পথ ধরেই যত দুর্বলতার আনাগোনা। শ্যামা সংগীত আছে না—'আসক্তি সে গাড়ছে শিকড় মনের মাটি নরম বলে'। বলে, ভগবান ইচ্ছা করলেন, সৃষ্টি প্রকাশ হল। তাঁর এক ইচ্ছেতেই এত বিচিত্র-বিভ্রম সৃষ্টি হ'ল। তাহলে আমরা যথার্থ ইচ্ছা করলে কেন এসব—যেগুলো আমরা মনে করছি ঠিক না, সেগুলো তাড়াতে পারব না?

এই যে বললাম, গীতার এখানকার বক্তব্যই তাই। জীবন যদি পরম চেতনার অনুবর্তী হয়—এই দেহে, শ্রোত্রাদি সর্ব ইন্দ্রিয় দ্বারে নির্মল জ্ঞানাত্মক প্রকাশ প্রতিষ্ঠিত হবে।

একাগ্রতা অন্তর্মুখীনতা

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একটি কথা বলেছেন—পরমাত্মা বিষয়ে মন স্থির করা নিয়ে—অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের কথা। পুনঃপুনঃ অভ্যাস-নিবিষ্ট হওয়ার জন্য চেষ্টা করা। আর একটা—সর্ব বিষয় থেকে মনকে সংহৃত করে আনা, গুটিয়ে আনা। এক হিসাবে দুটোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ আছে। তবুও দুটোর মধ্যে সাধ্য-সাধন তত্ত্বগত কিছু পার্থক্য আছে। একটা তাৎক্ষণিক আর একটা চিরন্তন বা জীবন জোড়া। সেইজন্য তিনি দুটোকে আলাদা ক'রে উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়ে আলোচনা করলে মনে হয় যে, একাগ্র হওয়া এবং অন্তর্মুখ হওয়া, এই দুটোর মধ্যে এরকম পারস্পরিক সম্পর্ক থাকলেও দুটোর ভিন্নতা আছে। কেননা, আমাদের সমাজে দেখা যায়, যে কোন বিষয়ে বিখ্যাত হয়েছে, নাম করেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান বল কি শিল্প-সংস্কৃতি বল—সকলেই কোন না কোন বিষয়ে নিবিষ্টি হয়েছে, একাগ্র হয়েছে। বস্তুত জাগতিক সিদ্ধির চাবিকাঠিই আছে এর মধ্যে। কিন্তু যারাই এই ভাবে বিখ্যাত হয়েছে, সফল হয়েছে, তারাই যে অন্তঃনিবিষ্ট হয়েছে, এই কথা কেউ মনে করে না। একাগ্রতা এবং অন্তর্মুখীনতার মধ্যে ফারাক দেখা যায়। যারা বিচিত্র সাধনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল হয়েছে, তাদের জীবনে গভীরতর নিষ্ঠা, একাগ্রতার কথা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু সেই অন্তর্মুখ ভাব, অন্তর্মুখ জীবন, যাতে পরমাত্ম ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তাদের জীবনে তা কতখানি আছে, এই প্রশ্ন সবসময়েই উঠতে পারে। সুতরাং একাগ্রতা এবং অন্তর্মুখীনতা—দুটোর মধ্যে

নিশ্চয়ই দূরত্ব আছে। এই বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি কথা বলেছেন—'হাজরা খুব একটা লোক, খুব জপ করে কিন্তু দেশের বাড়ির প্রতি মন পড়ে আছে, সেখানে তার কর্জ আছে'। সুতরাং, খুব লোক, খুব জপ করে, আবার দেশে মন পড়ে আছে-কর্জের দিকে। তাই এই একাগ্র হওয়া আর অন্তর্মুখীনতার ক্ষেত্রে দূরত্বের কথা স্বতই মনে এসে যায়।

আবার একটা কথা ঠাকুর বলেছেন—"যারা কোন একটা বিষয়ে খুব নাম করেছে, তাদের মধ্যে ঈশ্বর লাভের একটা সম্ভাবনা আছে। সুতরাং একাগ্রতা জীবনে একটা সম্ভাবনা এনে দেয়। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। যারা একাগ্র হয়েছে, তারাই যে আধ্যাত্মিক হয়েছে, একথা বলার মত মুর্খতা আর কিছু নেই। তাদের জীবনে ঈশ্বমনস্ক হওয়ার একটা সুযোগ আছে। তাদের অন্তঃনিবিষ্ট হতে হবে। এরকম একটা কথার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, একদিন বেলুড় মঠে সাধু-ব্রহ্মচারীরা গঙ্গা থেকে মাটি কেটে এনে অসমান জমি ভরাট করছিল। স্বামী জগদীশ্বরানন্দের লেখা স্বামী তূরীয়ানন্দ বইতে আছে—তূরীয়ানন্দজী বললেন, 'বাঃ, খুব ভালো কাজ করছে, খুব উদ্যম, অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করছে। কিন্তু আমার কথা—এই উদ্যম-অধ্যাবসায় নিয়ে যদি ওরা ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য মন দিতে পারে, সিদ্ধ হবে, না হলে একটা ভালো কুলি হবে।' এ ভয়ানক কথা। শুধু নিষ্ঠা নিয়ে ঐ পর্যন্ত হতে পারে, জাগতিক ভাবে কোথাও সফল হতে পারে, কিন্তু পারমার্থিক সাফল্য আনা অনেক দূর। যতক্ষণ না অন্তঃনিবিষ্ট হতে পারছে, ততক্ষণ সম্ভব নয়। এই অন্তর্মুখ হওয়া, এটা অন্তরক্ষেত্রে ক্রম-বিকাশের পরিণতি সাপেক্ষ। যতদূর তার অন্তর পরিণত হবে, যতদূর সে বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে, যতদূর তার আন্তরপদ্ধতি প্রকৃতির বিপরিণামে যাবে, সেখানে সে যতখানি সফল হবে, ততখানি অন্তর্মুখ হবে। এবং, এই অন্তঃনিবিষ্ট হওয়ার যে ক্রম-বিকশিত পদ্ধতি, সেটাই সাধনার ক্ষেত্রে সফলতা এনে দেয়। আর এখানেই জাগতিক সফলতা এবং সার্থকতার সঙ্গে পারমার্থিক সার্থকতা, সফলতার একটা অন্তর বা ভেদ আছে। যে মানুষটা জীবন-বৈচিত্রের সাধনার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানের উন্নতি ত্বরান্বিত করছে, যে মানুষটা ৮-১০ ঘণ্টা ধরে উচ্চাঙ্গের রাগ-রাগিনীর আলাপে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে, সে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এগিয়ে গেল—একথা বলা যাবে না—যদি না সে অন্তরক্ষেত্রে নিবিষ্ট বা অন্তর্মুখ হতে পারে। অন্তরক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হওয়ার পথ যদি তার কাছে খুলে যায় এবং নিষ্ঠা, একাগ্রতা নিয়ে এ পথে সে থাকে, তা হলে আনন্দময় উপলব্ধি-নিষ্ঠ জীবনে আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব থাকে না।

আমাদের দেশে, সমাজে কোন এক সময়ে সতীত্বের উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ কিনা, পারস্পরিক নিষ্ঠা। এই পারস্পরিক নিষ্ঠা দেহ এবং মনোগত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। একটা পুরুষ এবং একটা নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক, যা বিয়ে নামক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সঙ্কল্প করে সীমাবদ্ধ করা হয়। সীমাবদ্ধ করা হয়, কেননা পশু-পক্ষীর অবাধ মিলনের মধ্যে তো কোন সীমা নেই। যাতে তার ব্যাপ্তির স্থূলতা অতিক্রম করে। যা ছিল দেহগত কাম, তা ছাপিয়ে মনোগত ভালোবাসা। তারপর অন্তরক্ষেত্রে, প্রাণের ক্ষেত্রে তা পবিত্র প্রেমে রূপ নিতে পারে। সুতরাং আমাদের নিষ্ঠা, আমাদের একাগ্রতা, স্তরে স্তরে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে আত্মার খবর এনে দিতে পারে। কি মহান ভাবনা আমাদের সমাজ জীবনের মধ্যে—গভীরতর স্তরে যাতে প্রত্যেকটা

মানুষ এই ভাবে এগিয়ে যেতে পারে। এর সমর্থন পাবে বিশেষ করে বৃহদারণ্যক উপনিষদে, যা যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি প্রকাশ করেছেন যে, 'আত্মার জন্যই আত্মা মানুষের প্রিয় হয়, মৈত্রেয়ী তারই পথ অন্বেষণ কর। এমনকি এতদূর যে, একদিনের নিষ্ঠাকেও সেখানে মূল্য দেওয়া হয়েছে। রামায়ণে দেখা যায়, কোন অপ্সরা যখন যাচ্ছে আকাশ পথে— রাবণ তাকে আকর্ষণ করেছিল। সেই অপ্সরা তাকে বলল, তুমি যদি আমাকে স্পর্শ কর তাহলে আমি বিপথগামিনী হব। রাবণ বলল, তা কেন, তুমি অপ্সরা—আজ এ বাড়ি কাল ও বাড়ি।

সে বলল—না, আজকের দিনে আমি অমুক রাজকুমারকে অঙ্গীকার করেছি। একদিনের নিষ্ঠাকেও সেখানে সমর্থন করা হয়েছে। এই এক দিনের নিষ্ঠা তার আগামী দিনের জীবন জোড়া সঙ্কল্প আনবে—এই ভাবনা। জীবনে এক তিল নিষ্ঠাকেও মূল্য দেওয়া হয়েছে—যাতে একদিন না একদিন তার মধ্যে গভীর ভাবে সে পরমানন্দের খবর পায়। গভীরতার প্রতি, জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যের প্রতি ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির এই শ্রদ্ধা-আকুলতা তার ব্যক্তি এবং সমাজ জীবনের সর্ব স্তর ব্যাপ্ত করেছে।

সুতরাং মানুষের নিষ্ঠা, একাগ্রতা যেমন বাড়ছে, তেমনি জীবনের প্রতি মুহূর্তে তার চিন্তা, চেষ্টা, তার বৈরাগ্য-ব্যাকুলতার মধ্যে দিয়ে চেষ্টা—যাতে সে গভীর থেকে গভীরতর স্তরে দেহ-মন-প্রাণ এবং শেষ পর্যন্ত গীতার ভাষায়-প্রাণ দিয়ে মহাপ্রাণকে উদ্ধার করার কথা—যাতে মানুষের গভীরতর সম্পদ যা আছে, তা উপলব্ধি করতে পারে। ঠাকুর যেমন বলেছেন—আরো এগিয়ে যাও—রুপোর খনি, সোনার খনি, হীরের খনি পাবে। আরও বলেছেন—প্রথমে কলা গাছ, তারপর শর, শেষে উড়ন্ত পাখী তাক করতে হয়। জীবন ও জগত সম্বন্ধে চেতনার আরও গভীরতর স্তরে তাকে এগিয়ে যেতে হবে তার পরম ধনের সন্ধানে এবং শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে পরম-ধনে ধনী করতে পারবে। এখানে একটা বিশেষ কথা হ'ল—যথেষ্ট উন্নত আধারে যখন সংস্কার খুলে যায় তখন একাগ্র হলেই অন্তর্মুখ হয়ে যায়, এমনই মহিমা। গীতার অবশভাবে কথাটা যেখানে মূর্তিমন্ত।

নিষ্ঠা শুধু এক জায়গায় নয়, একাগ্রতা শুধু এক জায়গায় নয়, জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই সে যাতে আরও অন্তঃনিবিষ্ট হতে পারে, তার একাগ্রতার ও নিবিষ্টতার বিন্দু যাতে একীভূত থেকে গভীরতর স্তরে চলে যেতে পারে তার জন্য আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির সর্বস্তরে ব্যাপক ভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। এই জিনিসটা খুবই অনুধাবনের যে, আমাদের চেতনা, আমাদের একাগ্রতা কি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, না আমাদের একাগ্রতার বিন্দুকে আরও গভীর থেকে গভীরতর স্তরে নিয়ে যেতে পারছে? হ্যাঁ, যদি বল, তাহলে আমাদের সাধনার ভাবনাকে আমি মেনে নিতে পারছি। এছাড়া এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়নোর মত হাস্যকর ব্যাপার হবে। জীবনের সর্ব স্তরে গভীরতর আস্পৃহা বহন করতে হবে। রবিকবির ভাষা— 'গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি.........
অধরার গেছি পিছুপিছু।'

এই অধরার পিছু পিছু যেতে হবে। আরও গভীরে, আরও গভীরে। এই ভাবনা জীবনে আনতে হবে। আমাদের একাগ্র, অন্তরঙ্গ সাধনার ক্ষেত্রেও আমাদের বিভিন্ন মার্গের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। আমাদের অগ্রগতির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করার জন্য। আরও

গভীরের কথা শুনে এগিয়ে যাব—এ বললেই হয় না। মানুষের পরিণতি সাপেক্ষে আরও গভীরে যাওয়া। কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, হাজার রকম যোগের পদ্ধতি সৃষ্টি করা হয়েছে, উদ্দেশ্য একটাই।

জীবন ও জগত সম্বন্ধে তার চেতনার বিন্দুকে কূটস্থের দিকে নিয়ে যাওয়া আত্মার পরিণতি সাপেক্ষে। গভীরে যাওয়ার চেষ্টা নিশ্চয় করব, কিন্তু আমার একাগ্রতা যেন বজায় থাকে। একটা আতস কাঁচের মধ্যে আলো অন্তপ্রবিষ্ট হয়। কিন্তু অন্তপ্রবিষ্ট হওয়াটাই শেষ কথা নয়। অন্তপ্রবিষ্ট হয়ে গভীর একটা বিন্দুতে সংহত বা একাগ্র হয়। তাহলে একটা হচ্ছে অন্তপ্রবিষ্ট হওয়া, আর একটা হচ্ছে একটা বিন্দুতে একনিষ্ঠ হওয়া— সেখানে উজ্জ্বলতার আলো আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে। এটা চিন্তা করতে হবে—আমার জীবনকে তদ্গত করার সঙ্গে সঙ্গে আমার একাগ্রতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি কিনা। নাহলে এমন একটা জায়গায় গেলাম, যেখানে আমার একাগ্রতা হারিয়ে যাচ্ছে। এখানেই সাধকের সংস্কারজাত সামর্থের প্রশ্ন। বাস্তবিক, গাড়ির গতি এবং স্টিয়ারিং সামলানোর মত আমাদের একাগ্রতার বিন্দু এবং অন্তঃপ্রবিষ্ট হওয়ার চেষ্টা, দুটো সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। এটা কি আমরা অনুশীলন করতে পারব? এই ভাবেই এগিয়ে যেতে হবে। হয়ত খুব বেশী গভীরে যাবার চেষ্টা করছি, আমার একাগ্রতা হারিয়ে যাচ্ছে, জ্বলছে না আলো। আবার একাগ্রতার এমন একটা স্তরে যাচ্ছি, সেটা অচলায়তন, সেখানে আমার অন্তঃশ্চেতনা এগুতে পারছে না, সেখানে আমি জড়তার মধ্যে বন্দী। কাজেই পারস্পরিক দুটো দিক সাম্য রাখতে হবে।

এমনকি মন্ত্র সাধনার ক্ষেত্রেও দুটো দিকের কথা। মন্ত্রগুলো সাধারণতঃ ওঁকার পুটিত হয়। মন্ত্রগুলোর একটা অংশ ওঁকার, আর একটা অংশ বিভিন্ন দেবদেবীর নাম, শিবরাম, হরেকৃষ্ণ, ইত্যাদি নাম পুটিত থাকে। একদিকে ওঁকার থাকছে, আর একদিকে ভগবানের কোন ভাবনা। এই ভাবে মন্ত্রগুলো পৌরাণিক যুগে সৃষ্টি করা হয়েছে। ঋষিদের ভাবনা- একদিকে ওঁকার আছে, আর একদিকে গায়ত্রী। গায়ত্রী একটা ভাবনা, যেটা নিয়ে অন্তঃনিবিষ্ট হয় ওঁকারে, চেষ্টা করে তার মন-প্রাণের সর্ব স্তর গুটিতে আনতে, একীভূত করতে ওঁকারের গভীরে।

সমস্ত শাস্ত্রেই সৎকর্ম, সৎ-জীবনের কথা বলা হয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের মানসিকতার স্তরকে গুটিয়ে আনা। সব শাস্ত্রেই আবার আত্ম-অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে আমাদের একাগ্রতার স্তরকে তুঙ্গ করার জন্য। বৈষ্ণবরা লীলাবাদী ধর্মীয় আচরণের মধ্যে দিয়ে, আবার আনন্দ ব্রহ্ম, রস ব্রহ্মের একীভূত আস্বাদনে। এই ভাবে ধর্মের অনুশীলনের, আত্ম-চিন্তার বিভিন্ন সামাজিক এবং এক কেন্দ্রিক দিকগুলোকে গড়ে তোলা হয়েছে। যাতে মানুষ তার সমস্ত শক্তিকে সংহত করে স্তরে স্তরে তার অভিষ্ট পথে যাত্রা করতে পারে। তা হলে আমাদের ঈশ্বরীয় ভাবনা-চিন্তার মধ্যে যে নির্দিষ্ট পরিণতি সৃষ্টি করা হয়েছে, সেইগুলো বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে।

পুণ্যতিথি

ঘন মেঘ যখন আকাশে ওঠে, চারিদিক ছেয়ে যায়, ক্রমে বাতাস সব জলে ভরে যায়। তেমনি বড় বড় তিথিতে আধ্যাত্মিকতা পৃথিবীতে ছেয়ে যায়, গুড়গুড় করে, সাধকের প্রাণ-নদীও তাতে প্রাণবন্ত হয়।

দুর্বাসা

☆ যেসব মহাত্মারা পৌঁছে গিয়েছেন, তাঁরা তো আমাদের যেসব সাধারণ রিপু সেসব পার হয়েই গিয়েছেন। তাহলে দুর্বাসা বা কোন কোন ঋষির এরকম ক্রোধ, ইত্যাদি দেখা যায় কেন?

☆☆ যিনি পৌঁছেছেন তাঁর এই ধরনের মায়িক বৃত্তি থাকা কখনো সম্ভব নয়। কেন? সাধারণ মানুষ যেসব বৃত্তি নিয়ে অস্থির হয়, সামলাতে পারে না—অধ্যাত্ম শাস্ত্রে বলা হয় আমাদের যে মূল প্রাণশক্তি, এসব তারই নিম্নমুখী প্রকাশ-মানুষ সাধনার স্তরে যত উন্নীত হয় তত এসবের প্রভাব থেকে মুক্ত হয় এবং চরমে পরম চেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়। তাহলে এসব যে শোনা যায় সেইগুলো কি? ওনাদের প্রাথমিক অধ্যাত্ম জীবনের বা অধ্যাত্ম জীবনে প্রবিষ্ট হওয়ার আগে তাদের জীবনে যে সমস্ত ব্যর্থতা বা দুর্বলতা ছিল তারই গল্প। তাহলে গল্পগুলো আছে কেন? এইগুলো তো অধ্যাত্ম জীবনের সঙ্গে জড়িত নয়? হ্যাঁ, জড়িত এক ভাবে। পরবর্তীকালে যারা মহত্তর স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন তাদের জীবনেও প্রাথমিক স্তরে নানারকম দুর্বলতা বা ভ্রান্তি বা চ্যুতি হয়েছিল। আমাদের জীবনে সেইগুলো দেখে যেন হতাশা না আসে। আমাদের জীবনে যদি সেই নিষ্ঠা, তপস্যার একাগ্রতা থাকে আমরা সকলেই একদিন সফল হব। আমার তো এরকম মনে হয়েছে।

একত্ব

সন্ন্যাসীর গীতিতে স্বামীজী বলছেন—

'জানি এ একত্ব আনন্দ অন্তরে,
গাও হে সন্ন্যাসী নির্ভীক অন্তরে—
ওঁ তৎসৎ ওঁ।'

এই এক এর জাগ্রত রূপ হ'ল, মহাপুরুষরা, অবতারপুরুষরা। উচ্চকোটির মহাপুরুষরা সেই এক এর তরঙ্গ প্রেরণ করেন। সতত এক এর তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে, যাতে জগতের ভ্রান্তি আর অমঙ্গলগুলো সরে যায়।

একবার একটা জায়গায় অনেক লোকজনকে খাওয়ানো-দাওয়ানো হচ্ছে। শ্রী রামদাস কাঠিয়াবাবাকে বলছে, বাবা, একবার এসে দেখুন না। তিনি নেংটি পরা সাধু, ছাই-ভস্ম মেখে বসে থাকেন গাছতলায়। কাঠিয়াবাবা এসেও দেখছেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এত লোককে মণ্ডা-মিঠাই খাওয়ানো হচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে মনে হ'ল একটু হুঁশ এসেছে। গাঁজায় থাকেন তো, হুঁশ থাকে না। যারা খাওয়াচ্ছে, তারা মনে করছে, বাঃ, এবারে আমাদের প্রশংসা করে বেশ কিছু কথা বলবেন। তারাও সাধু, মানে মোহন্ত ক্লাসের লোক। কাঠিয়াবাবা ধীরে ধীরে বললেন, 'এ ভি সমঝানা চাহিয়ে, কোন্ খিলাতা হায় আওর কৌন্ খাতা হায়।' কি সুন্দর কথা। কি এক মহাভাবের স্পন্দন ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন, সব তছনছ হয়ে গেল। সেই যে দুর্ধর্ষ খাওয়ানোর আয়োজন সংক্রান্ত দাপটের খেলা, সব শান্ত হয়ে গেল। জলে যেন নির্মলি পড়ল! কথাটা ছড়াতে লাগল, 'এ ভি সমঝানা চাহিয়ে, কোন্ খিলাতা হায়, আর কৌন্ খাতা হায়।'

দিক-ভাবনা

ভাবনা নিয়ে উপাসনা। 'উত্তরাস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ঃ।' উত্তর দিকে ঋষিরা আছেন, দেবতাত্মা হিমালয়ে। মুনি-ঋষিরা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিমালয়ের গুহাতে সমাধিস্থ হয়ে আছেন। আধ্যাত্মিকতার আকর সেখানে। সেইজন্য আমরা বলি উত্তর দিকে মুখ ক'রে পুজো-পাঠ কর। বিশেষ ক'রে শিব-এর পুজো। শিব-এর স্থান বলে তো কৈলাস? শঙ্করাচার্য সন্ন্যাসের নিয়ম ক'রে গিয়েছেন, সন্ন্যাসের পর পাঁচ পা উত্তর দিকে হাঁটতে হবে। আধ্যাত্মিকতার মূর্তরূপ হিমালয়।

'তমসো মা জ্যোতির্গময়'—এই আমাদের ঋষিদের চিরকালের প্রার্থনা।' আমাদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে চল,' আমার যে খণ্ড চেতনা, তার থেকে অখণ্ড চেতনায় নিয়ে চল। পূব দিকে সূর্য ওঠেন তো, এইজন্য সূর্যোদয়ের আগে থেকে পূব মুখ করে উপাসনা বা ধ্যানে বসতেন সূর্যোদয় পর্যন্ত। ব্রাহ্মমুহূর্তে অন্ধকার থেকে আলো ফোটে, তারপর সূর্য ওঠে। সূর্য ওঠার অনেক আগে থেকেই পূব দিক আলো হয়ে থাকে। ওঁনারা সূর্য ওঠার আগে থেকে অন্ধকার আলোর দ্বৈতাভাস থেকে উপাসনা শুরু করতেন। আলো ফুটে উঠত, তারপর সূর্য দেখে উঠতেন। সেইজন্য পূব দিকে মুখ করে বসে।

তাহলে, পূব মুখ এবং উত্তর মুখ নিয়ে আমরা সাধন-ভজন করি। এটা ভাবনার কথা।

স্বর্গ-মর্ত-পাতাল, যেখানেই আসন লাগাও আর যেদিকেই মুখ ক'রে আসন লাগাও, তোমার আন্তরিকতা থাকলেই হল, এখানে কোন দিক নেই, কিছু নেই। শঙ্করাচার্য বলে গিয়েছেন, বিধিই বা কি, নিষেধই বা কি। যদি সমস্ত মন-প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়, তখন কি বিধি, নিষেধ। চৈতন্য চরিতামৃতে আছে, খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কিন্তু বিধি-নিষেধ যখন মানতে চাই, তখন এইগুলো আছে।

চারটের সময় কোন পাখী গান গায় বলুন তো? গেয়ে ওঠে কোন পাখী? বাতাও। ... দোয়েল পাখী। ওরা চারটের সময় উঠে পড়ে, উঠে আগে ভগবানের নাম-গান করে ব্রাহ্মমুহূর্তে। তারপর সূর্য উঠে গেলে, সূর্য প্রণাম ক'রে, খাওয়ার ধান্ধা করে। আর রবীন্দ্রনাথের একটা কথা শোন, খুব ভালো লাগবে। বলছেন, 'সূর্যোদয়ের আগে যে পাখী গান গায়, তার নাম বিশ্বাস'। এই কথার কোন দাম নেই। আর একটা 'লেখন' পর্যায়ের কবিতায় বলছেন—

> "ভক্তি ভোরের পাখি
> রাতের আঁধার শেষ না হতেই
> 'আলো' বলে ওঠে ডাকি।"

জীবনে ঈশ্বরের আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই সাধক বিশ্বাস, নিষ্ঠা, ভরসার সঙ্গে ভগবানের নাম করতে থাকে। আর যখন ভগবানের আনন্দ পায়, তখন তো মজবেই।

স্বয়ং মহম্মদ, যিনি নিরাকার উপাসনার কথা ব'লে গিয়েছেন সারাজীবন, যিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন, তিনি বা তাঁরাও পশ্চিম দিকে মুখ করে উপাসনা করার বিধান ক'রে গিয়েছেন। সুতরাং ভাবনা যখন একটা আছে, তাকে অস্বীকার করতে পারব না। এটা এমনই একটা গভীর জিনিস।

যিশুর উপাসক গির্জায় যেদিকে ক্রুশ চিহ্ন, সেদিকে মুখ করে বসে। এটি শ্রীভগবানের করুণা-বিগ্রহ।

ভাবের জগত

... দেখুন না, আকাশে এতটুকু মেঘ, তাইতেই কত বৃষ্টি, শুকনো মাটি ভিজে যায়, কত শস্য। হয় না? তেমনি, যথার্থ ভাব যেখানে, সেখানে অসাধ্য-সাধন হয়। মেঘটিকে যদি ভাব বলি, তবে তা মহাশক্তির আধার, সব অসাধ্য-সাধন করে। ভাব থেকেই সব বস্তু। যা কিছু হচ্ছে, ভাব জগত্ থেকে।

ব্যবহারিক জগতের উপরে ভাব জগত। ব্যবহারিক জগতের উর্ধ্বতর চেতনায় মানুষকে উঠতে হবে। ব্যবহারিক জগত নিয়ে আমরা এত ব্যস্ত, এর উপরে যে ভাব জগত আছে, তার খবর রাখি না। যারা এই ব্যবহারিক জগতের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁর ভাবনাকে, তার বোধকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁরা অন্য জগতের মানুষ। এই ব্যবহারিক জগতের সীমা বা বন্ধন তাঁদের ছোট করতে পারে না। এরকম মানুষ আছে, যারা ব্যবহারিক জগতের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এ তো ভাব জগতের শুরুর কথা বলছি।

বিভূতিভূষণের লেখা পড়েছেন তো? কি এক জগতে, কি অসামান্য বোধে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। এই ভাব জগতের একটু আভাস—তাই গোটা পৃথিবী তোলপাড় করেছে সত্যজিৎ রায়ের ছবি। শুধু তো এই জগতের চাওয়া-পাওয়া নয়, কিছু একটা আছে অজানা অথচ অস্বীকার করা যায় না, তারই ছোঁয়া। কোন এক গভীর জগতের একটু ছোঁয়া এসেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে ভাব-জগতের কথা। 'পরশ যারে যায় না করা, সকল দেহে দিলেন ধরা।' আর একটা জায়গায় আরও গভীর ক'রে বলেছেন—

> 'বারে বারে তুমি আপনার হাতে স্বাদে সৌরভে গানে।
> বাহির হইতে পরশ করেছ অন্তর মাঝখানে।।'

স্বাদে, সৌরভে, গানে—এইগুলো শুধু উপলক্ষ। এর মাঝে কেউ একজন স্পর্শ ক'রে অন্তরের গভীরে। স্বাদে, সৌরভে, গানে এইগুলো যেন পাত্র। এর মধ্যে একটা গভীর ভাবময় জগত আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে। অন্তরে যিনি আছেন, তাঁকে স্পর্শ করে। অন্তরের ভাবময় জগত বিশ্ব সংসারকে সুন্দর ক'রে সাজিয়েছে। কখনো অন্তর-বাহির জুড়ে, কখনো বাহির-অন্তর জুড়ে। কখনো বাহির থেকে অন্তরে আসছে, কখনো অন্তর থেকে বাহিরে আসছে।' গোলাপের দিকে চেয়ে বললাম—সুন্দর। সুন্দর হ'ল সে।' 'আমারি চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে।'

একটা বিখ্যাত লাইন আছে, ছোটরাও জানে'— A thing of beauty is a joy for ever. চোখের সামনে আছে সুন্দর, কিন্তু চোখের স্তরে নয়, কোথায় কোন্ স্থায়ী গভীর বোধকে জাগায়? কোন্ স্থায়ী সত্তা অন্তরে স্থির হয়ে আছে? যাকে সে জাগায় উপলব্ধির স্পন্দনে? তবে না joy for ever। নাহলে তো এই পৃথিবীর যত স্থূল মানুষ রূপের নেশায় পাগল হয়ে আছে। আমরা কি বলতে পারি Joy for ever? কখনই

বলতে পারি না। bliss of solitude, লোকে তো মনে করবে দারুণ বন্দীদশা-দ্বীপান্তর। সফল অনুবাদ করেছে,—'নির্জনতার শান্তি জলে অবগাহন'। কি সুন্দর কথা।

তা, এইগুলো সবই ভাব-জগতের লেশমাত্র। তাতেই অসাধ্য-সাধন করে, সমস্ত ছিন্নতাকে অতিক্রম ক'রে মানুষ পরম আনন্দের অধিকারী হয়। তারাই বলতে পারে রবীন্দ্রনাথের মত পরিণত জীবনে, 'মধুময় এ দ্যুলোক, মধুময় পৃথিবীর ধূলি, অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি।' .... 'যাবার দিনে এই কথাটি ব'লে যেন যাই, যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।' এই যে কথাগুলো, একটা পরম চরিতার্থতার আস্বাদন। ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথের মত এমন দুঃখী, নির্বান্ধব জীবন কম মানুষেরই হয়। এমন চরম পরিতৃপ্তির কথা সম্ভব হয়েছিল মাত্র সেই-জগতের আভাস পেয়েছিলেন বলেই।

ছোট একটা ঘটনার কথা বলছি। সেদিন বিভূতিভূষণের ছেলে রেডিওতে বাবার সম্বন্ধে বলছে,—'আমার বাবা একটা গভীর ভাবময়তার মধ্যে, আনন্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতেন। একবার এক সাহিত্যিক বন্ধু দেখা করতে এসেছেন ওনার সঙ্গে। উনি তখন কাছাকাছি কোথাও থাকতেন। ঘাটশিলার ওদিকে। বন্ধুকে বললেন, 'চল, বেড়িয়ে আসি।' ওনারা এক বনের মধ্যে গিয়েছেন। সেখানে গিয়ে গভীর সব প্রসঙ্গ হচ্ছে। একটা উচু পাথরের উপর বিভূতিভূষণ বসে আছেন, আর একটা নিচু পাথরের উপর মুখোমুখি সেই বন্ধুটি বসে আছে। হঠাৎ বন্ধুটি কাঁপা গলায় বলল, 'বিভূতিদা, আপনার মাথার পিছনে যে—গাছটা, সেখানে একটা ভালুক এসে মধু খাচ্ছে।' সবাই জানে ভালুক হিংস্র, মানুষকে ছিঁড়ে দেয়। আর দৌড়েও পারা যায় না। সে তো কাঁপছে। কিন্তু বিভূতিভূষণ বলছেন, 'না হে, চিন্তার কি? ও ওর বোধের মধ্যে আছে, আমি আমার বোধের মধ্যে আছি।' বলে বিভূতিবাবু নিজের মনে গভীর সব কথা বলে যাচ্ছেন। এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। ভদ্রলোকটা ভাবছে, এমন বিপদে কোনদিন পড়িনি, আর এঁর সঙ্গে আসব না। আর বাস্তবিক, খানিকক্ষণ পরে গাছ থেকে নেবে ভালুকটা আলগোছে তাকাল, তারপর বনের মধ্যে চলে গেল।'

তাহলে এই একটা জিনিস, তিনি নিজের ভাবে যে গভীর আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সেটা কত নিখুঁত, নিখাদ ছিল যে, তাঁর জীবনটা এত বলিষ্ঠ প্রত্যয় ভরা হয়েছিল। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় আসি, 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে।' তিনি ভাবের জগতে কত গভীর ভাবেই না অবগাহন করেছিলেন, যার জন্য এমন সফল হাহাকার সম্ভব হয়েছিল।

প্রাণ

.... আমাদের যে জগতমুখী মানসিকতা, তার মূলে কাম। তার থেকে অন্যান্য কামনা-বাসনা, আসক্তি। আমাদের একটি প্রাণশক্তি আছে। দেহশক্তি, মনঃশক্তি, তার উপর প্রাণশক্তি। প্রাণশক্তির নিম্নমুখী প্রকাশ হচ্ছে কাম। এই কাম আছে বলেই অন্যান্য কামনাগুলো আছে। একটা শিশুর আপাত ভাবে কাম থাকে না, কিন্তু কামনা থাকে। মূলে কামটা আছে বলেই কামনা আছে। ইন্দ্রিয়গুলো অস্ফুট, মনঃশক্তি অস্ফুট, তাই প্রকাশ হচ্ছে না। ইন্দ্রিয়গুলো স্ফুট হলেই প্রকাশ হবে। কিন্তু ওটা আছে, সেইজন্যই

কামনাগুলো হচ্ছে। এতে কোন সন্দেহ নেই। একদম বুড়ো বা বুড়ি হয়ে গেলে— মোদ্দা কথা বয়েস হয়ে গেলেও একই কথা। সেক্ষেত্রে দেহে কাম থাকে না, কিন্তু অন্তরে থাকে। সেইজন্য কামনা আসে। যত স্থূল ভাবের শিশু হয়, তার কামনা তত বেশী হয়, ছটফটে, অশান্ত। অবশ্য তমোগুণী শিশুও হতে পারে, অলস প্রকৃতির। মূল শিকড় একটাই, আর সব আনুষঙ্গিক শিকড়। এ তো ধরাবাঁধা।

ফ্রয়েড সাহেব বলেছিল, 'প্রাণের প্রকাশই হচ্ছে কাম এবং তার থেকে তার বাসনা-কামনাদি আনুষঙ্গিক সব প্রকাশ।' ফ্রয়েডের পর মনস্তত্ব তো অনেক এগিয়ে গেছে। এব্রাহাম ম্যাস্‌লো প্রমুখ এখনকার মনস্তত্ত্ববিদরা বলছে, আমাদের প্রাণশক্তি, লাইফ ফোর্স-এর যে নিম্নমুখী প্রকাশ, সেটাই কাম আর তার অনুষঙ্গ। কিন্তু এ ছাড়াও তার উর্ধ্বাভিমুখী মহত্তর প্রকাশ আছে। আমাদের অধ্যাত্মশাস্ত্র যা বলেছে, আধুনিক মনস্তাত্বিকরা তার কাছাকাছি বলছে। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার যা সিদ্ধান্ত, জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারই দূরাগত এবং সার্বজনীন অনুধাবন।

ফ্রয়েড কেন বলেছিলেন, তার উত্তরটাও আধুনিক মনস্তাত্বিকরা বলেন। তখন ফ্রয়েড যেসব লোকের উপর স্টাডি করেছিলেন, তাদের সকলেরই প্রাণশক্তি নিম্নমুখী ছিল। আর, মনস্তত্ববিদ্‌রা তো মনস্তত্বের সামগ্রিকতার উপরেই বিচার করবে। ঠাকুর যা বলেছেন—সাধারণ মানুষের মন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভিতে। এখনকার মনস্তত্ববিদরাও তাই বলছেন। তারা প্রাণকে বলছে লাইফ ফোর্স। ঠাকুরের ভাষায় মহাবায়ু। ভাষাটা আলাদা, কিন্তু এক কথা। অশান্ত জীবনের মূলে ঐটাই। আবার প্রশান্ত জীবনের মূলে প্রাণের উচ্চাভিমুখী গতি। ঠাকুর যা বলেছেন, দেখ এ কালের প্রখ্যাত মনস্তত্ববিদ কেন্‌ উইলবার তার বর্ণালী মনস্তত্বে বলেছেন, মানুষের এই স্থূল চেতনাই অপর দিকে উর্ধ্বায়িত হয়ে ভূমা-চেতনায় পরিণতি লাভ করে। ঠাকুরের হোমা পাখীর কথা আর ষষ্ঠ ভূমি-সপ্তম ভূমির কথা।

☆ সেই জন্যই কি বলেছেন, ভক্তি কামনা কামনার মধ্যে নয়?

☆☆ নিশ্চয়। ভক্তি কামনা তো প্রাণের উর্ধ্বমুখী গতি। কাজেই সেটা কামনা নয়। টেনে আসছে সব, এবং চির দিনের মতো। নিজের সত্য স্বরূপে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার কামনা। কি আশ্চর্য কথা, না? এমনি করেই অহমিকাকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র জীবনটা, পরমার্থকেন্দ্রিক শাশ্বত জীবন লাভ করে।

সামঞ্জস্য

সাধনার পথে সামঞ্জস্য বিধান একটা মনস্তত্ত্ব, সেই সঙ্গে অধ্যাত্মতত্ত্ব। শুধু জাগতিক নির্ভরতার দিকটা কমিয়ে দেখবে সাধকের মধ্যে এমন একটা অবসন্নতা, শূন্যতা এসে যাচ্ছে যে, সে শেষে পারমার্থিক দিকটা ছেড়ে দেবে। আবার এদিকটা যদি নিকেশ করতে ইচ্ছে না থাকে, তাহলে ওদিকটা ভরাতে পারবে না। কেননা, ঘাটে নৌকো বেঁধে তুমি দাঁড় বাইছ। তীরের বাঁধন বজায় রেখে দাঁড় টানা যেমন, সেইরকম অবস্থা। সুতরাং দুটো দিকের প্রস্তুতিই সাধকের দরকার, মানসিক সামর্থের সঙ্গতির দরকার। এদিকটা ঘুচে যাচ্ছে, ওদিকটা সঙ্গত ভাবে বেড়ে যাচ্ছে। নইলে এদিকটা শুধু ঘুচিয়ে দিলে, আর ওদিক-এর জিনিসটা বাড়াতে পারলে না, সেটাও বাধা, সবটাই একটা

অসঙ্গতির ব্যাপার হবে। এদিক দিয়ে দেখলে বৈরাগ্য আর প্রেম একসঙ্গে গাঁথা জিনিস। আর একটা কথা, যেখানে আরোপ, সামঞ্জস্যের অসঙ্গতি হয়েছে—সেখানে বই পড়ে করছে বা পাঁচজনকে দেখে করছে। কিন্তু তাকে তো চেষ্টা করতে হবে, আবার এটাও ঠিক কথা, তার সেই সামর্থ থাকতে হবে। যেখানে স্বাভাবিক, সেখানে কোন সমস্যা থাকে না, কেননা সেখানে অসঙ্গতি উঠছে না। কিন্তু যেখানে স্বাভাবিক স্ফূরণ নেই, সেখানেও তো মানুষ চেষ্টা করছে, সেখানেই অসঙ্গতির প্রশ্ন। খাওয়া বল, পরা বল, ঘুম বল, এককথায় আমাদের জীবনধারা সবই জাগতিক সুখস্পৃহা। এই সুখস্পৃহা ছাপিয়ে ঐ সুখস্পৃহা জাগ্রত করতে হবে—একই সঙ্গে করতে হবে। যেটাই ধর—বৈরাগ্য ধরলে সেইসঙ্গে ভগবানের প্রেম-প্রত্যাশী হতে হবে, প্রেম ধরলে বৈরাগ্য নিষ্ঠ হতে হবে। একটা বাদ দিয়ে আর একটা নয়। যদি দেখ একটা আছে, আর একটা নেই, তাহলে বুঝতে হবে সেটা সুস্থ অধ্যাত্ম-বিকাশ নয়। এদিকের স্পৃহা সরে যাবে, ঐদিকের সুখস্পৃহাটা বেড়ে যাবে। রবি কবি গেয়েছেন—

'অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে,
অচেনাকে চিনে চিনে
উঠবে জীবন ভ'রে।'

সেই অজানা আনন্দ বারবার আসছে, সেখানেও ভালো লাগা, না লাগার ব্যাপার আছে। কেননা জাগতিক সুখস্পৃহা মনের মধ্যে—এটা জন্ম-জন্মান্তরের স্পৃহা। যখন ঐ সুখবোধ আসে সাধকের মধ্যে, সাধক সেটা সবসময় মন-প্রাণ দিয়ে নিতে পারে না, সংশয় আসে। যখন সেই সংশয় কাটিয়ে উঠতে পারে, তখন সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে সেই আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। এটাও তো একটা ক্রমবর্ধমান অধ্যাত্ম-রূপান্তরের প্রক্রিয়া। সাধক ক্রমশ সেই অজানা আনন্দের মধ্যে ডুব দেয়। আরও সূক্ষ্ম, আরও উন্নত। বলে না, শিব সেই আনন্দ-সাগরের এক গণ্ডুষ জল পান ক'রে বিভোর।

দু-একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। মনে কর গরম হচ্ছে, ফ্যানটা চালিয়েছি, ফ্যানের হাওয়া গায়ে লেগে আরাম লাগছে। কিন্তু তুমি জপের আনন্দের মধ্যে থাকতে চাইছ। যখন জপের আনন্দের মধ্যে ডুবতে চাইছ, তখন এই আনন্দের বোধ ছাড়তে হবে। দুটো লোককে জিজ্ঞেস করা হল—সুস্থ শরীর কাকে বলে? একজন বলল, সুস্থ শরীর মানে, শরীরে আমি আনন্দ ভোগ করতে পারছি। আর একজন বলল, সুস্থ শরীর সেটাই, যেখানে শরীরটা আছে এই বোধটাই নেই। বললাম, দেখ দু'জন আলাদা বলল। তার মানে কি? শরীরের আনন্দ-বোধের উপরের আনন্দ সে পেয়ে গেছে।

চিৎশক্তি বিলাস

আমাদের বেদান্ত মতে অহং হচ্ছে স্থূল জ্ঞাননাস্য একটা উপাদান। বলছে, আমাদের অন্তঃকরণই হচ্ছে এই মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার। বলে, 'মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং'। এই হচ্ছে বেদান্ত মত। এইগুলোর কোন পারমার্থিক সত্তা নেই। বলছে, আমাদের অহং হচ্ছে মন, বুদ্ধি, চিত্ত এইগুলোকে নিয়ে ভ্রম-সঞ্জাত একটা ব্যাপার। অহং-এর এই সিদ্ধান্ত না মানলে হবে না। শঙ্করের মায়াবাদ বলছে, 'ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা'। দেহবোধের সীমানায়

এসব যা দেখছি, সব ভ্রান্তি, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। জগৎ জুড়ে এক ব্রহ্ম সত্তা, দ্বিতীয় কোন সত্তা নেই। তাহলে দেখ, এইসব সিদ্ধান্তগুলোর উপর মূল সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে। এইগুলো যদি সরিয়ে নাও, তাহলে মূল সিদ্ধান্তও সরে যাবে। এক ব্রহ্ম বিরাজ করছে— তুমি নও, আমি নই, কিছু নয়।

শক্তিবাদে, বিশেষ করে আগম সিদ্ধান্তে বলছে, অন্তঃকরণ যদি একান্তই স্থূল সত্তা হয়, তাহলে মানুষ পরমার্থের পথে ব্যাকুল হয় কেমন করে? যে সমস্ত সাধক এই পৃথিবীতে এসেছে, আসছে, তারা এই পরম উপলব্ধির জন্য জীবনের সমস্ত সুখ-আহ্লাদকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে, পরমার্থের জন্য পাগল হয়ে গেছে। তাহলে মানুষের সত্তা মধ্যে, এই অন্তঃকরণাত্মক সত্তার মধ্যেও এমন কোন দিব্য, পারমার্থিক সত্তা আছে, যা তার পরম স্বরূপ জানার জন্য বা পরম স্বরূপে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয় এবং পরিণামে প্রাপ্ত হয়। পশ্চিমের মনস্তত্ত্ববিদ্ কেন্ উইলবার-এর মতের মধ্যে একথার সমর্থন পাওয়া যায়। বলছেন, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র চেতনার প্রান্তে যা স্থূল অহং, ব্যাপ্তির চরম সীমায় তাই বিশ্ব চেতনায় রূপান্তরিত হয়।

আগম শাস্ত্রে বলছে,—আমাদের মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, এইগুলোকে নিয়ে আমরা বদ্ধ হচ্ছি, ভ্রান্তিতে কষ্ট পাচ্ছি, ক্ষণিকের উত্তেজনায় অনন্ত দুঃখভোগ করছি। কিন্তু এই স্থূল অহং-এর আড়ালে এক মহত্তর উপাদান আছে, যার ক্রিয়াশীলতায় আমরা দিব্য চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হই। যা কোন কোন আধারের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে। তা নাহলে মানুষ ব্যাকুল হয় কেন? নাথ সম্প্রদায় তো আগম সিদ্ধান্তের মতই—এইজন্য আচার্য প্রণবানন্দজী একটা কথা বলেছেন—ওঁনার ওখানে লেখা আছে, 'কে তোমার সেই আত্মবিশ্বাস, যাহার বলে বলীয়ান হইয়া তুমি পরমার্থে প্রতিষ্ঠিত হইবে?' প্রথম দিন পড়ে ভেসে যাওয়ার মত অবস্থা—এ কী কথা বলেছেন। বড় বড় ক'রে লেখা আছে। আমার ভীষণ ভালো লাগে প্রণবানন্দজীর এই কথা। এমন কি ভক্তি সিদ্ধান্ত চূড়ামণি ভগবান নিম্বার্কাচার্য—যাঁরা বলেন পরিপূর্ণ ব্রহ্ম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে লীলা আস্বাদন করা—তিনি ভারি সুন্দর কথা বলেছেন, মুক্তাবস্থায় সবই যদি ব্রহ্ম, তাহলে আমাদের বেদান্তসূত্রাদি শাস্ত্রে মুক্ত পুরুষের লক্ষণের যে সমস্ত অভিধা, জ্ঞান-শক্তির ক্ষেত্রে তার যে তারতম্য আছে, সেইগুলো মিথ্যে হয়ে যাবে। তাহলে, পথ এবং পথের প্রান্ত, উভয় ক্ষেত্রেই একক সত্তার একটি ভূমিকা আছে। নিম্বার্ক ভগবান বলছেন, সবই যদি ব্রহ্ম, তাহলে ভক্তিবাদ স্থিতি হচ্ছে না। ভক্ত ভগবানকে আস্বাদন করে বিভোর হচ্ছে, তন্ময় হচ্ছে, আবার কখনো একাকার হচ্ছে। তাহলে, ভক্তের স্থিতিকে মানতে হলে তার একক সত্তা মানতে হচ্ছে। সুতরাং একক সত্তা আছে এবং এমন কিছু আছে, যা তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাহলে নিম্বার্কাচার্য যা বলেছেন, তার সাথে আগমাদি সিদ্ধান্তের কোথাও মিল আছে।

পৃথিবী বিখ্যাত একজন মহাত্মা হচ্ছেন মুক্তানন্দজী, মহারাষ্ট্রের। ওঁনার বই পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। যে বইটা লিখেছেন, তার নাম 'চিৎশক্তি বিলাস।' উনি লিখেছেন—আপাত স্থূল অহংয়ের আড়ালে এক দিব্য চেতন সত্তা, যা মানুষকে তার পরমার্থে প্রতিষ্ঠিত করে। এই যে চেতন কণিকা, তার চলার পথটাকে বলা হয় 'চিৎশক্তি বিলাস'-আগম সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। উনি ওঁনার মতের বইটা লিখেছেন এবং

জীবনী খানিকটা। যখন নামটাই দিয়েছেন 'চিৎশক্তি বিলাস', তখন এই তত্ত্বটার উপরেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন, এটা ধরেই নিতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন—'ভক্তি মতে শক্তি বিশেষ'। প্রাণ সত্তার মধ্যে কোন কোন আধারে সেই চিৎশক্তির অধিক্য জনিত বিকাশ-বিলাস।

এই খণ্ডিত বোধের আড়ালে যে অখণ্ডিত বোধের প্রতিশ্রুতি আমাদের মধ্যে আছে, চিৎশক্তি বিলাস তারই অন্তর্নিহিত কার্যকরী পন্থা।

মহাপুরুষের ব্যক্তিত্ব

এই যে আমরা প্রত্যেক মহাপুরুষকে তাঁদের নিজস্ব একটা দিব্য-ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই, এটা কি? সেটা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, দৈব ব্যক্তিত্ব, মহাজাগতিক—যাই বলি, তার মধ্যেও বহুতর বৈচিত্র। আমাদের জীবনের পথ ধরে ভাবনা-চিন্তার ব্যক্তিত্ব, যে ভাবনা-চিন্তার মধ্যে আমরা বড় হয়ে উঠেছি, যে ধরনের ভাবনা-চিন্তা আমরা আত্মসাৎ করেছি,—এসব ব্যক্তিত্ব নয়। এসব ব্যক্তিত্বের অতীত এবং উর্ধ্বে অন্য কোন ব্যক্তিত্বে এই পৃথিবীর মহাজনরা প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই। তার কারণ হচ্ছে যে, প্রত্যেক মহাপুরুষ যখন ভগবত-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই এক। শক্তির সামর্থ তাঁদের মধ্যে ভিন্ন থাকতে পারে, কিন্তু স্বরূপতার সামর্থে তাঁরা এক-জলেতে মিশায় জল। তাঁদের মধ্যে ভগবানের করুণাগত শক্তির অবতরণ। কিন্তু যখন পৃথিবীতে প্রকাশ হন, সেইক্ষণ থেকেই তাঁরা সেই দিব্য-ব্যক্তিত্ব গঠন-ধারণ করেন। ঠিক যে কাজটুকু, যে ধরনের কাজটুকু তাঁরা নিয়ে এসেছেন, সেই কাজের অনুবর্তী, সেই জায়গার, সেইসব মানুষের মধ্যে, তাঁদের গ্রহণ-সামর্থ অনুযায়ী তাঁদের ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলেন, যাতে তাঁর অভিপ্সিত কাজটা সহজে, সুন্দর ভাবে করতে পারেন। যদিও ব্যক্তিত্ব কথাটা বলতেই হচ্ছে, কেননা অন্য কোন ভাষা নেই, ব্যক্তিত্ব বলতে ওঁনারা প্রভাবের সেই চৌহদ্দি নিয়ে আসেন, তাঁদের অতিমানস বা দিব্য-সত্তার নিজস্ব জগতটুকু নিয়ে আসেন, যাতে মানুষের মুক্তির সহায়ক হবে, যেসব মানুষের মধ্যে তাঁরা কাজ করতে এসেছেন, তাদের উদ্ধার করতে এসেছেন। এইজন্য আমরা দেখি, সব মহাপুরুষদের নিজস্ব একটি প্রকাশ থাকে।

রাজা-সাধু

একটা বনে একটা সাধু থাকত। সেই সাধুর কাছে এক রাজা এসেছে। প্রণাম করেছে। বলছে, তুমি বেশ আছ। সাধুবাবা বললেন, হ্যাঁ, বেশ আছি। তুমি এখানে থাক। রাজা তো মহা—ফাঁপরে পড়ে গেছে। খানিকক্ষণ পরে রাজা বলছে, দেখ সাধুবাবা, সে হবে না। কেননা, আমি হচ্ছি রাজা, আমার মনে আছে একটা রাজত্ব। আমি যদি বনে থাকি, এই বনেই একটা রাজত্ব বানিয়ে ফেলব।

এই হচ্ছে কথামৃতের গল্প, ঠাকুর বলেছেন। যার মনে যা আছে, সে যে-রূপে আর যেখানেই থাকে, সেইরকম একটা কিছু বানিয়ে ফেলে।

চাওয়া-পাওয়া

আমি তখন কাশীতে থাকি। বেশীরভাগ সময় থাকতাম কেদার মন্দিরে অথবা কেদার ঘাটে। কেদার ঘাটের পাশে যে ছোট ছোট শিবলিঙ্গ আছে, চাতাল মত, মন্দির মত ক'রে দিয়েছে—আশেপাশে ভাঙাচোরা কিছু আছে—পাশের দিকটায়, যেদিকে শ্মশানঘাট আছে, সেদিকে নয়, অন্য দিকে। তা, ঐখানে সিমেন্টের গর্ত মত ছিল, সেখানে একজন সাধুবাবা ছিলেন। তিনি মৌনী কিনা জানি না, কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। ঐ গর্তের মধ্যে থাকতেন আর নিবিষ্ট মনে সাধন-ভজন বা শাস্ত্রপাঠ করতেন। কেউ কিছু খেতে দিলে পাশে একটা বাটি মতন থাকত, সেখানে রেখে দিত—ইচ্ছে হলে খেতেন। আশেপাশে শিবমূর্তি আছে, সেখানে যেন একটা শান্ত সাধুর মূর্তি—এইরকম লাগত।

এইরকম ভাবে মাসের পর মাস চলে যায়। রোজদিন দেখি একইরকম। কখনো কদাচিৎ ভোরবেলা গঙ্গার ধার বরাবর গঙ্গার দিকে তাকিয়ে হাঁটতেন। কিন্তু বেশীরভাগ সময় ঐ পাথরের মূর্তির মত জপ-ধ্যান করেন বা শাস্ত্রপাঠ করেন। দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। একদিন দেখি যে, সাধুবাবার গর্ত যেখানে ছিল, সেখানে দু-তিনজন সাধুবাবা জমা হয়েছে। কি ব্যাপার? কাছে গিয়ে দেখি, সেই সাধুবাবা রোজদিন যেভাবে থাকেন, সেইভাবে বসে-বসা মূর্তি—তবে মূর্তি হয়ে গেছেন। শান্ত সাধু, চিরশান্ত হয়ে গেছেন। এখন ওঁকে সৎকার করতে হবে। ন্যাকড়া পরা, মৌনী তো ছিলেনই, এখন একেবারে মৌন হয়ে গেছেন। দু-তিনজন সাধুবাবা ওঁকে বার ক'রে নিয়ে এল। কোমর বুকে ইঁট, পাথর বাঁধল, নাহলে তো ভেসে যাবে। একটা নাও-বালা নাও দিল। তাতে করে নিল। একজন ধূপকাঠি দিল, আর একজন ছোট কাঁসি টঙ টঙ করে বাজাচ্ছে। নৌকোটাকে ধীরে ধীরে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। আওয়াজটাও ধীরে ধীরে মৃদু হয়ে আসছে। গঙ্গার জল থই থই। নৌকোর ছায়াটা যেখানে পড়ছে, সেখানে জলটা কাঁপছে। নৌকোটা আরো দূরে নিয়ে গেল। কাঁসরের শব্দও খুব কমে গেল। দেখছি সাধুবাবার শরীরটা কাঠের মত পড়ে আছে। যে দুজন সাধু নিয়ে গেছে, তারা চেনা কি অচেনা—কোন জন্মের চেনা, তাও জানি না, তারাও চুপচাপ বসে আছে। তিনবার ঘুরপাক খাইয়ে 'জয় বাবা বিশ্বনাথ, জয় মা অন্নপূর্ণা' বলে ফেলে দিল। তলিয়ে গেল। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল শরীরটা।

আমার তখন অল্প বয়স। মনটা খুব উথাল-পাতাল হচ্ছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। কেদার ঘাটে একটা হিন্দুস্থানী জোয়ান ছেলে রোজদিন তেল মেখে মুগুর ভাঁজত, তারপর চান করে চলে যেত। আমি খেয়াল করিনি, ও কখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে আমার পাশে। যখন খেয়াল করলাম, আমাকে বলল, 'আহা, সমুচা জীবন ইত্‌না তক্‌লিফমে বিতা দিয়া, কেয়া পায়া।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছে। এত কষ্ট করে জীবনটা কাটিয়ে দিল, কিই বা পেল? প্রথমে ঠিক কথাটা বুঝে উঠতে পারছি না, মাথায় ঢুকছে না। খানিকক্ষণ পরে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, ক্যা পায়া সমঝনেকা পহেলে সামঝনা চাহিয়ে ক্যা চায়া। কি পেল, তার আগে এটা বোঝার আছে, কি চেয়েছিল সে। ছেলেটা খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল, তারপর চলে গেল। দেখলাম, ছেলেটা যেমন অন্যান্য দিন তাড়াতাড়ি ক'রে চলে যায়, সেরকম নয়,—ধীরে ধীরে চলে গেল। কোনদিন হয়ত সে ভাবেইনি যে, সাধু জীবনে কি চায়।

আস্বাদন

তখন আমি কপিলধারায় থাকি। এক পূর্ণিমার রাত। নিস্তব্ধ পাহাড় চাঁদনি রাতে খুব সুন্দর দেখায়। ঝর্ণার জলের ধারা চিক্‌চিক করে, আর গাছের ছায়া, বড় বড় পাথরের ছায়াগুলো, ছায়া-কায়া মিলে-মিশে এক স্বপ্ন-রাজ্যের সৃষ্টি করে। অথচ অনেক দূর-দূর দেখা যায়। ভোর ভেবে পাখীরা সব অস্ফুট গান গেয়ে ওঠে। সব মিলিয়ে খুব ভালো লাগে।

তা, এমনি এক চাঁদনি রাতে, অনেক দূরে কপিলেশ্বর মন্দিরের চুড়ো দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট, চারিদিক থেকে ঘুম-ঘোরে পাখী ডাকছে। মাঝরাত্রি তখন, কুঠিয়া থেকে বেরিয়ে এলাম। যে-কুঠিয়ায় থাকতাম, তার চেয়ে একটু উঁচু জায়গায় উঠে আপন মনে দাঁড়িয়ে আছি—কখনো মৃদু পায়চারী করছি। এমন রাত চারিদিকে যেন চন্দন ছড়ানো। দিনের বেলা হলে বেশীরভাগ সময় আমার কাছে একটা পাহাড়ি লোক থাকত, একটা ধুতি পরা, পিরান পরা আর মাথায় একটা পাগড়ি। রাতে সে নেই। এমন সময়—নীচে খানিকটা দূরে একটা পাথরের চাটান আছে, সেখানে দেখছি কি, একটা কালো কুচ্‌কুচে লোকের মত মিশকালো উলঙ্গ না নেংটি পরা বুঝতে পারছি না—শুধু কালো একটা লম্বা লোক মনে হচ্ছে। আর, হেঁই-হেঁই ক'রে বন্‌বন করে মুগুর ঘোরাচ্ছে। আমি ভাবছি—কি হতে পারে? এসব চিন্তা-ভাবনা করছি। আর, থামেও না। কখনো হা-হা করে আওয়াজ আসছে। এমন চাঁদনি রাত মাটি করল! ঠিক আছে, এক কাণ্ড করে দেখি। উঁচু জায়গাটার কোণে একটা পাথর ছিল—সেটা নিলাম। পাথরটা নিয়ে যেখানে মুগুর ঘোরাচ্ছিল, তার কাছাকাছি ফেললাম। দড়াম করে। আর, যেই পাথরটা ফেললাম, তিড়িং করে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল! কি হল ব্যাপারটা? শুনেছিলাম এমন রাতে গম্ভীরনাথজি এখানে তানপুরা বাজিয়ে ভজন গাইতেন, আর অদূরে আকাশগঙ্গা পাহাড় থেকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী ছুটে আসতেন। মহৎ আসতেন মহতের সঙ্গসুখ লালসায়। সে সব ভাবনা মাথায় উঠে গেল। চলে গেলাম কুঠিয়ায়।

পরদিন শিব মন্দির ধুয়ে, চান করে ফুল তুলছি, পূজো করতে হবে। আর, ধুতি পরা, পিরান পরা, মাথায় পাগড়ি পরা লোকটা আস্তে আস্তে কাঁপা-গলায় বলছে,—'বাবাজী মহারাজ!' কি ব্যাপার? বলল, 'কাছে এস বলছি।' কি হয়েছে? 'কাল রাত্রে এই আশ্রমে খুব ভূতের উৎপাত হয়েছে।' আমি তখন আবার কাল রাতের দৃশ্যটা মেলাচ্ছি। বলল, 'এস আমার সঙ্গে।' দেখলাম ঐ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। বলল, 'কাল চাঁদনি রাতে বহুত আনন্দ হয়েছিল, তাই জামা-টামা খুলে হেভি মুগুর ভাঁজছিলাম। তারপর কি বলব, একটা ভূতে এতবড় একটা পাথর ফেলল। এই দেখ, এখনও আছে! আমি নিজে চোখে দেখেছি, আসমান থেকে ফেলেছে।'

আমি অনেক কষ্টে সামলে চলে এলাম আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেই উঁচু জায়গাতে। মনে মনে ভাবতে লাগলাম,—নির্জন পাহাড়ে, একই চাঁদের আলো, আনন্দের উৎসটা একই, কিন্তু আনন্দের আস্বাদন সবার আলাদা।

হিমালয়

যখনই আমরা ধর্ম কথাটা বলি, তখন বুঝতে হবে তা আমাদের মন-বুদ্ধির সীমানায় লোকায়ত বা সামাজিক ধর্ম। একক বা সামগ্রিক যাই ভাবি বা বলি না কেন, তা আমাদের ভাবনা-চিন্তা এবং আচার-আচরণ, অর্থাৎ জীবনধারা সাপেক্ষ। বলা যায় ধর্ম তূরীয় আধ্যাত্মিকতার লোকায়ত রূপ।

কিন্তু একান্তই তূরীয় অধ্যাত্ম-উপলব্ধির জগত সর্বপ্রকার ধর্মীয় সীমানার বন্ধনমুক্ত সার্বজনীন বা সার্বভৌম আধ্যাত্মিকতা। হিন্দুধর্ম তারই প্রাচীনতম, প্রবলতম এবং শুদ্ধতম রূপ। যা বিশ্বের অন্যান্য ধর্মীয় সম্ভাবনা সৃষ্টির কারণ হয়েছে। আমাদের যে হিন্দুস্থান, তার ধর্মীয় ভৌগলিক বৃত্তান্ত একদিক দিয়ে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ, আর একদিক দিয়ে ৫১ সতীপীঠ। এই ৫১ পীঠের পূর্বতম সীমা হচ্ছে কামাখ্যা। হিমালয়ের পাদদেশে কেদারনাথ, আর হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্তে কারাকোরাম পর্বতমালার মধ্যে হিংলাজ, যেখানে মায়ের করোটি পড়েছিল। এই সনাতন হিন্দু ভারতবর্ষের উত্তরসীমা। এখানে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ আর সতীপীঠ ছড়িয়ে আছে আমাদের দক্ষিণ প্রান্তের রামেশ্বর আর কন্যাকুমারী পর্যন্ত। হিমালয়ে যে কেদারনাথ, বদ্রীনারায়ণ, প্রভৃতি তীর্থ দ্যাখা যায়, সেগুলি শঙ্করাচার্য হিন্দুধর্ম গাড়োয়াল অঞ্চলে প্রসারিত করার সঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

সার্বভৌম অধ্যাত্ম-ভাবনা, তারপরেই সনাতন হিন্দু ভাবনা প্রসারিত হয়েছে এই ভূখণ্ডে। যেমন উত্তর থেকে দক্ষিণ-কন্যাকুমারী পর্যন্ত, তেমনি আমাদের কামাখ্যা থেকে হিংলাজ পর্যন্ত। তারপরেই দ্যাখা যায় অন্য অন্য জাতি, অন্য সভ্যতা। যেমন পূর্ব দিকে বার্মা, বার্মিজ জাতি। এরা যথার্থ হিন্দু ভাবনার মধ্যে নয়, কিন্তু হিন্দু ভাবনার প্রভাবের মধ্যে পড়েছে। আর পশ্চিম দিকে হিন্দু ভাবনা ছড়িয়ে গেছে আফগানিস্থান-কারাকোরাম পর্বত-প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাস সে কথাই বলে। যেমন কন্যাকুমারীর পর সিংহল। যথার্থ হিন্দু-ভাবনার মধ্যে না হলেও ছড়িয়ে গেছে ইন্দোনেশিয়া, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, যবদ্বীপ প্রভৃতি। এখনও সেখানে হিন্দু মন্দির দ্যাখা যায়। আজকের দিনের নয়, প্রাচীনকালের। এখনকার দিনেও ওদের সমাজ ব্যবস্থা, ধর্ম-সংস্কৃতি ভাষায় ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট ঐ সব দেশে আদ্যাশক্তি মায়ের বিগ্রহ, মন্দির আছে। প্রাচীন বরবদুরে এখনও অগস্ত্য মুনির বিগ্রহ, মন্দির, এসব আছে। ভারতীয় পুরাণে তো দ্যাখা যায় অগস্ত্য মুনি সমুদ্র শাসন বা শোষণ করেছিলেন, প্রতীক অবশ্যই।

এই যে সার্বভৌম সনাতন আধ্যাত্মিকতা, যার থেকে হিন্দুধর্ম হিন্দুস্থানে প্রসারিত হয়েছে। হিন্দুধর্মের জন্মদাতা তিনি। কিন্তু জন্মদাতা হয়েও তার গভীরতম সার্বজনীনতা আছে, যা বিশ্বের কল্যাণ চেতনার উৎস হয়ে চির-স্তব্ধ হিমানীর মতই ধ্যানমগ্ন। ইদানীংকালের একজন ঋষি এটা অনুভব করেছেন। এত কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলছি স্বামী বিবেকানন্দের কথা। তিনি বলছেন, 'এই দেবধন্য ভূমিখণ্ডের পর্বত শিখরে, গুহার অভ্যন্তরে, এই স্রোতস্বিনীর তীরে তীরে সৃষ্ট হয়েছিল চমকপ্রদ সব চিন্তারাশি। সেই চিন্তার ক্ষুদ্র একটি অংশমাত্র বিদেশীদেরও অভিভূত করেছিল। পৃথিবীর সক্ষমতম বিচারকরাও একে অতুলনীয় বলে মনে করেছেন। ... অনাগত কোন কালে, পৃথিবীর সমস্ত স্থান থেকে সবল আত্মার মানুষরা গিরিরাজের আকর্ষণ অনুভব করবে। যেদিন

বিভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরোধ, মতবাদের দ্বন্দ্ব বিস্মৃতির জগতে চলে যাবে, তোমার আমার ধর্মের লড়াই চিরতরে অপসারিত হবে, মানবজাতি যেদিন বুঝবে যে ঈশ্বরকে অন্তরে উপলব্ধি করাই একমাত্র চিরন্তন ধর্ম, আর সবই বুদ্‌বুদ—সেই দিন সব আগ্রহশীল মানুষরাই এখানে আসবে।'

(আলমোড়ায় প্রদত্ত ভাষণ)

এই ভাবনারই এক আদর্শ পদক্ষেপ হিসাবে স্বামীজী আলমোড়ায়-মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম করেছিলেন, সেখানে রামকৃষ্ণদেবের ছবিটাও সরাতে বলেছিলেন। আমি স্বামীজীর ঐ কথার গভীরতর এবং ব্যাপকতর তাৎপর্য দেখি—যখন বলছেন, এখানে সার্বজনীন অধিকারী সাধকরা এসে সাধনা করবে, তাদের সার্বভৌম সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। আবার বলছেন, 'অন্তত একটি কেন্দ্রেও শ্রীরামকৃষ্ণের বাহ্য পূজাদি বন্ধ থাকবে।' তখন সার্বজনীন সনাতন ধর্মের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ দিক যা বেদান্তের সফলতা লাভ করেছে তার কথাই মনে হয়।

দক্ষিণেও এই ভাবনার প্রসারণ দেখি—মাদার অরোভিল তৈরী করতে চেয়েছিলেন। তার মাঝখানে একটি পদ্ম, সেই পদ্মের কোরকের মধ্যে সব দেশের মাটি। বলেছিলেন, এই অরোভিল দেশ ও জাতির বন্ধনমুক্ত আন্তর্জাতিক প্রেম, মৈত্রী, তপস্যা ও আত্মোপলব্ধির কেন্দ্র হবে। পৃথিবীর গভীরতম অধ্যাত্ম-উপলব্ধি যেন মানুষ রূপে হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে ধ্যানস্থ রয়েছেন। আর তার আদিভূতা সনাতনি প্রকাশ হিন্দু ধর্ম তথা অন্যান্য ধর্ম-ভাবনা বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে। মনে পড়ে রবি ঠাকুরের গান—

'প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, প্রথম সাম রব তব তপোবনে।
প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে, জ্ঞানধর্ম কত কাব্য কাহিনী।'

বলেছেন—চিরকল্যাণময়ী। বলেছেন 'জাহ্নবী-যমুনা বিগলিত করুনা'। সত্য বটে হিমালয়ের অথৈ আধ্যাত্মিকতার করুণাধারা বিস্তৃত হয়েছে এই দেশে। আর উটকো বুদ্ধিজীবীরা বুঝতে পারেনি—'দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন' বলতে পরমান্নের কথাই বলা হয়েছে।

যা নিশা

যারা প্রথম সাধন-ভজন শুরু করে, কিছুকাল সাধন-ভজন বেশ ভালোই চলে, তারপর তাদের অবচেতন মনের ক্রিয়া বেড়ে যায়। ধৈর্য, নিষ্ঠা, আর তপস্যার একাগ্রতায় আস্তে আস্তে সেটাও শান্ত হয়ে আসে। কেন বাড়ে? জাগ্রত অবস্থায় সে তো বিশেষ বিবেক বিচারের সঙ্গে পথ চলতে চায়, সেইজন্য যখন ছাড়া পায় তখন বেশী লাফায়। যেমন একটা পশুকে বেঁধে রাখার পর ছেড়ে দিলে বেশী লাফায় তো? সেইরকম অবচেতন মনের ক্রিয়া বেশি হয়। তারপর যখন সাধনা দৃঢ় হয়, তখন ক্রমে অবচেতন স্তরেও ঈশ্বর চেতনা সক্রিয় থাকে। যেটা অবচেতন ছিল, সেটাও সচেতন হয়ে আসে। সেখানে অবচেতন বলে আর কিছু থাকে না। ক্রমে মনের গভীরতর স্তর শুদ্ধ হয়ে ওঠে। শেষে মনের উত্তর ভূমির সন্ধান পায়। সুতরায় 'যা নিশা' কথাটা অনেক দূর।

রামকৃষ্ণ-রবীন্দ্রনাথ

ওকাকুরাকে স্বামীজী বলছেন, 'তুমি শান্তিনিকেতনে যাও।' এখানে তো ত্যাগ-তপস্যার ক্ষেত্র। এখানে আধ্যাত্মিকতাই প্রধান। ত্যাগ, তপস্যা, সংযম প্রধান। আর ওখানে কৃষ্টি প্রধান, আধ্যাত্মিকতা তার অনুগমন করছে। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রম আছে, কিন্তু সেখানে ব্রহ্মচর্যের নিয়মগুলোর উপর কোন জোর দেওয়া হয় না। আশ্রম যেখানে, সেখানে ব্রহ্মচর্য আশ্রম থাকতেই হবে। মানুষ সংযত না হলে সংহত হতে পারছে না, আর সংহত না হলে সেই আলোর স্ফূরণ হবে না। ওখানে এইগুলোকে তিনি নীতিগত ভাবে স্বীকার করেছেন, কিন্তু আশ্রমিক জীবনে যে কঠোর, কঠিন ভাবনার দিক আছে, সেইগুলোকে তিনি স্বীকার করেন নি। রবীন্দ্রনাথের মতে — সেইগুলো হচ্ছে রুক্ষতা, তাতে প্রাণের সহজ স্বচ্ছন্দ প্রকাশকে ব্যহত করে।

এমতাবস্থায় একটা ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময় গঙ্গা বক্ষে চন্দননগরে আছেন। মতিলালদের তখন বিপুল প্রকাশ। তিনি সিদ্ধপুরুষ। বজরাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। তোমার আশ্রমে কি ভাবনা? এই এই নিয়মকানুন, ত্যাগ, তপস্যা, সংযমের মধ্যে দিয়ে আমাদের উপলব্ধির জীবন গঠিত করি। প্রবর্তক আশ্রম প্রকাশিত 'সংঘগুরু মতিলাল' বইতে এমন ভাবেই বর্ণনা এগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বললেন,—ওটা হ'ল না। যা সহজ, স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত, তাই সুন্দর, সেখানেই প্রাণের অনাবিল, অব্যাহত প্রকাশ। সুতরাং সুন্দরের আবাহনে, কোন রুক্ষতা, কাঠিন্যের মধ্যে তাঁর আসন পাতা হয় না। এইবার মতিলাল বললেন, যারা আমার আশ্রমে ভর্তি হচ্ছে, সে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, কেউ নাবালক নয়। তারা সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক, সকলেই শিক্ষিত, কাউকে কোন লোভ দেখিয়ে বা চাপ দিয়ে এই নিয়মগুলো মানিয়ে নেওয়া হয়নি। তারা নিজেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসব নিয়ম পালন করছে। মতিলাল আবার বললেন, একক ভাবে করলে চাপিয়ে দেওয়া হল না, আর সংঘবদ্ধভাবে করলে চাপিয়ে দেওয়া হল? এটা আমি বুঝতে পারলাম না। আর একবার মতিলাল দেখা করতে গিয়েছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ ধ্যানস্থ।

আজকের প্রবলতম জীবনদর্শনের জোয়ারে রামকৃষ্ণ আর রবীন্দ্রনাথ দুটি ধারা যা ভারতাত্মার 'বাণী' হয়েও বিশ্ব-বাণী-তে পরিণত হয়েছে। একজন আধ্যাত্মিকতা প্রধান সংস্কৃতি, আর একজন সংস্কৃতি প্রধান আধ্যাত্মিক। যখন গুরুত্বে আগে পরে স্থান দেওয়া হয়েছে, তখন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তাধারার কিছু ভিন্নতা থাকবেই—আচরণগত ভিন্নতা তারই প্রকাশ মাত্র। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখি জীবনের প্রবহমানতা, সামগ্রিকতা, পরিপূর্ণতার প্রকাশ। রামকৃষ্ণ, জীবনের অভ্রভেদী তুঙ্গতা স্ব-মহিমায় বিরাজমান।

বুদ্ধদেবের লোক ভাবনা

লোকায়ত জীবন সম্বন্ধে বুদ্ধদেব যে প্রেম ও মৈত্রীর কথা বলেন, এর মধ্যে সনাতন ভারতীয় যোগ-দর্শনের একটা সহজাত তত্ত্বের বিন্যাস আছে। সেটা হচ্ছে এই—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন তাঁর ভাষায়—জগৎ যেন একটা আরশি। অর্থাৎ, আরশির সামনে আমি হাসলে হাসি দেখতে পাব, কাঁদলে কান্না। তেমনি পরিষ্কার করে বললে, এই জগত, বিশ্ব সৃষ্টি এমন এক অদ্ভুত নিয়মে রচিত হয়েছে যে, আমি যাই আচরণ

করি, তাই সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে আমার কাছে ফিরে আসে। এই জগতের প্রতি আমি যদি মিথ্যা আচরণ করি, আমি যদি হিংসা, দ্বেষ, অন্যায়কে প্রশ্রয় দিই, তাহলে তা অবধারিত নিখুঁত ভাবে আমার কাছে ফিরে আসবেই আসবে—এ ভগবানও এড়ান না। কোন থানা, পুলিশ, আইন-আদালত, কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। এই জগতের প্রতি পরমাণুতে বিপরীত মেরু প্রবণতার ঝঙ্কার চলছে। সমস্ত বিশ্ব-চেতনার মধ্যে এই বিপরীত মেরু চেতনার প্রবণতা। এটা যেমন সমাজ বিজ্ঞানের দিক দিয়ে সত্য, তেমনি যোগ-তত্ত্বের দিক দিয়েও। বুদ্ধদেব সমস্ত মানুষের প্রতি, সমস্ত প্রাণীর প্রতি প্রেম-মৈত্রীর ভাবনা পোষণ করতে বলছেন। কেননা, মানুষ জন্ম-জন্মান্তর ধরে আপন হীনমন্যতায় আর ক্ষুদ্রতম স্বার্থ প্রবণতায় হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতার ভাবনা নিয়ে আছে। মানুষ যদি এই জগতের সবার প্রতি এই প্রেম-মৈত্রীর ভাবনা পোষণ করে, তাহলে এই প্রেম-মৈত্রীর ভাবনা তার কাছে অবধারিত ভাবে ফিরে আসবে। কোন দেখানো মহৎ কাজের ঝঞ্ঝাট নেই। কারণ, তার মধ্যে মানুষের একটা অহমিকাপ্রসূত ভড়ং থাকে, কাজেই তারা প্রতিফল দিতে অসমর্থ। সার্বজনীন ভাবে আমি যদি সবার প্রতি প্রেম-মৈত্রীর ভাবনা পোষণ করি, তাহলে অবধারিত ভাবে বিশ্ব-চেতনার সর্বস্তর থেকে সেই প্রেম-মৈত্রীর ভাবনা আমার কাছে ফিরে আসবে। আমি চাই বা না চাই, এই প্রেম-মৈত্রীর ভাবনা জল-স্থল-অন্তরীক্ষ, সর্ব স্তর থেকে সর্বব্যাপ্ত হয়ে, পরিপ্লাবিত হয়ে, আমার জীবনে সিঞ্চিত হবে এবং অন্তিমে এই বিশ্ব-বিভ্রাটের আড়ালে পরম শান্তিময় যে ধ্যানের জগত, তা আমার কাছে প্রকাশিত হবে। তাই আমরা দেখতে পাই—বুদ্ধদেব তাঁর জাগ্রত জীবনে যেমন বারবার প্রেম-মৈত্রী ভাবনার কথা বলে গেছেন, অপর দিকে সন্ধ্যার সময় সব শিষ্যদের নিয়ে ধ্যানের আসনে বসতেন, সেই নির্বাণ-শান্তিসুখের অভিযাত্রীদের এগিয়ে নিয়ে যেতন।

ঠাকুরের কথা—জগত যেন একটা আরশি। লাও সে তুং বলেছেন—জগতের প্রতি সেই আচরণ কর, সেই ভাবনা পোষণ কর, যা তুমি জগতের কাছ থেকে আশা কর। তলস্তয় আর একটা কথা বলেছিলেন—জগতের প্রতি সেই ভাবনা আমরা স্বতঃই করে থাকি, যা আমরা জগতের কাছ থেকে ফিরে পাই। গোটা পৃথিবীর মনীষীরা এক বাক্যে সেই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। এটা বুদ্ধদেবের জীবন দর্শনের লোকায়ত দিক। শ্রীরামকৃষ্ণে তারই পরিবেশন বৈচিত্র।

আপনারা দেখতে পারেন ছোট ছোট ঘটনা। এই ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে কয়েকজন এক বালতি চুনগোলা জল খাইয়ে দিল—নাও শরবত। তারপরে দেখা গেল সেই লোকগুলো ছটফট করছে—প্রাণ যায়। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কাছ এসে বলল—বাবা বাঁচাও। ব্যাটারা জানে না তো এ পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে বিরাজ করছে। তাই দু দশদিন পরে নয়, এক্ষুনি ভোগ করতে হবে। এবং, তাদের তেমন কোন সুকৃতি নেই যে কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখল। তারপর ত্রৈলঙ্গ স্বামী তাদের ঠিক করে দিলেন। ইতিমধ্যে তাদের, আরশিতে মুখ দ্যাখা কিছুটা হয়ে গেছে।

বুদ্ধদেবের রূপ প্রসঙ্গে —

বুদ্ধদেবের মূর্তি দেখ কত সুন্দর। অতলস্পর্শী ধ্যানমগ্নতা, আর সর্বব্যাপ্ত প্রেমময়তা। যুগ যুগ ধরে মানুষ তাঁর জীবন ধ্যান করেছে। ধ্যান করে করে, সাধনার মধ্যে দিয়ে তাদের ধ্যানের উপলব্ধিতে পরিশীলিত এই রূপ পেয়েছে। তাঁর জীবনের দুটো দিক

দেখেছি—একদিকে অগাধ প্রেম-মৈত্রী-করুণার ভাবনা, আর অপর দিকে ধ্যানের গভীরের পরম প্রশান্তি। কাজেই, তোমাকে যদি কেউ বলে—বুদ্ধদেবের মুখ কি এরকম ছিল? তখনকার দিনে কি ফটো ছিল, কি ভাবে করল? তখন তুমি বলবে, হ্যাঁ, বুদ্ধদেবের মুখ এরকমই ছিল।

চৈতন্য চরিতামৃত

শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলায় আছে—

"রাই কহে কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত
নিরন্তর কাম ক্রীড়া যাহার চরিত।"

ধীর-ললিত-মানে ধীর এবং প্রিয়কারী। ক্রীড়া-সম্পূর্ণ বা সর্বাধিক সামর্থবান, এই সামর্থে নিরন্তর কামক্রীড়া। ভগবান নিরন্তর গভীর প্রেমে সমস্ত সৃষ্টিকে আকর্ষণ করছেন—বিশেষ করে যেখানে চেতনার বিকাশ হয়েছে আনন্দ স্বরূপ আস্বাদনের জন্য, সেই সাধক এবং বিশেষ করে মহাপুরুষরা তাঁর নিরন্তর প্রেমের আকর্ষণে মত্ত হয়ে আছেন, তন্ময় হয়ে আছেন একইসঙ্গে। সমস্ত জগত তাঁর আকর্ষণে বিহ্বল হয়ে আছে। ঐশ্বর্যের কথায় উপনিষদের একটি কথা আছে—'মহাভয়'। মহাভয়—এটা শাসনের প্রসঙ্গে হতে পারে, আর শাসন সেখানেই যেখানে চেতনা অবগুণ্ঠিত। কিন্তু এটাকে যদি প্রেমের প্রসঙ্গে ধরা যায়, তাহলে সেই মহা-আকর্ষণ, সেই মহা প্রেমে তিনি সমস্ত সৃষ্টি-প্রপঞ্চকে ধারণ করে আছেন। এবং তারই সর্বোত্তম প্রকাশে সাধকরা, বিশেষ করে উচ্চকোটির মহাপুরুষরা সেই প্রেমে বিহ্বল-মত্ত হয়ে আছেন।

এই প্রেমের জন্য ভক্ত-হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হচ্ছে, সেই প্রেমের আকর্ষণে তারা সাড়া দিচ্ছে, তাই ভক্তের হৃদয়ে এত ভক্তির উদ্বেলতা। যেমন, সূর্যের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ার আসে, তেমনি ভগবানের প্রেমের আকর্ষণে এই পৃথিবীর সাধকদের মনে ভক্তির জোয়ার আসে। এ নিরন্তর কামক্রীড়া, নিরন্তর কামনা, নিরন্তর প্রেমের আকর্ষণে এই পৃথিবীর পবিত্রতম হৃদয়গুলিকে আকুল করে তুলছে। রবীন্দ্রনাথের গান আছে, 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হোত যে মিছে।' এখানেই তো থামেননি, বলছেন আরও গভীর করে,—'ফাগুনের কুসুম ফোটা হবে ফাঁকি / আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি'। একটা কুঁড়িও যদি বাকি থাকে, সেখানেও সেই বিশ্বব্যাপ্ত প্রেম যেন বদ্ধ হচ্ছে, কুণ্ঠিত হচ্ছে। সুতরাং এই প্রেম সর্বাতিশায়ী। সামান্যতম উন্মুখতা সেই প্রেম আকর্ষণের ক্ষেত্রে বিরাট ভাবে এবং নিশ্চিত মহা পরিণতির অভিমুখে কাজ করে যায়, বাধা-বন্ধনহীন, অবাধিত, সেই জন্য বলা হয়েছে নিরন্তর কামক্রীড়া।

মানসিকতা

মানসিকতাটাই বড়। হিমালয়ের গাড়োয়ালে দেখেছি কত লোক সেখানে জমিয়ে ঘরকন্না করছে। কিন্তু সেখানেই আবার কত সাধু-সন্ন্যাসী কঠোর জীবনে কঠিন তপস্যার মধ্যে মশগুল হয়ে আছে। তারা শহরের শিক্ষিত ছেলেরা। পাহাড়ি লোকেরা তো সেসব কতই দেখছে, কিন্তু তাদের স্পর্শ করছে না। সারাদিন খেটে-খুটে বাড়ি ফিরে নেশা-

ভাঙ করে, আবার সকাল হলেই কাজে বেরোয়। তাদের লোভ, তাদের কাম, তাদের সঞ্চয়-প্রবৃত্তি সবই আছে। ঐখানেই তো তারা বংশপরম্পরায় আছে। আবার আবহমান কাল ধরেই তপস্বী সাধুরা এই কঠিন শীতেও ন্যাকড়া পরে আছে। খাওয়া বলতে খেসারির ডাল আর মোটা জোয়ারের রুটি। কারো খালি পা, কাবো পায়ে টায়ারের চটি, কেউ বা খড়ম পায়ে, পাত্র নিয়ে ছত্রে এসেছে খাবার নিতে। শান্ত মূর্তি সব। জীবনের ঐটুকু প্রয়োজন সেরে, আবার কোথায় কোথায় সব চলে গেল। ছত্রের পাশে থাকতাম, কতই তপস্বী দেখেছি। আর পাশাপাশি দেখেছি পাহাড়িদের জীবনে এসব কোনভাবেই স্পর্শ করে না। কাজেই, মানসিকতাই বড়।

শ্মশানের কথা বলেছিলাম। সেখানেও দেখলাম নাচছে-কুঁদছে, তাড়ি খেয়ে হল্লা করচে, কখনো মারামারি। অথচ তারাই তো দেখছে কত সাধু-সন্ন্যাসী কত কঠিন, কঠোর তপস্যা করছে সেখানে। কিন্তু তাদের এসব কিছু স্পর্শ করে না। বিবেকানন্দ তো এর মধ্যেই ছিলেন, ঠাকুবের সন্তানবা। এই সংকীর্ণ সমাজ-সংসার, এই পরিবেশই তো তাঁদের ফুটিয়ে তুলেছে। যে পরিবেশ তাদের সফলতা দিল, তাকে খারাপ বলতে পারবেন না। যে পাঁকে পদ্ম জন্মায়, সেই পাঁকটাও সফল।

আমি তো জীবনের বহু বছর সম্পূর্ণ আকাশবৃত্তি নিয়ে, একা একা সর্বত্র ঘুরেছি—সাগরের তীর থেকে হিমালয় পর্যন্ত, কোন দিন কোন কিছুর জন্যই অপেক্ষা কবিনি, তা আমি এই সব দেখেছি, মানুষের এই অবস্থা। একমাত্র মানুষের মানসিকতা, তার দুর্জয় সংকল্পশক্তি, সমস্ত বিরুদ্ধতার মধ্যেও তা অপ্রতিহত আবেগে জ্বলে ওঠে—জয়ী হয়।

মন্ত্র জপ

মন্ত্রের মূলীভূত তরঙ্গগুলো যত উর্ধ্বায়িত হচ্ছে, ততই আপাতবিরোধী তরঙ্গের প্রভাবে মানসক্ষেত্রের যে চঞ্চলতা, তা স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। জগত ব্যাপারে সম্পর্কটা আলগা হয়ে যাচ্ছে। কাজেই তার মধ্যে থাকলেও তাকে কিছু নাড়াতে পারে না। যখন আরও উন্নত অবস্থায় সে সেই মন্ত্র নিয়ে বসছে, মন্ত্র স্বতঃই তার মূলীভূত তরঙ্গ টাকে প্রচণ্ড ভাবে উদ্দীপ্ত করে তাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে মন্ত্র আর মন্ত্রের উৎস শক্তি এক। মন্ত্র আর মন্ত্রের যে উৎস শক্তি, মূলীভূত শক্তি এক, কাজেই সেখানে ধ্যান না হয়ে উপায় থাকে না। মন্ত্র আপাত শব্দময়, কিন্তু মন্ত্রের অন্তর্নিহিত একটা শক্তি কাজ করে, সেটাকে ধরা বা জাগানোর জন্য মন্ত্র জপ করছে। যে যত সংঘাতময় জীবনের মধ্যে আছে, মন্ত্র জপ তার কাছে তত আড়ম্বরপূর্ণ। অন্তর ক্ষেত্রে যেন এক একটা হুঙ্কার দিচ্ছে। মন্ত্র যত সূক্ষ্ম, উন্নত এবং মনঃস্তরের প্রান্তবর্তী হয়ে যাচ্ছে, তত মন্ত্রের অন্তর্নিহিত স্পন্দন যেটা, সেটা প্রবল হয়। একে তেজ বলতে পার। এই তেজের যখন স্ফূরণ হচ্ছে, তখন ধ্যান না হয়ে পারে না। কারণ মন্ত্রের শব্দময় দিক যেটা, সেটা উহ্য হয়—থাকে, থাকে না। মন্ত্রের শব্দময় দিক তত প্রবল, যে যতখানি মানসক্ষেত্রে মনঃক্ষেত্রে বিরাজ করছে। যে যতখানি মানসক্ষেত্রের উর্ধ্বায়িত অবস্থায় আছে, তার কাছে তার অন্তর ক্ষেত্রে, তত মন্ত্রের স্পন্দনময় শক্তিময় দিকটা প্রবল, সোচ্চার, যেন বিদ্যুৎ প্রবাহের মত তরঙ্গ তুলেছে। সাধকের ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি বিযুক্ত হচ্ছে, সেখানে

আন্তরক্রিয়া জেগে ওঠে। এখানেই সাধনা আর কৃপা একীভূত হয়। এবার হয়ত শাস্ত্রোক্ত বৈখরী, মধ্যমা আর পশ্যন্তী কথাগুলোর মানে অনেকটাই বোঝা যাবে। পশ্যন্তী স্তরেই প্রায় একীভূত হয়। তবে পরা-তেই পূর্ণতা।

আবার বলি, সাধক যত সংঘাতময় স্তরে থাকে, তত অন্তরশক্তির থেকে ক্রিয়াশক্তির প্রাবল্য বেশী। যত উর্ধ্বায়িত হচ্ছে, তত ক্রিয়াশক্তির যে স্থূলতর দিকটা, সেটা খসে যাচ্ছে, সেখানে ইচ্ছাশক্তি, সাধকের সংকল্পশক্তি, সংহত এবং প্রবল থাকছে, তাই তাকে রাস্তা করে দেয়। এটা সিঁড়ি নয় যে আমি একতলা, দোতলা উঠছি। একটা গ্যাস বেলুন উড়িয়ে দিলে, প্রথমে হু হু ক'রে উঠে গেল। যত উপরের স্তরে যাচ্ছে, তত ধীরে ধীরে উঠছে এটা বোঝা যায় চরমে স্থির হয়ে যাচ্ছে। কেননা, তার সাম্যতার স্তর পেয়ে যায়। যত সংঘাতময় দিক, তত তার শক্তি রজোশক্তি যুক্ত থাকছে। আর যত উন্নত হচ্ছে আরও পবিত্র, আরও সূক্ষ্ম হচ্ছে, তত সত্ত্বের শক্তি জেগে উঠচে। যখন সত্ত্বের সঙ্গে, তখন সত্ত্ব ক্রমেই প্রবল এবং সূক্ষ্মতর হয়ে যাচ্ছে। যেখানে করি-করায় একাকার। ধ্যানের সৌন্দর্য তখন মনকে গ্রাস করে। যার জন্য মন্ত্র জপের এত গুরুত্ব। হিন্দু, সুফি এবং জৈনরা জপের ওপর প্রাধান্য দেয় এবং সাধারণ ভাবে সাধকদের খুবই জোর দিয়ে করা উচিত। সে যদি ধ্যান করতে চায়—তার মানে 'ইতোঃ নষ্ট ততোঃ ভ্রষ্ট'। জপের চেয়ে ধ্যান ভালো বলে বসে গেলাম ধ্যান করতে। তা হয় না। সব কিছুর পেছনে মানুষের বর্তমান অবস্থাটাই বড় কথা। মন যখন অন্তর-বাহিরে পবিত্রতার আকর হয়ে ওঠে, তখনি নির্বাসনার বা ধ্যানের অবস্থা। যার জন্য সারদা মা বলছেন,—'চাইতে হয় তো নির্বাসনা।' অন্তত চাওয়াটা তো শুরু হোক। জলের তরঙ্গ আছে বলেই আকাশের এত সৌন্দর্য খানখান হয়ে যাচ্ছে। জল শান্ত হলেই আকাশের নির্মল ব্যাপ্তি ফুটে ওঠে।

প্রাণশক্তি

নিজের তপস্যার আসনই সবচেয়ে বড় জিনিস। নিজের তপস্যার আসনে জমাও নিজেকে। একজন বলল, সবাই মিলে দল বেঁধে ধ্যান করব। আমি বললাম, সমবেত উপাসনা হতে পারে, কিন্তু ধ্যান হবে না। সেখানে—'আর যেন কেউ নাহি দ্যাখে'। অর্থাৎ সত্ত্বার গভীরতম স্তরে একান্ত নিবিষ্ট হওয়ার কথা।

আত্মা তো আছে এই খোলের মধ্যে। সেটা স্পন্দিত হচ্ছে। প্রাণশক্তির প্রবাহ তারই ক্রিয়াশক্তিগত প্রকাশ। সাধনার মধ্যে দিয়ে তা সংহত হয়। সেটা যদি ব্যয় হয়ে যায়, খরচ হয়ে যায়, তাহলে আর তেমন সংহত হতে পারে না। সেটা আত্মার শক্তিতেই চলছে মানুষ। সেই প্রাণশক্তি, যা পৃথীস্তরে অপব্যয় হয়ে গেছে, সেটা আর ফিরে আসবে না। দেহত্যাগকালে অবশিষ্ট প্রাণশক্তি সংহত হয়ে মারা যায়। একটা বীজের মধ্যে একটা গাছের সমস্ত কিছু সংহত হয়ে আছে। সেই বীজ প্রাণশক্তি বিকিরণ করছে—গাছের প্রকাশ। কিন্তু গাছের শিকড়, ইত্যাদি কেটে দিলে প্রাণশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। একটা আত্মা যে জন্ম নিচ্ছে, তার মধ্যেও শক্তির স্তরভেদ আছে, আবার নতুন করে স্পন্দন তুলছে। এই প্রাণশক্তি যে ব্যয় হয়ে গেছে ইচ্ছাশক্তির জাগতিক প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে সেটা সে আর গুটিয়ে আনতে পারবে না। 'বিয়ন্ড ম্যান'-এ সত্যব্রতা মাদার বলছেন, আমার

ভাইটাল অনেক নষ্ট হয়ে গেছে। ও বলল, ভাইটাল কি? বললাম, এই প্রাণশক্তি। আত্মার তো ক্ষয় নেই, প্রাণেরই ক্ষয়। আত্মার বিকাশ এই জীবন। সত্ত্বাধিক্য হলে জাগতিক সঙ্কল্পশক্তি নষ্ট হয়ে যায়, তখন প্রাণ সংহৃত হয়ে থাকে। এসব কারণে অল্প বয়স থেকেই সৎ শিক্ষা, সদাচার, সৎ জীবনের জন্য গুরুত্ব দেওয়া হয়। তেমন শুদ্ধ বা সাত্ত্বিক আধারে কখনো ভোগ-মুখী প্রবণতা আসে না। অমলিন মল্লিকা।

উপাদান

তিন ধরনের লোক আছে। এক ধরনের, যারা ভুলই করে না। আর এক ধরনের লোক, ভুল করে আপসোস হয়, পরে আর করে না। আর এক দল আছে, যারা মনে করে ভুল করেছি আর করব না, কিন্তু আবার করে। এই যে বলছে, মন্ত্রটা পেয়ে তার তো ইচ্ছে হ'ল রাজা—জমিদারদের টানি। মনের মধ্যে সেই উপাদানটা কিছু হলেও তার ছিল, পরে বুঝলেন কাজটা ভালো না। সেখানে উচ্চ অবস্থা সম্পন্ন মহাপুরুষ যদি কেউ থাকতেন, বলতেন— ও এই ভুলটা করবে, আর ও এই ভুলটা করবে না, স্বতঃসিদ্ধ। কেননা, ভুল করা — না করার উপাদানটা তার সত্তার মধ্যেই থাকে। একমাত্র আধ্যাত্মিক চেতনার তারতম্যই এর জন্য দায়ী, আর কিছু নয়। আর একজন তো এসব পরিস্থিতিতে সততার সঙ্গে পথ চলছে, সে তো ভুল করছে না। স্বামীজীর কথা বলা যেতে পারে—পরমার্থকে প্রধান করে জেনেছিলেন বলেই স্বামীজী সত্যের সম্মানে রাজার সামনে রাজার ছবিতে, রাজকর্মচারীদের থুথু ফেলতে বলতে পেরেছিলেন।

ধর্ম

একটা হচ্ছে—আধ্যাত্মিকতা, যা একান্তই অধিকারী সাপেক্ষে। আর একটা হচ্ছে—ধর্ম, যা সার্বজনীন। ধর্ম, যা সবার জন্য আচরণীয়, গ্রহণযোগ্য। ধর্ম-সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে, এ ভাবে দেখা হয়। সমষ্টিগত বোধ, এখানে সমষ্টির অধিকার নিয়ে। আধ্যাত্মিকতা ব্যক্তির অধিকার নিয়ে, ব্যষ্টিকেন্দ্রিক। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে প্রত্যেকে তার আপন অধিকার বা স্তর অনুযায়ী এগোবে। এটা একটা তুঙ্গতার কথা।

আত্মবিকাশের জন্য যা সামাজিকগত-সমষ্টিগত ক্ষেত্রে আচরণ করা সম্ভব, সেটাই ধর্ম। সেদিক দিয়ে সামাজিক। ধর্ম আর আধ্যাত্মিকতা দুটো পারস্পরিক জিনিস। একটার উপর আর একটা দাঁড়িয়ে আছে। একটা না থাকলে আর একটার দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। স্বামীজীর একটা কথা আছে, কোন মানুষ জন্মগত ভাবে ধর্ম নিয়ে জন্মায়নি, পরন্তু সে কোন না কোন ধর্মের জন্যই জন্মায়। সুন্দর কথা। বলছেন, 'আমাদের এই পৃথিবীতে যে সমস্ত ধর্ম-আচরণ পদ্ধতি আছে, তার কোন না কোনটার জন্য সে অবশ্যই জন্মেছে, কোন না কোনটা তার পক্ষে আচরণীয়, সম্ভব। এই ধর্মাচরণের মধ্যে দিয়েই তুঙ্গতার ক্ষেত্রে বা শীর্ষায়িতের ক্ষেত্রে সে আধ্যাত্মিকতার নাগাল পেয়ে যাবে—যদি সেটুকু অধিকার থাকে।

এখন, পৃথিবীর অনেক ধর্মে দেখা যায় সমষ্টিগত আচরণের উপর অধিক জোর দিতে, তাতে ধর্মের সামাজিক রূপটা সমৃদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তুঙ্গতার সম্ভাবনা ব্যহত

হয়। অপর পক্ষে কোন কোন ধর্মে তুঙ্গতার দিকটা অধিক মনে রাখে, সেইজন্য কিছু মানুষ ধর্মাচরণের মধ্যে দিয়ে সেই তুঙ্গতার নাগাল পেয়ে যায়। কাজেই সেই ধর্ম সামাজিক বা গোষ্ঠিগত ক্ষেত্রে অত একাতবদ্ধ হয় না, কিন্তু সেই ধর্ম মহত্তর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা সর্বদাই বজায় রাখে। সামাজিক উপাদানটা বড় কবে দেখবে না ধর্মের চরমতম উপাদানকে বড় করে দেখবে, সেটা যারা ধর্মাচার্য, তাদের বিচার্য। এরপর দেশ-কাল-পাত্রেব বিবেচনা আছে, যেগুলো দিয়ে এই সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয়। এইগুলো না জেনে আমরা বাইরের দিক থেকে মনে করি কোন ধর্মের মধ্যে খুব ভ্রাতৃবন্ধন আছে, ভারি গতি আছে, ভারি গোষ্ঠিবন্ধন আছে, কোন ধর্ম বিচ্ছিন্নতা প্রশ্রয় দেয়, কোন ধর্ম সামাজিক দিকটা কম স্বীকার করে। বস্তুত অস্বীকার করে কোন ধর্ম হয় না। আবার তুঙ্গতার দিক বজায় রাখতে গেলে সামাজিক বিধি-নিষেধের কঠোরতা হ্রাস করতেই হয়। সেখানে সাধকের ব্যক্তিগত রূপান্তর যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। শীর্ষায়িতের গৌরব সেখানে সামগ্রিক মহত্ব দান করে। ধর্মের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মূল গঠনগত কার্যকারণগুলো এবং ঐতিহাসিক দিকটি আমাদের জানা দরকার।

কোথাও মহত্তম সাফল্যের সম্ভাবনা প্রশস্ত করার তাগিদে সামাজিক গোষ্ঠিবদ্ধতাকে অত জোর দেওয়া হয়নি, ধর্মের তুঙ্গতাকে জোর দেওয়া হয়েছে। সেখানে সামাজিক বা মানবিক মূল্যকে সবসময় চরম লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সেইজন্য সামাজিক বা মানবিক ভাবনাগুলো সেখানে তেমন স্ফুট দেখা যায় না। এইজন্য দলীয় ভাবনা বা গোষ্ঠিগত ভাবনা সব ধর্মের একরকম হয় না। তার মানে এটা নয় যে সে অস্বীকার করছে। মূলগত কারণ তার গঠনগত বিন্যাস যা সেই ধর্মকে নির্দিষ্ট রূপ দান করে।

মীরার ভজন

একটা ভজনে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলছে—নিশিদিন দরশন তুমহারি প্রভুজী। আর যেখানে ছেড়ে দিচ্ছে, সেখানে যন্ত্র সংগীত আছে, সেখানেও ঐ কথাটা বাজছে। ভেতরে ঐ কথা যদি অনুরণন হয়, কেমন লাগে বল দিকিনি?

মীরার আর একটা ভজন আছে—'মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগর-দ্বিজ-প্রেম ভরি'। আমার অন্তরের পাত্র তোমার প্রেম দিয়ে ভরে দাও। ফিরে ফিরে আসছে—দ্বিজ প্রেম ভরি। এই পদটা যদি ভেতরে সাড়া দেয়, কিরকম হয় বল তো? মীরার ভজন প্রাণটা যেন ভরিয়ে দেয়। আর, ভেতরে লহর তুলছে। একটা 'নিশিদিন দরশ তুমহারি', আর একটা 'দ্বিজ প্রেম ভরি'। মীরার জগত গিরিধারী নাগরময় হয়ে গেছে, কাজেই আর অন্য কিছু চাইবার অবকাশ নেই, সেইজন্য বারবার বলছে--দ্বিজ প্রেম ভরি। ভরেও যেন ভরছে না, এইজন্য বারবার বলছে—ভরিয়ে দাও। সবকিছুর মধ্যে ঐ সুরটা বাজছে। কথাগুলো শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি। যতক্ষণ ঘুম হচ্ছে, ঐ কথাটাই আসছে। এন্ডলেস ক্যাসেটে একই কথা বাজে না? সেরকম ঐ কথাটাই ঘুরে ফিরে বাজছে। সেই সুখের ঘুমটা ভেঙে গেলে মনে হচ্ছে—আঃ, গানটা থেমে গেল।

জীবন ধারা

সাধারণ মানুষ অসহায়। বুঝলেও কিছু করতে পারে না। গোটা সৃষ্টিটাই এই। আরও নিচের সৃষ্টি দেখুন না, কুকুর, বেড়ালেরা, এরা কত সংঘাতের মধ্যে, বৈপরীত্যের মধ্যে জীবনযাপন করছে। যত স্থূল হয়ে যাচ্ছে, তত বৈপরীত্যময়, সংঘাতময়। মানুষ যত উন্নত হয়, মানুষের চেষ্টায়, মানুষের সাধনায়, সে তত শান্ত হয়। সাধারণ ভাবে সেই চেষ্টাটাই তো জাগে না ভেতরে। ক্ষণিকের জন্য জাগলেও মিলিয়ে যায়। ইচ্ছাটা দৃঢ় হয় না। আবার জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতিতে তার দৃঢ় ইচ্ছা জন্মায়, যাতে ক্রমবিকাশের পথে কোন কিছু বাধা জন্মায় না। সেইজন্য মহৎ জীবন, শান্ত জীবন, শান্তি, এইগুলো খুব দুর্লভ। সাধারণ মানুষ জড় জীবনের মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছে। মানুষ জন্মে যেন অনেকাল জেল খাটার পর ছাড়া পেয়েছে। জেলের জীবনটা ভালো লেগেছে তা নয়। গতানুগতিক ভাবে সব করেছে। এতকালের বদ্ধ জীবন, তা থেকে ফিরতেও চায়না। হয়ত ছাড়া পেয়েছে, কিন্তু সেখানেই পুলিশবাবুদের ফাই-ফরমাশ খাটছে। তেমনি মানুষ এত জন্মের পশ্বাচারের মধ্যে কাটিয়েছে, ফলে ক্রম মুক্ত হলেও সহজে মুক্তির স্বাধীনতার স্বাদ নিতে পারে না। আস্তে আস্তে মুক্ত জীবনের, মহৎ জীবনের, স্বাধীন জীবনের অভিলাষ হয়। স্বাধীন কিসের? সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব থেকে, প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি। মুক্ত হলেই প্রশান্তি, মুক্ত হলেই ব্যাপ্তি। সাধারণ মানুষ প্রবৃত্তির নিগড়ে বাঁধা আছে। একটা হাতি যেন বাধা আছে শেকলে, একটা সিংহ যেন খাঁচায়। আস্তে আস্তে প্রবৃত্তি, আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। পিঞ্জরমুক্ত সিংহের মত। এসব সত্য কথা।

একটা তেলুগু মেয়ে কাজ করত। কিছু টাকা পেত। ঐ ঘরটায় থাকত, তার স্বামীও থাকত। তাদের ঘরের সামনে একটা কল ছিল, ব্যবহার করত। স্বামীটাও কোথাও কাজ করত। প্রত্যেক মাসে মাইনেটা পেয়েই স্বামীটা বেপাত্তা। ৫/৭ দিন পর যখন ফিরত, ধুলো-ময়লা, চুল উস্কো-খুস্কো, চোখ রাঙা, গায়ে গন্ধ আর পকেটে কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকত, তখন খেয়াল হোত এসব অন্যায়, ফিরতে হবে। ফিরে এসে চুপচাপ বসে থাকত। বউটা প্রথম খুব গালাগালি দিত তেলুগু ভাষায়, কাঁদত খুব। তারপর লোকটাকে কলতলায় বসিয়ে আপাদমস্তক সাবান দিয়ে ধোয়াত। লোকটাও মেয়েটার পা ধরে কাঁদত, আর কখনো যাব না, তোর কাছেই থাকব। লোকটা কাঁদছে, বউটাও কাঁদছে। সাবান দিয়ে আপাদমস্তক ধোয়াত, আর কাচা জামাকাপড় পরাত। মা, আর দিদি পাঁচিলের ওপার থেকে গাল দিত—দূর করে দে, ঘরে ঢুকতে দিস কেন? অমুক তমুক। ফি মাসেই এরকম হোত। আবার পরের মাসেই যথারীতি। তখন আমি একদিন বললাম, তোমরা যে এ ভাবে গালাগাল দাও, লোকটা কিন্তু পারে না, খুব অসহায়। মা, দিদি আমাকে বকা দিত, তোর তত্ত্বজ্ঞান হয়ে গেছে, পাকা হয়ে গেছিস।

এর মধ্যে একটা ভালো জিনিস দেখুন, বউটার সতীত্বটা। চোখের জল মুছে আবার রাঁধতে যেত। এটা একটা নীচু মানুষের নীচু ছবি। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ কোন না কোন জায়গায় অসহায়। ভালো-মন্দ জ্ঞান সকলেরই আছে, কিন্তু মানুষ খুব অসহায়, এটাই বলতে চাইছি। মানুষ যত উন্নত হচ্ছে, মহৎ হচ্ছে, তার বাধাটা তত সূক্ষ্ম হয়ে যাচ্ছে, তত মোটা থাকছে না। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ সেই জায়গায় অসহায়, যেখানে সে অতিক্রম

করতে পারছে না। ঠিক কিনা? জিনিসটাকে বাড়িয়ে নিয়ে যান—সে তো মুক্ত পুরুষের মত পরামানন্দ ভোগ করতে পারছে না। সারদা মা বলছেন, মুক্ত পুরুষ পরমানন্দে পাখির মত আকাশে উড়ে বেড়ায়। সে তো লক্ষে একজনও নয়। কোন না কোন জায়গায় বাধা পাচ্ছে, কষ্ট পাচ্ছে। জিনিসটাকে টেনে নিয়ে যান আরও। জগন্মাতা ধৈর্য ধরে সাবান লাগিয়ে যাচ্ছেন।

দক্ষিণেশ্বর ঘাটে নৌকোওয়ালাদের দেখতাম ভোরবেলা থেকে কাজ করত, জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। অনেককাল আগের কথা বলছি, এখন দেখা যায় কিনা জানি না। তখন পাড়টা বাঁধানো হয়নি, মাটি ভেঙে পড়ত। দুপুরবেলা ওরা ডাল, ভাত রাঁধত, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলত। আবার সন্ধ্যেবেলা কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। আবার ভোররাত্রি থেকে কাজ করত। মাঝেমাঝে দেখতাম নতুন ছেলে আসত, বুড়ো লোকগুলো চলে যেত। এটুকু পরিবর্তন, কিন্তু রোজ দিনের ছবি এক। একজন বলল, ওদের দারুণ জীবন—কোন লোভ নেই, অশান্তি নেই, সংঘাত নেই, স্বার্থ নেই, মানুষের যা কিছু পরিত্যাজ্য তা সব থেকে মুক্ত। আমি বললাম—এটা খুব খারাপ জিনিস। বলল—কেন? তারা কিন্তু এক জায়গাতেই আছে, তাদের মনের বিকাশের কোন রাস্তা নেই, এই জড়তার মধ্যে যেন দিনগত পাপক্ষয়। এক স্থবির জীবনযাত্রা। ওদের জীবনে কোন ভাবনা-চিন্তা, কোন উত্তরণের ব্যাপারই নেই, কলের পুতুলের মত সারাজীবন একই জিনিস। জোয়ান বয়সে এসেছে, বুড়ো হলে চলে যাচ্ছে। বরং যারা সংঘাতের মধ্যে আছে, সাফল্য, ব্যর্থতার মধ্যে, হাসিকান্নার মধ্যে আছে, তারা ভালো। অন্তরের শক্তি হয়ত জেগে উঠবে কোন দিন। এই 'সুখের গ্লানি' ঝেড়ে ফেলে বলে উঠবে—'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে।'

মানুষের যা কিছু দুর্বলতা, তার লোভ, তার অসহায়তা—তাতে সে ব্যথা পাচ্ছে, কষ্ট পাচ্ছে, তার মধ্যে সে ছটফট করছে, কিন্তু তলে তলে তার মধ্যে কোথাও একটা উত্তরণের অভিলাষ জেগে উঠছে—না, এর থেকে আমাকে মুক্ত হতে হবে। বন্ধনের জ্বালাও নেই, মুক্তির ইচ্ছাও নেই, সে দারুণ অসহায়। এই জড়তা যেখানেই যায় সেটা অনভিপ্রেত। তার থেকে যারা কষ্ট পাচ্ছে, যেখানে বদ্ধ, তার থেকে উত্তরণের চেষ্টা করছে, সেটা ভালো। আমাদের জীবনে অনেক ভালো-মন্দ, পারা না পারা আছে, তার মধ্যে আমাদের দিনটা কাটে। কিন্তু ওখানে কিছু নেই, একটা দেওয়াল মুখো মানুষ। যে যেখানেই থাক, একটা আন্তর প্রক্রিয়া উত্তরণের, সেটা খুব জরুরী নয় কি? যিশু বলেছেন, 'কাউকে কথা দিও না।' আমার মনে হয়—নিজেকে পরিবর্তনের মহত্তম অধিকারের কথাই বলেছেন।

সাধনা

প্রথম অবস্থায় চঞ্চল হয়, পরে মোটামুটি থাকে-গাড়ির স্পিড কখনো বড়াছে কখনো কমছে, কিন্তু গাড়িটা চলছে। তখন আর ভাটা থাকে না, একটানা, তবে গতির কম বেশী। সিদ্ধাবস্থায় একটানা জোয়ার। ঠাকুর বলেছেন, প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ আর সিদ্ধের সিদ্ধ। প্রবর্তকের কখনো লাগছে, কখনো লাগছে না। আর সাধক যে, সে সাধছে। তার ভাটা পড়ে না।

দীর্ঘদিন নিয়ম করে সময় মত যদি জপ করা যায়, তবে এটা হয়ে যায়। সেই সময়টা আস্লেই তার জপের প্রবণতা আসে বা মনটা ভেতরে চলে যায়। নিয়ম করে আসে—যেমন রাত হলে ঘুম পায়। সদ্য বাচ্চারা প্রায় সবসময় ঘুমোয়। মায়ের পেটে ১০ মাস ঘুমিয়েছে তো, সেই সংস্কারটাই তখন প্রবল। একটু বড় হলে দিনের বেলা খেলা করছে, নাইছে, খাচ্ছে, রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে সেটাও কাটে। আর একটু বড় হলে সময় মত সবকিছু। তেমনি নিয়ম করে যদি জপ-তপ করা যায়, তাহলে নিয়মই তাকে ধরে থাকে। ঐ সময় এলেই বাহ্যবৃত্তি গুটিয়ে আসে। অন্য সময় বৃত্তিটা কি ছটফট করে? তা নয়, সেই সময় আরও বেশি গুটিয়ে আসে। আমি হাসলাম ঐজন্য যে—মন স্থির হয়েছে, ব্যাগ নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলাম—সেখানেই বসে পড়লাম, তা নয়। ঐ যে বললাম, নিয়ম করে বসতে বসতে নিয়মই তাকে ধরে রাখে, আস্তে আস্তে গুটিয়ে আসে, বাইরের দরজায় কপাট পড়ে যায়। দিনে-রাত্রে কয়েকবার বসার ব্যাপার আছে। আন্তরিক হলে এসব হয়েই যায়। একটা ছেলে বেলতলায় সারা রাত জপ করবে বলে একটা গামছা দিয়ে নিজেকে বেঁধে রেখেছে। সে ভালো ঘুমিয়ে নিল—পড়ে যাবার ভয় নেই তো। এ ধরনের হঠকারিতা নয়। নিয়ম করে বসলে ঐ সময়টা মনটা ভেতরে চলে যায়, নিঃশ্বাস সূক্ষ্ম হয়। মানুষের অভ্যাসের একটা শক্তি, একটা সংকল্প শক্তি থাকে। যে আন্তরিক করে, লেগে থাকে, তার তো এইগুলো হতেই হবে। বাইরের ব্যাপারগুলো স্তিমিত হয়ে আসে। আর, বাইরের ব্যাপারটা স্তিমিত হলেই ভেতরের ব্যাপারটা জেগে উঠবে। অন্তরে আজানের বা মন্ত্রের অনুরণন তো চলছেই, কাজেই জড়তার স্থান নেই। 'জাগো অন্তর ক্ষেত্রে মুক্তির অধিকারে'।

সুন্দরের সাধনা

এই যে শিবুদা এসেছে। শিবুদা হিমালয়ের বিভিন্ন জায়গায় যায়, সুন্দর দেখে বেড়ায়। আমি মনে করি, এই পৃথিবীটা হচ্ছে সুন্দরের পাঠশালা, যেখানে যা কিছু সুন্দর জিনিস আছে, মানুষ দেখে দেখে বেড়াচ্ছে। সুন্দরের যা কিছু বোধ মানুষের জাগ্রত হয় ধীরে ধীরে। অন্তরে যে সুন্দরের বোধ, পরম সুন্দর যদি না থাকত তাহলে এই বাইরের সৌন্দর্য দেখার ইচ্ছা জাগ্রত হোত না। অন্তরে পরম সুন্দর বিরাজ করছেন, তাঁর থেকেই এই সুন্দরের আকুলতা মানুষের মধ্যে জেগে উঠছে। মানুষ সুন্দর খুঁজে খুঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই সুন্দর যিনি আছেন, তাঁর থেকেই সুন্দরের বোধ উৎসারিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে—

"আমারই চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললাম সুন্দর
সুন্দর হ'ল সে।"

আমরা ভুলে আছি সেই সুন্দরকে। কোথায় আছেন, কেমন করে আছেন, কেমন তাঁকে দেখতে? তাই ভগবান চারিদিকে এই সুন্দরের আসর পেতেছেন। মানুষ কত কষ্ট করে কত দূরে দূরে যাচ্ছে, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই সুন্দরের পাঠশালায় পড়াশোনা

করছে, অন্তরে যে সুন্দর আছে তার খবর নেবার জন্য। এ যদি না হয়, তাহলে সুন্দর দেখাটা শুধু দেখার মধ্যেই শেষ। রবীন্দ্রনাথের গান আছে—

"বারে বারে তুমি আপনার হাতে স্বাদে সৌরভে গানে।
বাহির হইতে পরশ করেছ অন্তর মাঝখানে।"

আর বৈষ্ণব কবি গেয়েছেন—"মনের মাঝখানে কে দাঁড়িয়ে আছে, তাই বুঝি রাধার মন মানে না।"

এই অন্তরের মাঝে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন বলেই মানুষ সুন্দরের বোধে বিহ্বল হচ্ছে, আকুল হচ্ছে। এ যেন পরম সুন্দরেরই পুজো হচ্ছে। পুজোর মধ্যে দিয়ে যেমন দেবতা জাগ্রত হয়, তেমনি আমাদের অন্তরের উপলব্ধিতে আমরা ক্রমশ আপ্লুত হচ্ছি। সেই পরম সুন্দরের উপলব্ধিতে বিবশ হয়ে, আনন্দের অঞ্জলি দিচ্ছি সেই সুন্দরেশ্বরের বোধ জাগ্রত করার জন্য—এ শাশ্বত কথা। এই বোধ জাগ্রত করার জন্যই আমাদের সমস্ত সৌন্দর্য সাধনা। আমাদের শিল্প, সংস্কৃতি যেখানেই আমরা এই পরম সৌন্দর্যের আহ্বান জানাচ্ছি, আমাদের অঞ্জলি হয়ে ঝরে পড়ছে তাঁর পায়ে। সেই সুন্দরনাথ—তিনি জেগে উঠছেন। আমাদের এই সুন্দরের পাঠশালায় পড়াশোনা যেদিন শেষ হবে, তাঁর মুখোমুখি হব, মেশামেশি হবে, তাঁর সঙ্গে একাত্ম হব—যিনি এই বিশ্ব-সৃষ্টি এত আনন্দের উপকরণ দিয়ে সাজিয়ে তুলেছেন বারবার। এই পৃথিবী ঋতুতরঙ্গের মধ্যে দিয়ে, সূর্যের আবর্তনের মধ্যে দিয়ে সুন্দরের আবর্তন করছে, সমস্ত ঋতু যেন তাঁকে প্রদক্ষিণ করছে, অঞ্জলি দিচ্ছে। এই পৃথিবীতে আমরা শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে সুন্দরের পুজো করছি সেই পরম সুন্দরের বোধ জাগাবার জন্য। আমাদের সংস্কৃতির সর্ব স্তরে সেই সত্য, শিব, সুন্দরের আবাহন। যেমন মন্দির আছে, দেবতা আছেন, সেই মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করি। তেমনি সমস্ত বোধের মধ্যে দিয়ে সেই পরম বোধকে প্রদক্ষিণ করি, তাকে জাগ্রত-প্রতিষ্ঠিত করি। যেমন বলা যায়, আমাদের অন্তরে পরম চৈতন্য আছেন বুঝব কি করে? হ্যাঁ, বুঝতে পারি। তার প্রতিফলন দেখছি সমাজের কিছু মানুষের মধ্যে বিবেকের অনিবার্য আহ্বানে। চণ্ডীতে বলছে—তিনি বিবেক দীপ হয়ে আমাদের অন্তরে জ্বলে উঠছেন।

আবার চণ্ডীতেই আছে—"সৌম্যাসৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।" সুতরাং অন্তরে সেই জাগৃতির জন্য উপাসনা করে যাচ্ছি। আমাদের অস্তিত্বের সর্বত্রই, আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্মের যে কেন্দ্র, তার সর্বত্রই সেই পরমের উপাসনা।

সর্ব ব্যাপ্ততা

যখন আমি ঈশ্বর স্বরূপতায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছি, আমার চৈতন্য যেখানে যতদূর প্রসারিত হচ্ছে, সেখানেই আমার উপস্থিতি। আমি যখন চিৎ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তখন আমি এক হিসাবে এখানে-ওখানে আছি, আবার এক হিসাবে সর্বব্যাপ্ত। সর্বব্যাপ্ত আবার দুদিক দিয়ে। একটা সৃষ্টির স্থান-কাল-পাত্রের দিক দিয়ে, আর একটা সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করছে। যে স্তরে আমার চেতনা প্রসারিত হচ্ছে, যত গভীরে গহনে প্রসারিত হচ্ছে, সেখানেই এবং স্বরূপেই তা আমার উপলব্ধিগোচর হচ্ছে। আমার একাগ্রতা, মনোযোগ যদি দেওয়ালের ওপারে যায়, তাহলে সেখানে কি আছে সেটাও দেখতে পাব, কেননা এক হিসাবে আমি সব জায়গায় আছি, সর্বব্যাপ্ত এবং সর্ব স্বরূপ হয়ে আছি। আমার

চেতনা অবাধিত হচ্ছে। কাজেই যেখানে আমার মনযোগ, সেখানেই আমার উপস্থিতি। এক হিসাবে আমি সব জায়গায় আছি, আবার কোন জায়গায়ই নেই। কেননা সবিশেষ—নির্বিশেষের বেড়া ভেঙ্গে যে অন্তরে সেই সৎস্বরূপকে বা স্বচ্ছতাকে স্পর্শ করছে, সে বাইরেও স্পর্শ করছে। গীতায় আছে না—'মৎস্থানি সর্বভূতানি, ন চ মৎস্থানি সর্বভূতানি'।

বুদ্ধি আর চেতনা এক জিনিস নয়। আমার চেতনা চৈতন্য করে দে মা চৈতন্যময়ী। ঠাকুর বলেছেন—চৈতন্য হোক। হোক মানে কি? কেউ যদি বলে তুমি বড়লোক হও, তাহলে বুঝতে হবে সে গরীব, তাই হোক বলছে। তেমনি চেতনা বিবেকজাত হলেও মানুষের মন-বুদ্ধির সীমানায়, আব চৈতন্য তার উর্ধ্বে আমাদের পরম আস্পৃহার স্থান।

মন নেই আবার আছে। তা মহামন। মহাপুরুষদের তো একটা ব্যক্তিত্ব আছে, সেই ব্যক্তিত্ব আমাদের ব্যক্তিত্বের মত নয়। আমাদের ব্যক্তিত্ব মন-বুদ্ধির সীমানায়, ওঁনাদের ব্যক্তিত্ব চৈতন্যের সীমানায়। চৈতন্য, মন-বুদ্ধিকে প্রভাবিত, পরিচালিত করছে। একটা শিশুর বুদ্ধি নেই, মন আছে, মন দিয়ে সে সব কিছু করছে। যখন বুদ্ধির বিকাশ হচ্ছে, তখন বুদ্ধি তার মনকে প্রভাবিত, অধিকৃত করছে, তাই তাব সাবালক আচরণ বজায় রাখছে। একটা বয়স্ক লোকের সঙ্গে একটা শিশুর ফারাক যেমন, তেমনি সহস্রগুণ ফারাক একটা চৈতন্যযুক্ত দিব্য ব্যক্তিত্বের। যখন চৈতন্যের বিকাশ হচ্ছে, তখন তা আমাদের মন, বুদ্ধিকে অধিকার করছে। সেই চৈতন্য অধিকৃত মন-বুদ্ধি জগৎ মঙ্গল সংকল্পে কাজ করছে। চৈতন্য বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করছে। চৈতন্য যেমন—যতদূর স্পন্দিত, পুষ্ট হচ্ছে, তেমনি সেই স্তরে তার জ্ঞান-শক্তি প্রসাবিত হচ্ছে। এই জন্য বলা হচ্ছে, 'সকল ভুবন বীজং ব্রহ্ম চৈতন্যমীড়ে'। সমস্ত ভুবনের বীজ আছে চৈতন্যের মধ্যে। বীজটা জানতে পারলে গাছটাও জানতে পারা গেল।

রূপান্তর

মানুষেব আত্মগ্লানি, অনুতাপ, আর্তি, এসব শুচিতার স্বপক্ষে দিব্যাগ্নিব আবাহন। আমরা যেটা খারাপ বলে মনে করি, মনে করলেও যথেষ্ট খারাপ বলে মনে হয় না, সেটা থেকে যায়। অর্থাৎ, বুঝতে পারলেও সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারি না যে, এটা একেবারেই বাজে, এটা সরিয়ে দেওয়া উচিত। কবির খেদ—

'আমি যে প্রাণ ভরি তাদের ঘৃণা করি
তবুও তাই ভালোবাসি।'

এ চিরন্তন। কেননা মানুষের রূপান্তর তো অব্যাহত আছে পরিপূর্ণতায় পৌছনোর আগে পর্যন্ত। এই জিনিসটা সকলের মধ্যে আছে। যার নেই সে মানুষই নয়। এটা একটা অব্যাহত প্রক্রিয়া নয় কি? খুব সাধারণ স্তরের একটা মানুষ খুব আনন্দে থাকতে পারে—আমি খুব ভালো আছি। আবার অনেক উন্নত অবস্থায় কোন মানুষের মধ্যেও দহন জ্বালা আসতে পারে। যার এই ভাবটা আছে, সেই মানুষ। তার মধ্যে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটা অব্যাহত। মানুষ তো একদিন ভগবান হয়ে যাবে, সেটাই তো তার লক্ষ্য।

একটা অবস্থা হচ্ছে—আমি বুঝতে পারছি না। আর একটা অবস্থা হচ্ছে—আমি বুঝতে পারছি, আমার সংকল্প শক্তিতে সংহত করছি সেটা তাড়াব। অর্থাৎ বুঝতে পারলেও

সেটা সরাতে পারছি না ভেতর থেকে। আর একটা অবস্থা হচ্ছে—আমি তাড়াতে পারছি। এই আমার মধ্যে এসে গেল আনন্দ, সন্তোষ। এই আনন্দ সন্তোষের প্রাথমিক আপ্লুত অবস্থা যখন আমি কাটিয়ে উঠব, তখনই আমি চিন্তা করব—আর কি আছে? কেন আমি আমার চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছি না? তখন আবার খুঁজে দেখব। মানুষের মধ্যে এটা একটা প্রক্রিয়া। যে ধরে নিচ্ছে, তার রূপান্তরটা অব্যাহত। যে মানুষ জড়তায় স্তব্ধ হয়ে গেছে, তার পক্ষে তো এই প্রশ্নটা নেই। অনেক কবিতা আছে এই ভাব নিয়ে। এর থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের সাধন সত্তার কথা।

স্তরভেদ

প্রত্যেকটা স্তরের প্রান্তেই স্তর ভেদ। বৈখরী স্তরে সামান্যতম অনুভব ক্ষণেকের জন্য উঁকি মেরে চলে যায়। বৈখরী-সংঘাতময়, তার মত সাধন। কর্তৃত্ব দিয়েই কর্তৃত্বাভিমান কাটানো। তাই সাধন সমর কথাটা খুবই সুপ্রযুক্ত। স্বামীজীর ভাষায়—'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার।'

'আবার মধ্যমা যখন উঁকি মারছে, বৈখরী মধ্যমার মাঝামাঝি, সাধনা তখন নতুন অর্থ নিয়ে দাঁড়ায়। সন্ধিস্থানের এই ঘোর সাধনায় একদিন সে জয়ী হয়। মধ্যমার সাধনা চলে গড়গড় করে। অনেক সহজ, অনেক মসৃণ হয়ে। কর্তৃত্বাভিমান ভেসে যায়। সাধকের ইচ্ছাশক্তি, সংকল্পশক্তি সাধনার গতি সহজ করে। সাধক ভাবে, এভাবে অনন্তকাল সাধনা করতে আপত্তি নেই। বিক্ষিপ্ত মন কখন নিজের অজান্তেই লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে, লুব্ধ হয়ে যাচ্ছে। সাধকের জীবনে সে এক দারুণ স্বাদ। মহতি ইচ্ছার স্রোতে, সংকল্পের উত্তরণে ভেসে যাওয়া। মধ্যমার প্রান্তে সাধক অবাক হয়ে ভাবতে থাকে—সাধনা করি না কবায়? গুরু ভক্তি গুরুতর হয় পশ্যন্তির অন্তঃশ্চারি প্রেরণায়। অধিকারি সাধকের অন্তরে ক্রমে এক মহা আকুলতা জেগে ওঠে অসীমের মাঝে আত্ম-নিবেদনের জন্য—আত্মহারা হবার জন্য। আবার সেই সঙ্গমের হাহাকার। আসে সেই পরম লগ্ন, অনন্ত করুণার জেয়ার হয়ে, অসীম তাকে আত্মসাৎ করে।

চাঁদ-তারা

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত, অন্ত খণ্ড, নবম অধ্যায়ে দেখতে পাই কমলপুরে সবাই ধ্বজা দর্শন করছে এবং প্রণাম করছে। এই প্রসঙ্গে একটা আশ্চর্য কথা—আমরা সবাই দেখি, জগন্নাথ মন্দিরের মাথায় যে ধ্বজা থাকে, সেটা লাল রঙের এবং তাতে যে চিহ্ন থাকে সেটা চন্দ্র এবং বিন্দু চিহ্ন। লাল পতাকার মধ্যে বিন্দু, তার নিচে চাঁদের মত অর্ধাকারবৃত্ত। হাজার বছরের পুরনো হিন্দু ভাবনায় এই চন্দ্র-বিন্দুর ধারণা আছে। আমাদের প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্রে আছে এবং জগন্নাথের মত এরকম প্রাচীন তীর্থ, তার মন্দিরের মাথায় ওড়ানো পতাকায় এই চন্দ্র আর বিন্দুর চিহ্ন। ইসলাম ধর্মে চাঁদ আর তারা চিহ্ন, যেটা ওদের পতাকায় দেখা যায়। সেই ভাবনার ঐতিহাসিক গভীরতা কত দূর, কোথায় এর শুরু ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। যোগ এবং তন্ত্রের সিদ্ধান্তে বিন্দু অব্যক্ত এবং তার থেকে শক্তির লহর বা স্পন্দন উঠছে। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় একে নাদ-বিন্দু বলা

হয়। শিব-শক্ত্যাত্মক পরম তত্ত্বের ভাবনায় তন্ত্রের সাধ্য-সাধন প্রসঙ্গের বিস্তার। যোগীরা দোলক সম প্রাণশক্তি সংহত ক'রে বিন্দু স্থান দখলের সাধনায় মশগুল। এর সঙ্গে মনে করা যেতে পারে ইসলাম ধর্মের কথা, যেখানে লেখা আছে—"Muhammad distinctly heard the sacred cry of 'Allah–hum' all around."

আমি পুরীর রাস্তায় বা উড়িষ্যায় অনেক ঘুরেছি। একদিন দেখি একদল উড়িষ্যার বৈষ্ণব কীর্তন করতে করতে যাচ্ছে। আমি ছুটে গেছি। বললাম, এই পতাকা তো জগন্নাথ মন্দিরে, তোমরাও ব্যবহার কর? বলল, হ্যাঁ, করি এবং এটাই আমাদের ধর্মের প্রতীক। বহু প্রাচীন বৈষ্ণব আশ্রম, আমাদের উড়িষ্যার। ওরা বলল, উড়িষ্যার প্রাচীন বৈষ্ণব মঠ বা আশ্রমে তারা এই পতাকাই ব্যবহার করে। আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম এবং আনন্দও পেলাম, এই যে নিয়ম আছে দূর থেকে এই পতাকাই প্রথমে দর্শন করে, এই পতাকাকেই প্রণাম করে—এখানে ধ্বজা বলেছে, এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ জিনিস। বিন্দু তো আছেই, মোটামুটি অষ্টমীর মত চাঁদ রাখা হয়। মুসলিমরা দ্বিতীয়া রাখে তো, মনে হয় প্রতিপদ সহজে দ্যাখা যায় না তাই দ্বিতীয়া। যদিও প্রতিপদ থেকেই পদক্ষেপ পূর্ণতার দিকে। যেমনটি শিবের মাথায় দ্যাখা যায়। যেমন একাদশী ধরা হয়। একাদশী ধরলে কি হয়? দু ভাগ চলে গেছে, এক ভাগ বাকি আছে। অষ্টমী ধরলে কি হয়? অর্ধেকের বেশী চলে এসেছে। সুতরাং কোন তিথি ধরব এটা ভাবনার ব্যাপার। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, হিন্দুরা চন্দ্র-বিন্দুর অবস্থান ধরে উত্তর-নিষ্ঠ করে, আর মুসলমানরা উত্তর-পশ্চিম নিষ্ঠ করে। যদি কোনদিন কোন নৈতিক সাধুতায় নয়, উপলব্ধিগত সততায় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির পতাকা ভাবতে পারি তবে এই পতাকার কথা মনে হবে।

নাদ-বিন্দুর প্রতীক, সেইজন্য জমিটা লাল করেছে। আর একটা কথা, এই ধরনের পতাকার কথা ভাবলে সারদা মা যেটা বলেছেন—'আমি দেখলাম লক্ষ শালগ্রাম শিলার উপর জগন্নাথ শিব প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন, আমি পদসেবা করছি।' এই কথাটার সঙ্গে পতাকা আরো সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়।

প্রতিভা

ঐ যে সুন্দরনাথজী প্রমুখ মহাত্মারা বসে আছেন বুঁদ হয়ে, তুমি কি আশা করবে তিনি এতরকম জানবেন? আর তিনি কি পরিচয় দেবেন—আমি এত কিছু জানি? আসল কথা, মানুষ যেভাবে উপলব্ধিমান জীবন দেখে ব্যাপারটা তা নয়। আধ্যাত্মিকতার একটা স্তরে পৌঁছলে পার্থিব প্রতিভাগুলো স্বতঃই স্ফুরিত হয়। গোঁসাইজীর ভাষায়- স্পর্শমাত্র হয়ে যায় এসব জিনিস। বিদ্যা-বুদ্ধির স্তর নিয়ে মানুষ চমকাচ্ছে, প্রতিভা বলছে। কোথাও ভূগোল, ইতিহাস বা দর্শন, এসব নিয়ে বলছে, আর লোকে অবাক। পতঞ্জলির বিভূতিপাদে দেখবেন বলছে—জলে সংযোগ করলে এই হবে, স্থলে সংযোগ করলে এই হবে, অন্তরীক্ষে সংযোগ করলে এই হবে, ইত্যাদি। কত রকমের বিভূতির কথা আছে, এইগুলো নিয়ে কি করব? আসলে, সাধনার এমন কোন অবস্থা আছে, যেখানে স্পর্শমাত্র বা ইচ্ছামাত্র এসব স্ফূরণ হয়। কোন সাধক, যার মন ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়েছে, সে কখনো জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে একাকার হওয়া, এসব করতে চাইবে না। অথবা ভূগোল, ইতিহাস পড়ে প্রতিভার পরিচয় দেবে না। এটা একেবারেই

অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর জিনিস। আসলে, সাধক যখন আধ্যাত্মিকতার ক্রমোচ্চ স্তরে এগিয়ে যায়, তখন জাগতিক এই ধরনের প্রতিভা বা বিজ্ঞানের জ্ঞান স্বতঃই স্ফূরণ হয়। তার জন্য সে কোন আয়াস করে না, তার জন্য সে কোন কৃতিত্ব দাবী করে না। তবে সেই সঙ্গে এটাও জানতে, মানতে, বুঝতে হবে—তারা তার দিকে কখনো দৃক্‌পাত করে না। যারা সাধনার পথে পরের পর স্তর পেরিয়ে যাচ্ছে, আরও সামনে যে স্তর আছে, তার লক্ষ্য সেটা। যে স্তরে আছে যে স্তরটা পার হচ্ছে, সেটা কিছু না, যে স্তরে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই স্তরটাই তার কাছে জীবন-মরণ। কাজেই তার সমস্ত মন-প্রাণ সেদিকেই নিবদ্ধ থাকে—আশেপাশে কি হচ্ছে না হচ্ছে, প্রতিভা বা কিছু এদিকে তাদের কিছুমাত্র লক্ষ্য থাকে না। তবে স্বামীজীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে স্বামীজী একটা স্তরে বেঁধে রেখেছেন নিজেকে। করুণায় লৌকিক স্তরে সর্বসাধারণকে নিয়ে তিনি এগিয়ে যেতে চাইছেন। কাজেই তাঁর আধ্যাত্মিকতার এই ধরনের জগতমুখী পরিচয়ে সাধারণ মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ স্তরে মানুষের মধ্যে কাজ করতে এসেছেন। বিরাট শক্তি, যা নিয়ত সমাধি-সাগরে বিলীন হতে চাইছে, তাকে দিয়ে ক্ষেতকে সঞ্জীবিত করতে হচ্ছে। এটাই প্রতিভার যথার্থ দিকনির্দেশ। এটা মনে রাখতে হবে। কেউ যদি অনেক প্রতিভার পরিচয় দেয়, বুঝতে হবে সে সাধক নয়। সাধকের মন এদিকেই থাকবে অথবা তিনি জীবন্মুক্ত অবতীর্ণ মহাপুরুষ। সাধক জীবনে শক্তির প্রকাশ অবাঞ্ছিত, পরমা সিদ্ধিতে তা সুষমায় সহাবস্থান করে এবং জগত মঙ্গলের কারণ হয়।

স্পিনোজা, পশ্চিমের দার্শনিক বলেছেন—মানুষের সর্বোচ্চ প্রতিভার বিকাশ একমাত্র ঈশ্বর উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই সম্ভব। এটা কিন্তু আরোহণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখছেন। তিনি খানিকটা পৌঁছেছেন। তবে এটাও স্পিনোজাকে মনে রাখতে হবে, আধ্যাত্মিক বিকাশ কখনোই জাগতিক প্রতিভা বিকাশের দিকে যায় না। অনেকে অকারণ জাগতিক প্রতিভার পরিচয় দেয়। এটা সাধকোচিত নয়। অনেক মহাপুরুষ আছেন, যাঁরা পৃথিবীর অনেক ভাষা বুঝতে পারেন, কথাবার্তা বলতে পারেন। তা বলে আমি অনেকগুলো ভাষা শিখে মহাপুরুষ হয়ে গেলাম। এরকম আহাম্মকি নিশ্চয় সাধক মানুষ করবে না। চেতনার যে স্তরে গিয়ে তাঁরা সর্বত্রগ এবং সর্বস্বরূপ হয়েছেন, তাঁদের কাছে এইগুলো খোলামকুচি। আধ্যাত্মিক পথিকের কাছে আরোহী ক্রমটাই শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ অবস্থা। অথচ এই ভুলটাই হচ্ছে। এইজন্য স্বামীজী হতে গিয়ে স্বামীজীর ধুলোও কেউ হতে পারছে না। আজকে সমাজের এই হালচাল।

মন

সাধক যত বেশী অন্তর্জীবনে প্রবেশ করতে পারবে, বাইরের প্রতিকূলতা তত সে অগ্রাহ্য, উপেক্ষা করতে পারবে। তারজন্য প্রতি মুহূর্তে অন্তর্জীবনে প্রবেশ করার চেষ্টা করতে হবে। কি ভাবে? একটা হচ্ছে সাধারণভাবে অন্তর্জীবনে প্রবেশ করার চেষ্টা, আর একটা হচ্ছে বিশেষ কোন সাধন পদ্ধতি অনুসরণ করা। সবরকম অবস্থায় তাতেই স্থিতি, সেই তার ইষ্ট। সেই ইষ্ট সাধন যত বেশী জেগে ওঠে ততই সম্ভব হয়। নিজের জগতে যতখানি সে প্রবেশ করতে পারবে, বাইরের প্রতিকূলতা ততখানি সহজ হয়ে

আসবে। এখন, সেটা তো একদিনে হবে না, চেষ্টা করতে হবে। আমি অমুকের কথা ভাবতে পারি, কিন্তু সে যখন আমার কাছে এসে গেল, তখন আর ভাবার দরকার নেই, সাক্ষাৎ তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। তেমনি সাধনের সঙ্গ করতে করতে যেমন সামনের মানুষটার মত সাক্ষাৎ হয়ে যায়। আমি তাকে চাইলেই সে আমাকে চায়। যে ছিল আড়ালে, সে এল সামনে। এটাকে এক ভাবে বলে অন্তর্জীবনে জেগে ওঠা। দপদপ করছে, নিশ্বাস পড়ছে, নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। সাধন আমি স্মরণ করছি, সাধনা আমাকে স্মরণ করছে। সেখানে সাধনা আর করুণার মেশামেশি।

আর একটা কথা—রশ্মিটা ধরে ধরে চললে আলোর উৎসের খবর পাব। কিন্তু স্যুইচ একটা আছে, নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রস্থল। মনের স্থান কোথায়? সাধনা করতে করতে মনটা তার উৎসে ফিরে যায়, যেখান থেকে সমস্ত মনের ক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ছে জগতময়। সাধনার মধ্যে দিয়ে মনটা স্বস্থানে পৌঁছে যায়। কিন্তু মনের একটা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র আছে। সেটাই আমাদের কাছে খুব বড় ব্যাপার। আমি যখন সেটা অন করতে পারব, জ্বলে উঠবে পরমার্থ চেতনায়। এটা একটা দিক। আর যখন বলছি রশ্মিটাকে ধরে ধরে আলোর উৎসের খবর পেয়ে যাব, অর্থাৎ রশ্মিটা যে চারিদিকে দেখছি, উৎসটা পাচ্ছি না, ধরতে পারছি না, আমি সাধনা করছি, দুটোই সত্য। একসঙ্গে পারস্পরিক সম্বন্ধ, সেটা জানতে হবে।

সামলে চলা

একটা ছোটবেলার গল্প। একবার বর্ষার সময় আমরা একটা সরু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, তার দুদিকে কচুরিপানার ফুল একেবারে ভরে আছে। যতদূরে দৃষ্টি যায় শুধু ফুল আর ফুল। হালকা বেগুনি রঙের ফুল। যাচ্ছি যাচ্ছি। যাব কি, দু পা যাই দাঁড়িয়ে থাকি, এত সুন্দর দৃশ্য পাগল করে দিচ্ছে। আর, বাতাস দিচ্ছে। এমন দৃশ্য, মনে হয় দাঁড়িয়েই থাকি। আমার সামনে, খানিকটা দূরে দূরে আর একটা বয়স্ক লোক যাচ্ছে ছাতা মাথায় দিয়ে। হঠাৎ দেখলাম লোকটা নেই, শুধু ছাতাটা দেখা যাচ্ছে কচুরিপানার ফুলের উপরে। কি হ'ল! দিনের বেলা তো! ভূত দেখছি! নিঃশব্দে ব্যাপারটা হয়ে গেল। দেখি কচুরিপানার মধ্যে দিয়ে মাথাটা এগিয়ে আসছে। আস্তে আস্তে বেচারা ছাতাটা তুলে উঠে এল। চেহারাটা কুমোরটুলির মাটির মূর্তি যেন। ছাতাটা গুটিয়ে নিয়ে, কোনরকমে কাছা-টাছা ঠিক করে হাঁটতে লাগল। আমাদের আর কোন কথা নেই, দৃশ্য-টিশ্য দ্যাখা নেই, একমনে-সাবধানে চলতে লাগলাম। পথটা পেরিয়ে আপন লোকের বাড়ির বারান্দায় বসে পুরো দৃশ্যটা মনে হ'ল, আর শুধু হাসছি আর হাসছি। যতবার মনে পড়ছে, ততবার হাসি পাচ্ছে। পরিচিত যারা, তারা বলল—কি হয়েছে বলবি তো, শুধু হাসছিস? বললাম, আগে হাসব তারপর বলব। ... কি কাণ্ড বল তো! আমি গল্প শুনিয়ে দিয়েছি বাপু, এখন যারা যাবে সামলে যাবে।

অকূলের ত্রাণকর্ত্রী

★ 'অকূলের ত্রাণকর্ত্রী' মানে কি? নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। নিরাশ্রয় মাং জগদীশ রক্ষ?

★★ সাধক যখন সাধনার পথ বেয়ে আসে, একটা অবলম্বন বা সাধন নিয়ে আসে।

সাধনার পরাবস্থা একটা আছে। সেখানে ভগবত-করুণা তাকে উদ্ধার করে। যখন সাধনার পথে আছে তখন সে কূলে আছে। একটা অকূল আছে। সেই অকূলে ভগবানের করুণা এসে তার হাত ধরে। 'অকূলের ত্রাণকর্ত্রী' রামপ্রসাদের গানে আছে। 'যখন ভাসব জলে অন্তকালে' মানে মরার সময় নয়। যখন ভগবত করুণা এসে হাত ধরে। তাই—

'যখন ভাসব জলে অন্তকালে
তনয় বলে করিস কোলে।'

শ্যামাচরণ লাহিড়ী বলেছেন—সর্বদা ক্রিয়া কর, আর ক্রিয়ার পরাবস্থায় যাও। ক্রিয়ার পরাবস্থা চৈতন্যের অবস্থা। উপনিষদে আছে—'অসত থেকে সতে নিয়ে চল, অন্ধকার থেকে আলোকে', খণ্ডিত জীবন থেকে অখণ্ড, অনন্ত জীবনের দিকে। এই পর্যন্ত চলা, তার পরে আর 'গময়' নেই। সেখানে—'হে স্বপ্রকাশ তুমি প্রকাশিত হও'। মনে পড়ে রবি-কবির গান—

'তীর যদি আর না যায় দেখা   তোমার আমি হব একা
দিশাহারা সেই অকূলে।'

নদী তার উৎস থেকে বেরিয়ে কত শত পথ বেয়ে বেয়ে চলে। এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে, কত ক্লান্তি, কত আঘাত সয়ে সয়ে সে এগিয়ে চলে। সাগরের কাছাকাছি এসে সাগরের বিস্তীর্ণ চড়ায় সে যেন হারিয়ে ফেলে নিজেকে। এতদিন পথ করে তবু এগোন গেছে, আর যেন এগোন যায় না, আর যেন নিজেকে ধরে রাখা যায় না। ব্যাপ্তির মধ্যে যেন হারিয়ে যাচ্ছি। এগোতে পারছি না, ধৈর্য রাখতে পারছি না—এই বলে সে মোহনার বিস্তীর্ণ বালুচরে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে। তারপর পূর্ণিমা রাত্রে যখন জোয়ার আসে, সাগরের বিস্তীর্ণ বালুচর কাঁপতে থাকে থরথর করে, নদীর বুকও যেন কাঁপে অজানা আশঙ্কায়—যদি আমি ব্যর্থ হই। তখন সাগর জোয়ার হয়ে তাকে আত্মসাৎ করে।

জীবন-মরণ

মরণ যদি না থাকত তাহলে জীবনটা বড় নোংরা হয়ে যেত। জীবন দুর্জয়, দুঃসাহসী, দুর্দমনীয় হয়েছে মরণ আছে বলেই। আবার জীবনের মহিমা, জীবনের সফলতার দাবী মরণকে অর্থবহ, সুসমন্বিত করেছে। মনে পড়ে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ছবি, আর একালের শ্রীঅরবিন্দের গভীর শান্তি সুখে চির নিদ্রার ছবি। একটা সামগ্রিক জিনিস—জীবন আর মরণ। আলো-আঁধারের মতো। তাওবাদিরা বলে সাদা আর কালো একই বৃত্তের অন্তর্গত অন্তহীন বৈচিত্র্যের প্রকাশ। মরণে যারা ভীত হয়েছে, তারা জীবনটাকে নষ্ট করছে, আর যারা জীবনটাকে শুধু আঁকড়ে থাকতে চাইছে, তারা মরণটাকে কুৎসিত করছে। যদি সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখি, তাহলে মরণ আছে বলেই জীবন এত দৃপ্ত, নিটোল হয়েছে। আবার জীবন আছে বলেই মরণে তার পূর্ণতার আহ্বান। জীবন-ব্রতের পূর্ণতা, তার নাম মরণ।

কুসুম মরতে ভয় পায় না, তাই চারিদিকে এত কুসুমের সমারোহ, তাই সে খুশী। কত নদী শুকিয়ে গেছে, কত পাহাড় ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু প্রাচীন পৃথিবীর সৃষ্টি শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ফুল অম্লান হয়ে বিরাজ করছে। যেখানে মানুষ গেছে, যেখানে মানুষ যায়নি, সেখানেও অজস্র ফুল ফুটে আছে। এটাই সত্য। শুধু মরণ সত্য

নয় বা শুধু জীবন সত্য নয়। জীবন-মরণের যে দ্বান্দ্বিকতা, সেটাই সত্য। শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে মরণের পারে। তিনি কালীয় নাগের মাথায় নৃত্য করেছিলেন। মৃত্যুর উপরে জীবনের জয়গান। জীবনের গৌরবই মরণকে এত সৌন্দর্য দেয়। এটা সামগ্রিক। জীবন আর মরণ আমি এক সঙ্গে দেখি। আলাদা করে মরণও মহত্তম সত্য নয়, জীবনও মহত্তম সত্য নয়।

আমাকে কাশীতে মণিকর্ণিকা শ্মশানের উপর দোতলা একটা বাড়ি দিতে চেয়েছিল একটি বৈদান্তিক আশ্রমের পক্ষ থেকে। বলল, হরবখত শ্মশানকা ধোঁয়া আওর ভস্ম। তার কিছুদিন পর আবার অরূপানন্দ বলছে—তুমি গেলে ঐ ঘরটার দলিল তোমাকে দেবে। আমি বললাম,—কক্ষনো নয়। সবসময় ঐ মড়ার ধোঁয়া আর গন্ধ আর মড়া কান্না! মানুষ তো পাগল হয়ে যাবে। আমি অঘোরি নাকি যে সবসময় শ্মশানে থাকতে হবে? যদি সব সময় শ্মশানের গন্ধ আর ধোঁয়ার মধ্যে থাকলে সাধু হয়ে যেত, তাহলে সব ডোমগুলো মহাপুরুষ হয়ে যেত। তা তো হয় না।

বিচার

আমি জীবনে বহু মানুষকে দেখেছি যারা প্রচণ্ডভাবে সদাচার নিয়ে ছিল। নিয়মিত গঙ্গাস্নান করছে, পুজো-পাঠ, ব্রত-অনুষ্ঠান করছে, কিন্তু কার্যকালে ভেসে গেল। আমার মনে প্রশ্ন এল—এত নিয়মনিষ্ঠার মধ্যে জীবন। জীবনটা ধরে রাখতে পারল না? খুব আশ্চর্য লাগত। তারপর দেখলাম যথার্থ ঈশ্বরমনস্ক জীবন না হলে পুজো-পাঠ, ব্রত-অনুষ্ঠান, এইগুলো একটা জীবনকে ধরে রাখতে পারে না। আর, যথার্থ ঈশ্বরমনস্ক জীবনের একটা বড় দিক হচ্ছে সর্বদা বিচার। ঠাকুর বলেছেন—"সর্বদা সদ্‌সদ বিচার কর"। জীবনে এটা খুব বড় কথা। গম্ভীরনাথজী বলছেন—"সদা বিচার করনা। বিচার সে যো কাম ছোটা মালুম হো, ও মৎ করনা"। এ তিনি হরদম বলতেন। যে কাজ করছ, নিজের কাছে আন্তরিক জিজ্ঞেস কর—ঠিক করছি, না ভুল করছি? মোহগ্রস্ত লোক মনে করে—আমি ঠিক করছি। মোহ-মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। সর্বদা বিচার-বুদ্ধির উপর জীবনটা ধরে রাখা, আর সাধন-ভজন, ঈশ্বরমনস্ক জীবনযাপন করা। তা না হলে শুধু নিয়ম-নিষ্ঠা জীবনকে কোথা দিয়ে অন্ধকারে নিয়ে যাবে।

সাময়িকভাবে নিয়ম-নিষ্ঠা একটা হতে পারে, কিন্তু জীবনের পরিস্থিতি সবসময় পাল্টাচ্ছে। জীবনের পরিবেশ-পরিস্থিতি আজ আছে কাল নেই। এই পরিস্থিতিতে তার নিয়ম-নিষ্ঠা কি করবে? এ তো সাময়িকীর বালির বাঁধ। গতানুগতিকতার ক্ষেত্রে নিয়ম-নিষ্ঠার কিছু দাম আছে। কিন্তু জীবন গতানুগতিক নয়। নিয়ম-নিষ্ঠা প্রত্যেকের জন্য, কিন্তু এটা একটা স্তর পর্যন্ত, এটা মনে রাখতে হবে। নাহলে সাধারণ মানুষ ভাবতে পারে—ঐ লোকটা অত নিষ্ঠাবান ছিল, কিন্তু তলিয়ে গেল।

সকাল-সন্ধ্যে ঐ নিয়মনিষ্ঠা, তার থেকে সদ্‌সদ বিচার জরুরী। সদ্‌সদ বিচার মানে কি? তার জন্য সেই সমস্ত মূল্য দিতে রাজি থাকবে। না হলে বিচারের মূল্য কি? সেইভাবে তো তাকে চলতে হবে। যদি শুধু শুধু বিচার করল তাহলে তো ভণ্ডামি হয়ে গেল। সেই পথে চলতে গিয়ে মানসিক, শারীরিক, আর্থিক, যে কোন মূল্য দিতে হবে। এই জীবনে নিষ্ঠার চেয়ে এ অনেক বেশী শক্তির দরকার আছে। যেটা ঠিক

মনে করব, সেই ভাবেই চলব। কত নিষ্ঠাবান লোক, কার্যকালে মশা হয়ে গেছে। আবার উল্টোটাও আছে। যাকে সামান্য মনে হয়, সে কার্যকালে সিংহের মত উঠে দাঁড়িয়েছে। তার ভেতরে সেই আন্তরপ্রক্রিয়াটা বজায় ছিল, পরিস্থিতিতে তা জাহির হয়ে গেল।

একটা পুজো বাড়িতে ৮ বছরের ফুটফুটে মেয়ে। কয়েকজন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কেউ ওর প্রিয় নতুন ব্যাগটা লুকিয়েছে। কেউ বলছে, আমাকে যদি চার আনা দাও তো দিতে পারি। কেউ বলছে, আমাকে যদি আট আনা দাও তো দিতে পারি। এরকম সবাই বলছে। মেয়েটা বলল—আমার জিনিস নিয়েছ, আমাকে ফেরত দেবে, চার আনা দাও, আট আনা দাও, এসব কি? তোমরা নিয়েছ, এটাই লজ্জা। যদি ফেরত দিতে হয় দাও, নাহলে দিও না। কেমন করে বলল মেয়েটা। সঙ্গে সঙ্গে যে নিয়েছে, সে কুঁকড়ে দিয়ে দিল। চাই না বলাটা ঐটুকু মেয়ের কাছে বিশাল ব্যাপার। কিরকম তেজী মেয়ে বল দিকিনি! ভেতরে সেই সততার শক্তি। দেখলাম দুর্গা মণ্ডপে দুর্গা, আর এখানে এই বাচ্চা দুর্গা!

গভীরতর ধ্যানের মধ্যেই সামর্থ আসে যথাযথ বিচারের। না হলে চোরের বিচার চোরের মত, সাধুর বিচার সাধুর মত। সেজন্য সারদা মা নিষ্ঠাবান সৎ জীবনে জপ-ধ্যানের প্রয়োজন প্রসঙ্গে বলছেন—'ওটি যেন নৌকোর হাল!' ঈশানানন্দের 'মাতৃসান্নিধ্যে'।

স্বাতন্ত্রবাদী

শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ি ঘরানার 'যোগানন্দ বাণী'-তে ওঁনার কোন শিষ্যের জন্য আক্ষেপ শুনছি— "ওর প্রতি আমি অসন্তুষ্ট হতে পারব না, কারণ বহু ভুল করলেও ওর মনটা ঈশ্বরের জন্য কাঁদে। অবশ্য আমাকে সুযোগ দিলে আমি ওর মনটাকে ঈশ্বরমুখী করবার চেষ্টা করব। যা হোক সময়ে সে সেখানে পৌঁছবে। ও হচ্ছে খুব দামী মোটরগাড়ী, কাদায় আটকে গেছে।"

যোগানন্দজীর মত গুরু পেয়েও তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী চলতে পারছে না। সাধনার পথে নির্ভর করতে পারছে না। অথচ যোগানন্দজীর দিব্য জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। এটা একটা বিশেষ আকর। সে স্বাতন্ত্রবাদী। যোগানন্দজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আছে, তাঁর প্রতি অভিভূত। পরমহংসজীর প্রতি তার ভালোবাসা অটুট, তার জন্য পরমহংসজীরও প্রাণ কাঁদছে। সেই আকৃষ্ট তো অন্য ভাবে নয়, মহাপুরুষ ভেবেই তো আকৃষ্ট। সেখানে যদি কোনরকমভাবে ফাঁক-ফোকর থাকত, পরমহংসজীর প্রাণ কাঁদত না। মানুষের চরিত্রে স্বাতন্ত্রও থাকে, শরণাগতিও থাকে। অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র তার সাধনার পথে অন্তরায় হয়ে গেছে।

★ এই স্বাতন্ত্রতা কি অহংকার নয়?

★★ অহংকার, দাম্ভিকতা এসব ছোট আধারে হয়। তবে, যখন পরমার্থের পথে বাধা সৃষ্টি করছে তখন অহংকারের পর্যায়ে চলে গেছে। তার আকরই ঠিক ভাবে নিতে পারছে না। কিন্তু শ্রদ্ধায় গভীরভাবে আকৃষ্ট, শ্রদ্ধা অটুট আছে। তার স্বাতন্ত্রবোধ এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে যে, তা তার সাধনার অন্তরায় হয়ে গেছে। এসব মানুষ সাধনার পথে বিভিন্ন ঘা খেয়ে খেয়ে এগোবে। আত্মশক্তির জোরে একদিন পৌঁছবে। আত্মশক্তির জোর আছে, কিন্তু আঘাত খেতে হবে। পরমহংসজীর কষ্ট সেই জন্য, নাহলে

পরমহংসজীর কষ্ট কিসের? বলছেন—আমাকে সুযোগ দিলে চেষ্টা করতাম। এ আকরের বৈশিষ্ট্য। একটা নজির, যা আধুনিক জীবনে ক্রমবর্ধমান।

সে তো ঈশ্বরমুখী। ঈশ্বরের জন্য প্রাণ কাঁদছে। যোগানন্দজী বলছেন—যেটুকু বাধা-বিপত্তি আছে তা কাটিয়ে দিতে পারতাম। তার রাস্তাটা যে এঁকেবেঁকে যাচ্ছে, শিষ্যের নির্ভরতায় গুরু যে অধিকার পায় সেই আঘাতে রাস্তাটা সোজা করে দিতে পারতেন। সংশয়ী লোকের দুর্গতি অসীম। সে কিন্তু কোনরকমেই পরমার্থ বিষয়ে সংশয়গ্রস্থ নয়। না হলে গভীর ভাবে আকৃষ্ট হতে পারত না। উন্নত আধার, দামী মোটরগাড়ী, স্বাতন্ত্রবাদী কি করছে? মনে কর কেউ পুরী যাবে, পথের লোককে জিজ্ঞেস করতে করতে যাচ্ছে। প্রতিটা বাঁকে সে জিজ্ঞেস করছে। তার তো পুব-পশ্চিমে যাবার ব্যাপার নেই। কিন্তু সে যদি অত্যন্ত স্বাতন্ত্রবাদী হয়, নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস মাত্রাধিক থাকে, তাহলে সে পুব-পশ্চিম ঘুরে ঘুরে যাবে। তার ব্যথা তার কাছে। আর যাঁর প্রতি যাচ্ছে, তার ব্যথা। যোগানন্দজীর ব্যথা যে, আমার ভক্ত আসছে ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে। পথের প্রান্তে যিনি, পথের সাথীও তিনি—যোগানন্দ। ঠিক কিনা? তাই তিনি ব্যথা পাচ্ছেন।—কি রহস্য এসব।

সৃষ্টির স্তর

পৃথিবীর যত স্থূল স্তর, তত সংঘাতময়। কুকুরের দশটা বাচ্চা হচ্ছে, নয়টা শিয়াল খেল, একটা থাকল, তার থেকেই আবার কত শত। এই পৃথিবীর প্রত্যেকটা স্তর—স্থূল থেকে আর উচ্চ, আরও আনন্দময় আরও মহত্তর অনুভবের স্তর আছে। প্রত্যেক স্তরের নিজস্ব সত্তা আছে, সেই মহত্তর সত্তাতেই সেই স্তর ধরা আছে। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আছে—

> 'আকাশে উঠেছে সুর, অজানার বাঁশী বাজে বুঝি।
> শুনিতে পায় না জন্তু, মানুষ চলেছে সুর খুঁজি।।'

কোন্ মানুষের কথা বলছেন? সেই উন্নত মানুষের কথাই এখানে বলেছেন। 'মানুষ চলেছে সুর খুঁজি'। সৃষ্টির যত স্থূল স্তর, তত বিরোধময়; যত উন্নত চেতনার স্তর, তত দিব্য আনন্দের স্তর সেখানে। দিব্য আনন্দ সেখানে ছড়িয়ে, গড়িয়ে পড়ছে, নিরন্তর এ চলছে। সেই স্তরের কথাই ভাবব আমরা। এটাই নিয়ম। জয়রামবাটিতে এরকম কুকুর, বিড়ালের কোথায় কি হয়েছে। মায়ের কথায়—অরূপানন্দ মাকে বলছেন—'ওরা এত কষ্ট পাচ্ছে কেন? মা বলছেন—'ওদের এসব জন্ম এই-ই।' আমি তো ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ করলাম, কিন্তু সারদা মা এত ছোট্ট করে, এমন ভাবে বলেছেন যে আমি পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেছি। সারদা মা তো সারদা মা।

সমাজে হিন্দু-মুসলমান বলে, কি সিয়া-সুন্নি বলে যারা মারামারি কাটা-কাটি করছে, সেটা একটা স্তর। এর ওপর এই সমাজেই এক বিমল আনন্দের জগত। সেখানে হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি কোন বিদ্বেষ কোন্দল নেই। কিন্তু তাদের কথা কেই বা শোনে। জীবনানন্দের ভাষায়—

> 'পৃথিবীর যত কাক ডাকিতেছে হিজলের বনে-
> আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।'

মুণ্ডক উপনিষদের 'দ্বা সুপর্ণা' মন্ত্রের মত যেদিন এই স্বার্থ-বিদ্বেষ দ্বন্দ্ব দীর্ণ মানুষ উন্নত জীবন বোধের দিকে তাকাবে, সেদিনেই এই দুঃখের স্তর থেকে মানুষ পরিত্রাণ পাবে।

জীবন

জীবনে যতখানি তুচ্ছতার নির্ভরতা আসছে, প্রতিমুহূর্তে ছোট ছোট মৃত্যু তাকে গ্রাস করছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'তোমারে আবরিয়া ধূলাতে ঢাকে হিয়া
মরণ আনে রাশি রাশি।'

আবার বলেছেন—'এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর'। এই মানুষ যখন উন্নত হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তেই নব জন্ম হচ্ছে। জন্ম হচ্ছে মানে, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুও তো হচ্ছে। ছোট্ট, ক্ষুদ্র আমিটা প্রতি মুহূর্তেই মরছে। মহত্তর আমি জন্মগ্রহণ করছে। সেই মৃত্যুতে দুঃখ নেই, আনন্দ আছে। মানুষ যত তুচ্ছ জিনিসে আসক্ত হয়ে আছে, মৃত্যু তত তাকে ঘিরে ধরছে। এই মৃত্যু, খণ্ড খণ্ড মৃত্যু।' আপনাকে ক্ষুদ্র খণ্ড করি', নিজেকে প্রতিমুহূর্তে টুকরো টুকরো করে জীবনটা এতটুকু করে দিচ্ছে। মৃত্যু এলে ভাবে, এই মৃত্যু যেন তার পরিত্রাণ। মানুষ, যে পরমার্থমুখী হয়ে থাকে, তারও মৃত্যু হচ্ছে। সেখানে অবিরত ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের মৃত্যু, মহত্তর ব্যক্তিত্বের জন্ম। কাজেই সেই মৃত্যুতে শান্তি, আনন্দ তৃপ্তি আছে। মানুষ যত ভোগমুখী হয়ে আছে, প্রতি মুহূর্তে তার মৃত্যু হচ্ছে। কি মৃত্যু হচ্ছে? তার শান্ত স্বরূপের মৃত্যু হচ্ছে, তার অশান্ত স্বরূপ, ক্ষুদ্র স্বরূপ তার জীবনে জেগে উঠছে। কাজেই মৃত্যুর দুটো রূপ, দুটো দিক আছে। একটাতে মানুষ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র হয়। আর একটাতে মানুষ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর, মহত্তর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শেষ পর্যন্ত যখন মরণ আসে, তখন আর মরার কিছু বাকি থাকে না, সাধারণ মানুষের। আর মহত্তর মানুষের যখন মরণ আসে, তখন হারানর কিছু থাকে না। জীবন সেখানে পূর্ণ। জীবন সেখানে সুপক্ক ফলের মতোই বৃন্তচ্যুত হয়। জীবনব্রত সমাপনের স্নিগ্ধ সন্তোষ সেখানের সাথী। উপনিষদের প্রার্থনা—মৃত্যুর থেকে আমাদের অমৃতে নিয়ে চল। আমাদের জীবনের মহত্তর অভীপ্সাই আমাদের গৌরবময় জীবন দান করে। জীবন সেখানেই 'শ্যাম সমান'। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা-জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতি থেকে যদি আমরা মহত্তর শিক্ষা লাভ করি যা আমাদের জীবনকে উত্তীর্ণ করে, তবে জীবনে বিচ্ছিন্নতার বেদনা বইতে হয় না, জীবন খণ্ডিত হয় না। জীবনের প্রবহমানতা মহত্তর—পরিপূর্ণ জীবনে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করে।

প্রাণ

★ প্রাণ সর্বব্যাপ্ত বলেছিলেন, জড়ের মধ্যেও প্রাণ আছে। কিন্তু জড়ের মধ্যে প্রাণ সংহত করতে পারেনি তাই প্রাণের বিকাশ সেখানে নেই তাহলে কিছু একটা আছে যার জন্য প্রাণ সংহত হয় আর উদ্‌গ্রীব হয়। সেই কিছু একটাই তো ঈশ্বরের ইচ্ছা?

★★ সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। এই সৃষ্টির মধ্যে একটা ক্রম-পরিণতি আছে, তাতেই প্রাণ অভিব্যক্ত হচ্ছে। এ শক্তিবাদের দিক থেকে। আমি যদি বলি বিদ্যুৎ সব জায়গায় আছে, তাকে মানুষ সংহত করে প্রকাশ করছে—তা হলে কি ভুল হয়?

★ আমি এটাই চিন্তা করেছিলাম, ইলেকট্রন সব জায়গায় আছে, তাকে সংহত করে বিদ্যুৎ। এটা ভেবেই প্রশ্নটা করেছিলাম।

★★ আমি তো অত বিজ্ঞান জানি না, তবে তোমাদের বোঝার মত করে উত্তর দিই। প্রাণ আছে বলেই সৃষ্টিটা আছে। প্রাণ সংহত হচ্ছে, অভিব্যক্ত হচ্ছে। যখন সংহত হচ্ছে, তখন অভিব্যক্ত হচ্ছে। সৃষ্টির ক্রম-পরিণতির ইতিহাসে প্রাণ একটা শক্তি। এই জগতের শক্তির মধ্যে একটা বিশেষ শক্তি। সেই স্রোত শক্তিমানের দিকে চলে যাচ্ছে।

★ প্রাণ তো চৈতন্যশক্তি, জড়শক্তি নয়।

★★ অস্ফুট চৈতন্য। যখন সে পৌঁছচ্ছে তখন সে স্ফুট চৈতন্য।

★ প্রাণ সংহত হওয়ার চেষ্টা করছে তার মধ্যে চৈতন্য আছে বলেই। এই যে মহাপ্রাণের দিকে যাচ্ছে, তার মধ্যে চৈতন্য না থাকলে যাচ্ছে কি করে? সেখানে স্ফুট-অস্ফুটের ব্যাপার কেন?

★★ একটা পাহাড়ে চলতে চলতে একটা জলের ধারা পেলে, বুঝতে পারলে কোথাও একটা ঝর্ণা আছে। যখন সেই ধারাটা উজিয়ে যাও, তখন দেখতে পাও একটা ঝর্ণা। ধারা দেখে অস্ফুট বুঝতে পারলে ঝর্ণা একটা আছে, না হলে পাহাড়ে জলটা এল কি ক'রে? যখন তার উজানের শেষ, তখন দেখতে পেলে পাথর ভেদ করে জল বেরিয়ে আসছে। এ রকম। একদিক দিয়ে বলা হ'ল। জানতে পারলে ঝর্ণা কি জিনিস, কেমন করে হয়। সেইরকম আর কি।

আখ খাচ্ছ, মিষ্টি লাগছে। আখ নিংড়ে রস বার করলে, আরও মিষ্টি। তারপর সেটা যখন গুড়, শেষে মিছরি হয়ে গেল, তখন জানতে পারলে এইজন্যই আখটা মিষ্টি। হয়েছে তো? হাজার রকমে বলা যায়। সবই এক একটা দিককে তুলে ধরা।

★ বলছে সব কিছুর মধ্যেই প্রাণ আছে, জড় বস্তুর মধ্যেও প্রাণের অস্তিত্ব আছে। তাহলে মানুষ যখন মারা যায়, বলে, প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। প্রাণ কি?

★★ মনে কর একটা নতুন সুর উঠছে গাছ থেকে। আমি বললাম, দেখ বীমা, নতুন কোন পাখী এসেছে, নাহলে এত সুন্দর গাইছে কে? তেমনি সমস্ত সুরে ভগবান আছেন। তাঁরই শক্তি খেলা করছে সমস্ত সুরে। ভগবান আছেন, তাঁরই শক্তির প্রবাহ অনুরণন তুলছে। সেটাই প্রাণশক্তি। যখন মারা যায়, তখন প্রাণশক্তিটা গুটিয়ে আসে। পাখীটা যখন মরে, তখন সুরটা তো থেমে যায়। তেমনি প্রত্যেক প্রাণীতে তিনি আছেন, তাঁকে নিয়েই প্রাণশক্তির খেলা চলে। মন, মনের নিচের স্তরে ইন্দ্রিয়, সব তাঁরই শক্তিতে খেলে। ঠাকুর বলেছেন হাঁড়িতে আলু, বেগুন, পটল সব ফুটছে তলায় আগুন আছে বলেই। তিনি আছেন বলেই সব আছে, চলছে। চলতি ভাষায় বলে প্রাণবায়ু। বস্তুত বায়ু নয়। মানুষের যে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের খেলা চলছে, সেও তাঁরই শক্তিতে। প্রাণশক্তি আছে বলেই। যখন তিনি বেরিয়ে যান, আমাদের এসব খেলাও শেষ হয়ে যায়। প্রাণবায়ু বলছে। যেহেতু তিনি চলে গেলে নিশ্বাস কে নেবে? তাঁর শক্তিতে হচ্ছে তো। আগুনটা টেনে নিলে জলটা ফোটে না। বলে, জল ফোটা বন্ধ হয়ে গেল। বস্তুত আগুনটা সরে গেছে। শক্তিমান আছেন, তাঁকে ঘিরে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে শক্তির খেলা চলছে।

মানুষের যত ভক্তি, ব্যকুলতা, ভাগবত-উন্মাদনা, সমস্তই এই প্রাণের উজানে। প্রাণের উজানে আমাদের শরীর, মন বিহ্বল, বিবশ হয়ে যায়। প্রাণ যখন প্রাণময়ের দিকে যাত্রা

করে, তখন গুটিয়ে আসে। সেই তো ছড়িয়ে আছে সব জায়গায়। সে যখন প্রাণময়ের দিকে ছুটে চলে, তখন আমাদের শরীর, মনের মধ্যে যে বিহ্বলতা, সেই আবেশ-আনন্দে ভক্ত সাধকরা তাঁকে আস্বাদন করে। প্রাণ তো স্থাবর-জঙ্গম সর্বব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মানুষে তার প্রকাশ বেশী। যেমন ঠাকুর বলেছেন—আগুন সব জায়গায় আছে, কোথাও তার প্রকাশ বেশী। তেমনি মানুষের মধ্যে তাঁর প্রকাশ বেশী স্ফুট হয়ে আছে। প্রাণ আছে, গোটা সৃষ্টি প্রাণেরই প্রকাশ। সর্বব্যাপ্ত এই প্রাণের ধারায় প্রকাশের তারতম্যেই সৃষ্টির বিকাশ। এই প্রাণ যেখান থেকে যতটুকু গুটিয়ে নেয়, তা ধ্বংস হয়। ব্যাপ্ত ভাবে যখন গুটিয়ে নেবেন, এই সৃষ্টি তখন বিলীন হবে কারণের ঠিকানায়। তবে বললাম, মানুষে তাঁর প্রকাশ বেশী। মানুষ তার আকুল তপস্যায় সেই প্রাণের স্রোত ধরে তার উজানে যেতে পারে। দেখতে পারে সেই স্রোতের উৎসে কি আছে। এটুকু মানুষের জীবনের পরম সার্থকতা। এ তো সাধকের জীবনে প্রত্যক্ষ জিনিস। এই নিয়েই তো ঘরে যাওয়া। ঘরে যে যায় সাধক, এই প্রাণ নিয়েই তো ঘরে যায়। আর কি নিয়ে যায়?

প্রণাম

☆ প্রণাম নিয়ে বলবেন একদিন? মুসলমানরাও তো আজানের সময় বারবার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণামের মত করে—আমরা যেমন করি, তেমন নত হওয়ার কথা অন্যান্য ধর্মেও দ্যাখা যায়। আমরা যে ভাবে প্রণাম করি, ভক্তি শ্রদ্ধা হিসাবেই করি। এর কি কোন আধ্যাত্মিক ফল আছে?

☆☆ মহাপুরুষরা এসব আচরণ বলে গিয়েছেন, শিখিয়ে দিয়েছেন। এই করতে করতে কোনদিন হয়ত সত্য বোধটা জাগবে, বুঝতে পারবে সে। কোন জায়গায় যদি বিরাট স্রোত চলে, তাহলে আশেপাশের হাওয়া বা জল, সেইগুলোও প্রভাবিত হয়ে যায়। যদি কোন জায়গায় তীব্র বিদ্যুৎ চলে আশপাশ সেইভাবে প্রভাবিত হয়ে যায়—যদি না সেই ভাবে আবরিত থাকে, অপরপক্ষে যদি পরিবহন ক্ষমতার আধিক্য থাকে, তবে তেমনি ভাবেই অধিকাধিক প্রভাবিত হয়ে যায়। তেমনি জগত জুড়ে একটা স্রোত চলছে, যারা মহাপুরুষ, তাঁদের মধ্যে সেই স্রোত তীব্র। প্রত্যেকটা মানুষের পারমার্থিক স্রোত পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রবাহিত হচ্ছে। প্রণামের এই যে প্রক্রিয়াগুলো, এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে মানসিক একাগ্রতার, শ্রদ্ধার ভূমিকা আছে, যা পারমার্থিক স্রোতধারায় আত্মিক জীবন সমৃদ্ধ বা মুক্ত করে। যেমন জপ করে। এটা তো যান্ত্রিক ভাবে জপ করছে না, মনটাকে যুক্ত করছে। বুদ্ধির সঙ্গে মনটাকে লাগাচ্ছে। মা বলছেন, মন ঠিক ক'রে একবার জপ করলে সহস্র জপের ফল হয়। প্রণামের সঙ্গে মনটাকে যদি একান্ত শ্রদ্ধায় যুক্ত করে, তাহলে সেই ব্যক্তি বা স্থানের অনির্বাণ দিব্য প্রবাহ সাধকের অন্তঃসলিলা পারমার্থিক স্রোতধারা উদ্দীপ্ত-সঞ্জীবিত করে। তার একক বোধ, ব্যক্তিগত বাধা যত কম হবে তত সেই স্রোতের মধ্যে নিজের স্রোতকে প্রভাবিত পরিপুষ্ট করতে পারবে।

জগত জুড়ে সেই স্রোত চলছে, কোন মহাপুরুষ বা সিদ্ধস্থানে সেই স্রোত আরও জাগ্রত, বেগবতী হয়েছে। এখানে কোন ধর্মের সীমানা নেই। যখন সে উন্মুখ হয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে, একাগ্রতার সঙ্গে নত হচ্ছে, সেই স্রোতটা তো নিচের দিক থেকে উপরের

দিকে চলছে অনবরত, সেই উজান স্রোতে নৌকা বাওয়া, যে ভাবে হিন্দুরা করে মুসলমানরা করে, সেই স্রোতটাতে যথাসম্ভব নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারবে। সবই শক্তি সম্পর্কিত কথা। সাধারণ মানুষ চেষ্টা করছে, কখনো না কখনো হবে। যে যতটা এই বিষয়ে জাগ্রত হয়েছে, সে তত সরাসরি বুঝতে পারবে যে আমার প্রণাম বা এবাদত কতখানি সফল হচ্ছে, প্রয়োজন বা সার্থকতা কি। এ কোন বিশ্বাসের ব্যাপার নয়, এ সাধকের সত্তার গভীরে অনুভবের ব্যাপার। সাধারণ মানুষ সেই বিশ্বাস ধরছে, ধর্মীয় সমাজ তাকে সেই শিক্ষাটা দেয়, অনুশীলন করে। আর, একজন সাধক সচেতন ভাবে এটা করে।

সুতরাং এটা স্বতঃসিদ্ধ,, প্রণামের সাধন যাকে-তাকে যখন-তখন করা যায় না। যথার্থ শ্রদ্ধাভাজনকে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে করতে হয়। ঠুনকো আচরণ নয়, গুরুত্ব এবং গভীরতার প্রশ্ন এখানে অবধারিত।

আমি প্রণাম বলতে পায়ে হাত দিয়ে বা মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করাকেই বলছি। বুকে হাত দিয়ে, মাথায় হাত দিয়ে, সেটা আলাদা। তবে কোনটাই নেহাৎ নিয়ম নয়। সেইরকম উন্নত হলে সেইরকম যোগাযোগ হবে যেখানে, সেখানে আনন্দধারা স্বতঃই সঞ্চারিত হয়। সেখানে প্রণামের প্রক্রিয়াটুকুরও দরকার হয় না। সেরকম মণি-কাঞ্চনের যোগ যদি হয়, উপস্থিতি মাত্রই জানতে পারে এই স্রোতের খেলা, আর পরমার্থের আঙিনায় জানা মানেই হওয়া। সেটা তো অনেক পরে। প্রথমে প্রণাম নিয়েই শুরু।

রবীন্দ্রনাথ

একটা মহান প্রসঙ্গ দেখুন—অবিভক্ত ভারতের কোন মহাপুরুষ বা কোন চিন্তানায়ককে পাচ্ছি, ভারত ভাগ হয়ে যাবার পরও শ্রদ্ধার আসনে আছেন? তিনি রবীন্দ্রনাথ। আমাদের জাতীয়তাবাদ পশ্চিমি ধারণায় গড়ে উঠছিল, কিছুদিন পর ভারতবর্ষের মনীষীরা বুঝতে পারলেন পশ্চিমের ধার করা জাতীয়তাবাদ ভারতবর্ষের মাটিতে অচল, তখন ধর্মকে নিয়ে আসা হ'ল। স্বামীজী থেকে গান্ধীজী পর্যন্ত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে দেওয়া হ'ল। 'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম'। কিন্তু সেটা হয়নি। মুসলিম কমিউনিটি গান্ধীজীকে কোনদিন মানতে পারেনি। চিন্তার বা আচরণের ক্ষেত্রে কিছু দীনতা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শ্রীঅরবিন্দের আর একটা জাতীয় ধর্ম বিস্তৃত হয়েছে। দেশ আমাদের মা, আমরা এক মায়ের সন্তান। ধর্মকে আর একটা বিস্তৃত ক্ষেত্রে তুলে ধরলেন। তবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে এমন বলা যাবে না।

দেখতে পাই ভারতবর্ষের মাটি, ভারতবর্ষের ঐতিহ্য আত্মসাৎ করে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সেই ব্যক্তিত্ব, যা জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ব্যক্তি-ধর্মের সার্বজনীন মেলবন্ধন সম্ভব করলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবিতকালেই সর্বভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে দু-দুটো বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতি, তাঁর দানের ঐতিহ্য এবং মৌলিকতার দিক দিয়ে, সর্ব ব্যাপ্ততার দিক দিয়ে সর্বভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি এবং জাতীয়তাবাদের সঠিক মেলবন্ধন করেছিল। যার প্রমাণ আজকে নতুন করে হ'ল। ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ২৪ বছর পরে একটা ইসলামি রাষ্ট্র রবীন্দ্রনাথের গানকে জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ করল। এক

গৌরবময় স্বীকৃতি। বাংলাদেশ সহ দেশ-বিদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অনুধাবন করা হয়। ধর্ম নিরপেক্ষ, সার্বজনীন আধ্যাত্মিকতাবাদের সঙ্গে মানব সভ্যতার যে মেলবন্ধন তিনি সৃষ্টি করেছেন, ইতিহাস তা স্বীকার করছে। যদি আগামী দিনে আন্তঃসংঘাত বিধ্বস্ত পশ্চিম পাকিস্থানও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, সেটাও রবীন্দ্রনাথের আদর্শের মর্যাদা, স্বকীয় অবদানের গৌরব। যখন 'জয়বাংলা'-র আন্দোলন হচ্ছে, আন্দোলনকে বিশ্লেষণ যাঁরা করেছেন তাঁরা বলেছেন এই একটা গান, যা বাংলার স্বজাত্যবোধকে উদ্দীপ্ত করেছে— 'আমার সোনার বাংলা'। প্রথম তো জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হোত। যখন আন্দোলন হচ্ছে, তখন ওদের লুকানো বেতার কেন্দ্র থেকে বাজানো হোত। অথচ কি মহৎ, কি উদার, সার্বজনীন আধ্যাত্মিকতা, মানুষের মর্যাদাবোধের কি গৌরব দিয়ে গিয়েছেন। পৃথিবীর মানুষকে একটা বলিষ্ঠ, অখণ্ড জীবনবোধ দিয়েছেন। আন্তার্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন দক্ষিণ আফ্রিকার মহান নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা ১৯৮০ সালে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে বাণী দিয়েছিলেন, তাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির' কবিতাটি আদর্শ হিসাবে তুলে ধরেছেন, যা রাষ্ট্র-সভায় সযতনে সংরক্ষিত। এত সব সত্ত্বেও আর এক নোবেলজয়ী মানবতাবাদী অমর্ত্য সেনের কথা মনে করা যেতে পারে, তিনি মনে করেন রবীন্দ্রনাথের মহান অবদানের অনেক কিছুই যথাযথভাবে বিশ্বের দরবারে এখনো উপস্থাপিত করা হয়নি।

প্রবণতা

একবার কোন গ্রামের একটা পুকুরের ধারে গাছতলায় বসে আছি। শান্ত দুপুর। কোথাও কোন শব্দ নেই। নিস্তব্ধ। পুকুরের মাছগুলো জলের উপরে ভুড়ভুড়ি কাটছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, আনন্দ করছে। খেলা করছে জলের উপরে। আর পাখীগুলো সেই গাছের উপরে বসে পালকগুলো ঠিক করছে। পরিপাটি করছে বসে বসে। আমিও চুপচাপ বসে আছি ঐ ভাবে। হঠাৎ দূরে কোথাও ফট্ ক'রে একটা আওয়াজ হ'ল। আওয়াজটা জোরেই হয়েছে। হঠাৎ দেখলাম, যে মাছগুলো জলের উপর দিকে খেলা করছিল ঘুরে ঘুরে, সেইগুলো একেবারে অতল-ততলে ডুব দিল, আর পাঁকের তলায় মুখ গুঁজল। স্বচ্ছ পরিষ্কার জল, তল অবধি দেখা যাচ্ছে। আর যে পাখীগুলো গাছের উপরে বসে নিশ্চিন্তে পালকগুলো ঠিক করছিল, সেইগুলো আকাশে উড়ে বেড়াতে লাগল।

আমি তখন চিন্তা করলাম, গোটা সৃষ্টির মধ্যেই একটা প্রবণতা আছে। এই মাছগুলো জলের তলায় অন্ধকারে পাঁকের মধ্যে মুখ গুঁজে চলে গেল-যেই একটা কিছু মনের ক্ষেত্রে ধাক্কা লাগল। আর পাখীগুলো গাছের উপরে ছিল, তাদেরও একই অবস্থা হ'ল, কিন্তু তারা আকাশে উড়তে লাগল। তাদের মনে ঠিক বিপরীত স্পর্শটা হ'ল। তারা আকাশকে ভালোবেসেছে, আকাশে নিরাপদ মনে করেছে। আকাশ তাদের আনন্দ দিচ্ছে, তবে না তারা আকাশে উড়তে লাগল। প্রয়োজনের তাগিদে হয়ত ডালে এসে বসে, কিন্তু মন তাদের আকাশে। আর মাছগুলো, তাদের মন অন্ধকারে।

আর, এই সৃষ্টির যে শ্রেষ্ঠ জীব, পরিণত জীব-মানুষ, তাদের মধ্যে তো আমরা

দেখিই দেখি। একই জগত-সংসারে কিছু মানুষ তাদের যুক্তিগুলো দেয় হীনতার স্বপক্ষে, তারা সেদিকেই যায়। আর এই জগত-সংসারে কিছু মানুষ মহত্তর দিকে যাত্রা শুরু করে। একই জগত-সংসারে তাদের যুক্তি, তাদের ভাবনা, তাদের রুচি কোথায় নিয়ে যায়। গোটা সৃষ্টির মধ্যেই স্ফুট, অস্ফুট এক আশ্চর্য প্রবণতা কাজ করছে।

শিবজ্ঞান-আত্মমোক্ষ

একটা শিব জ্ঞান, আর একটা জীব সেবা। দুটো পারস্পরিক সম্পর্কনিষ্ঠ। শিবজ্ঞান বা পবমার্থ নিষ্ঠা যার যতটুকু বাড়বে তার ততটুকু শিবজ্ঞানে জীব সেবা। আবার জীব-সেবার মধ্যে দিয়ে তথা চিত্তশুদ্ধির মধ্যে দিয়ে শিবজ্ঞানের বোধটা আনতে হবে। পরস্পর-নিষ্ঠ কথা। বলতে পারে শিব জ্ঞানে জীব সেবা। কিন্তু যাদের কর্ম নিয়ে থাকতে হবে, কর্মের অধিকারী যারা শুদ্ধতর তপস্যার অধিকারী যারা নয়, তাদের জন্য এই ব্যবস্থা স্বামীজী করেছেন। মিশনের অনেকেই এই কথা বলেছেন। উদ্বোধন ১০১ শ্রাবণ সংখ্যায় স্বামী বাসুদেবানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিকথায় রাজা মহারাজের কথা উদ্ধৃত করেছেন-"শ্রীঠাকুর বলেছেন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা', স্বামীজী বলেছেন 'Work is worship'। "আমি একটু অন্যরকম করে বলি-Work and worship কাজের সঙ্গে বিচার ও ধ্যান-ভজন না থাকলে ঠিক ঠিক Work is worship হয় না।" মানুষের নিরন্তর আন্তর উন্নতির মধ্যে দিয়ে শিবজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর, কর্ম-সংস্কার ক্ষয় করে পরমার্থের শুদ্ধ অধিকার লাভ করার জন্য বা অন্তর শুদ্ধির জন্য জীব-সেবার ব্যবস্থা। পাশাপাশি দুটো দিক। একটা সাধক যদি উভয় দিক বজায় রাখে, তার সফলতায় একদিন সে শুদ্ধ পরমার্থ পথের অধিকারী হবে। জগদীশ্বরানন্দের বইতে স্বামী তুরিয়ানন্দজী বলেছেন মিশনের ব্রহ্মচারীদের-"তোমাদের অদ্ভুত উদ্যম ও অধ্যবসায় দেখছি। এই উদ্যম যদি তোমরা ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য লাগাও, আমি বলছি তোমারা নিশ্চয় সিদ্ধ হবে। কিন্তু শুধু এই নিয়ে থাকলে একটি উপযোগী কর্মঠ কুলীতে গিয়ে দাঁড়াবে।"

সুতরাং, শিব জ্ঞানে জীব সেবা, এটা কর্মের একটা বিশেষ বিশ্লেষণ। যে মানুষের সেবা করছে, সেবা যখন বলছে তখন সবার অন্তরে যিনি আছেন, তাঁরই সেবা স্বাভাবিক তো? সেবা বলছি, আমি তো কর্ম বলছি না। সেবার অর্থ তাই। ঠাকুরের কথা, স্বামীজী কথাটা তুলে নিয়েছেন। এটা কর্মযোগের একটা সার্থক বিশ্লেষণ। খেয়াল রাখতে হবে যে, সমস্ত কর্মের মধ্যে দিয়ে আমার আন্তরচেতনা কি সমৃদ্ধ হচ্ছে?

স্বামীজীর এরকম আরও অনেক কথা আছে। বস্তুতপক্ষে একটাই কথা, তার বিশ্লেষণ হিসেবে পরের কথাটা বলে গিয়েছেন। যেমন, স্বামীজী বেলুড় মঠের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলছেন-'আত্মমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। বস্তুত আত্ম-মোক্ষের সঙ্গে জগদ্ধিতায়-এর একটা অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক আছে। যখন মানুষ মুক্ত হয়, তখন জগত-কল্যাণ স্বতঃই ছড়িয়ে পড়ে। স্বামী-শিষ্য সংবাদে স্বামীজীকে একবার শরৎ চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করেছে-কৃপা কাকে বলে? তিনি বলছেন-আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ যেখানে বিরাজ করেন, তার চারিদিকে একটা আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল বিরাজ করে, তাঁর সংস্পর্শে যারা আসে, তারা লাভবান হয়। -সুতরাং আত্মমোক্ষের সঙ্গে জগদ্ধিতায়-এর অবিনা সম্পর্ক। আবার ঠাকুর

বলছেন-'একজন আগুন জ্বাললে দশ জন পোহায়'। এই শীতার্ত জগতে পরমার্থের উষ্ণতা আসে, যারা উষ্ণতা চায় তারা পায়। কিন্তু স্বামীজী যখন কথাটা বললেন, আত্মজ্ঞানী পুরুষ বা মোক্ষপ্রাপ্ত পুরুষের আন্তর-সত্তার একটা বিশ্লেষণ করলেন। কেন? মোক্ষার্থী যদি যথাযথ হয়, তার মধ্যে প্রেমের প্রকাশ তো হয়ই। সেটা স্বামীজী মানুষকে ইঙ্গিত করেছিলেন। যে ভগবানকে আমরা চাই, তিনি সর্বব্যাপ্ত হয়ে বিরাজ করছেন সবার মধ্যে, আবার সর্বাতীত হয়ে। সেখানে কোন কুসংস্কার বা কূপমণ্ডুকতার ব্যাপার নেই। পরমার্থের আলো যে পেয়েছে, তার জীবনটাকে বিশ্লেষণ করছেন। যে আত্মমোক্ষ পেয়েছে, তার দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবশ্যই জগতের হিত হচ্ছে। এটা স্বামীজীর কথার একটা বিশ্লেষণ। উদ্বোধন ১০২ শ্রাবণ সংখ্যায় সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্বামী নির্বাণানন্দজী বলছেন-''আত্মমোক্ষার্থং বলতে স্বামীজী কি বলতে চেয়েছিলেন? -ঠাকুরের সন্তানদের কাছে এই ব্যাখ্যা শুনেছি যে, নিজের মুক্তির জন্য, ভগবান লাভের জন্য আগে চেষ্টা করতে হবে। সেই চেষ্টায় সিদ্ধ হতে পারলে তবেই ঠিক ঠিক জগতকল্যাণ করা সম্ভব। সুতরাং 'আত্মমোক্ষার্থং হলো সাধনা, আর জগদ্ধিতায় হ'ল সিদ্ধ অবস্থার কথা''। টাকা-পয়সা থাকলে কেউ গরীব দুঃখীকে দান করতে পারে, নাও করতে পারে, কিন্তু পরমার্থের ক্ষেত্রে তা নয়, স্বতঃই ছড়িয়ে পড়ে। 'গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে'। ছড়িয়ে যাবে। একটা কাঁচের আধারে আলো আছে, তাকে তো আড়াল করা যাবে না, স্বতঃস্ফূর্ত, উচ্ছসিত হচ্ছে। ঝরনা বয়ে যায়। সে একদিন নদী হয়। সে চারদিকের মানুষকে সেচ দেবে, ফসল দেবে বলে যায় না, সাগরে পড়বে বলেই যায়। কিন্তু সে স্বতঃই অগনিত মানুষের জমিকে উর্বর করে, ফসল দান করে। সেইরকম স্বতঃসিদ্ধ জিনিস। স্বামীজী এই কথাগুলো মানুষকে বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতেই বলেছেন।

কুণ্ডলিনী

☆ সাপকে কেন যোগের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়?

☆☆ সাপ কেন যোগের প্রতীক? বলা তো যেতেই পারে, কিন্তু নিজে না বুঝলে বোঝানো যাবে না কিছুই। যদি বলেন বুঝি না বুঝি আপনি বলুন, তাহলে বলে দিচ্ছি।

আমাদের যে আত্মা আছে, সেটা স্পন্দিত হচ্ছে। বলে—প্রাণ বেরিয়ে গেছে, আত্মা বেরিয়ে গেছে, মানুষ মরে গেছে। তার মানে কি? আত্মা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ শরীরটাকে সচল রেখেছে। এই সচল রাখা প্রাণশক্তির প্রভাব। প্রত্যেক শরীরে প্রাণ, শক্তি-প্রবাহ হিসাবে কাজ করছে। বলছে ইড়া, পিঙ্গলা কাজ করছে, আর মধ্যিখানে একটা রাস্তা আছে, সেটা বলে সুষুম্না। মহা সুখ-সুষুম্না। সাধক সাধনা করে, ভগবানেব কৃপায় মধ্যিখানের মুখ্য প্রাণশক্তির পথটা খুলে যায়। তখন যা ইড়া, পিঙ্গলার মধ্যে দিয়ে শরীর মনের মধ্যে ব্যাপ্ত ছিল, সেটা সংহত হয়ে আসে, সুষুম্নার মধ্যে দিয়ে অধিকাধিক প্রবাহিত হয়। যেটা ছড়িয়ে ছিল, সেটা সংহত হয়। বহু জন্মের সাধনার মধ্যে দিয়ে সাধকের মধ্য পথ খুলে যায়। এই মধ্য পথ যখন খোলে, তখন তা ক্রমাগত উপর দিকে ওঠার চেষ্টা করে। আর এই জগতের মায়িক শক্তি তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। মায়িক শক্তি বলতে সাধকের পূর্ব পূর্ব জন্মের জীব-সংস্কারকেই বলতে

হয়, আলাদা তো করা যাবে না। যা ব্যাপ্ত তা মায়িক শক্তি আর একক ভাবে সেই সাধকের মায়িক স্থিতিতে সে জন্ম-জন্মান্তর অভ্যস্ত, সেটা বাধা দেয়। কিন্তু সেই মহাশক্তি একবার জেগে গেলে সব সময় চেষ্টা করে উপর দিকে যেতে। এই ওঠার পথে স্তরে স্তরে বাধা দেয়। এই বাধা আবার বিভিন্ন। যেমন স্কুল, কলেজের বিভিন্ন স্তর আছে, তার বড় বড় বাধার কেন্দ্র হচ্ছে বার্ষিক পরীক্ষা, তেমনি বড় বড় বাধার গাঁট আছে। যত বাধা কাটিয়ে ওঠে, তত তার স্রোত গভীর, তত তীব্র হয়। তন্ত্রের ভাষায় বলা হচ্ছে মা—যে শক্তি প্রবাহ এগিয়ে যাচ্ছে, আর মাথায় আমাদের গুরুর স্থান বা শিবের স্থান। মা সেই কৈলাসে শিবের কাছে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হচ্ছেন। ঠাকুর বলেছেন—ঈশ্বরকে যে ঠিক ঠিক ডাকে, তার শরীরে মহাবায়ু গর গর করে মাথায় গিয়ে উঠবেই উঠবে। এই যে প্রাণশক্তি সংহত হয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করছে আর মায়িক যা কিছু তাকে বাধা দিচ্ছে, সাধক তীব্র তপস্যার মধ্যে দিয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। যতক্ষণ না যথেষ্ট উন্নত হচ্ছে, ধরতে গেলে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সাধকের দিব্যদৃষ্টি পুরোপুরি খোলে না। কিন্তু আংশিক ভাবে কখনো কখনো খোলে। সাধনার পথে যখন আংশিক ভাবে খোলে, তখন সেই প্রাণশক্তির জ্যোতির্ময় আভাস সে দেখতে পায়। দেখতে পাওয়া অবশ্যই সামর্থ সাপেক্ষে। জ্যোতির্ময় একটা কিছু উঠছে। এই যে উঠছে-বাধার জন্য ওঠা-নামা করতে করতে বা ডাইনে-বাঁয়ে দুলতে দুলতে উঠছে। জীবন্ত জিনিস তো। মনে করুন একটা ধূমকেতু। গতির জন্য তার আগেও আলোর ছটা আছে, পরেও আলোর রেখা বা রেশ আছে, মধ্যিখানে আলোর মূলগত গতিমান বিন্দু সংহত হয়েছে। যা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। যখন ওঠার চেষ্টা করছে-উঠছে তখন তার সংস্কারে বাধাও পাচ্ছে, সেইজন্য ওঠার পথে ডাইনে-বাঁয়ে দুলছে। এটা যোগের দৃষ্টিতে, যোগীর দৃষ্টিতে ঠিক যেন একটা সাপ।

দ্বিতীয় কথা। যোগী তখন তৃতীয় দৃষ্টির পূর্ণ অধিকার পায়নি, সে ক্ষণিকের জন্য কিছু না কিছু দেখতে পায়। কিন্তু সে তো এই চোখে অভ্যস্ত, মনে করে এই চোখেই দেখছে। বস্তুতপক্ষে পঞ্চভৌতিক জগতের বাইরে কিছু পঞ্চভৌতিক দৃষ্টিতে দেখা যায় না। এই দৃষ্টি অশুদ্ধ, এই জগতও বি-পরিণামভূত। পঞ্চ তত্ত্বের বিকার। প্রপঞ্চ, বিনষ্টিশীল জগত, আর এই চোখও। এই সৃষ্টির অতীত যে দিব্যদর্শন, সেই দর্শন সে দিব্যদৃষ্টিতেই দেখছে। কিন্তু দিব্যদৃষ্টির সংস্কার তখনো প্রবল নয়, সে মনে করছে এই দৃষ্টিতেই দেখছে। তখন অনেক সময় অনেক কিছু সাধক দেখে ফেলে, কিন্তু যেহেতু তার জাগতিক সংস্কার প্রবল, সে জাগতিক একটা ভাবনা নিয়ে বসে। আগে যেমন বললাম চোখের কথা। যখন একটা যোগী দিব্যদৃষ্টিতে কিছু দেখে, প্রথম প্রথম দেখছে—হয়ত একটা হলুদ জ্যোতি দেখল, সে তো মনে করতেই পারে একটা হলুদ সূর্যমুখী দেখলাম। কারণ সে দিব্য-সংস্কারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত নয়, সেই সংস্কারের মধ্যে লৌকিক সংস্কারই প্রবল। সেইজন্য লৌকিক কিছু ভাবনা করে। সেইজন্য অনেকে সাপও দেখে। এটাকে সাপ হিসাবে দেখে, কেননা যোগীর লৌকিক সংস্কার প্রবল তো, তাই সাপ হিসাবে দেখে। তাকে সাপ বলতে তো কোন অসুবিধে নেই। আবার আমি যেভাবে বললাম, একটা আলোর কিছু উঠে যাচ্ছে উপর দিকে, মধ্যিখানে অপেক্ষাকৃত সংহত হয়ে আছে, নিচের দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা আস্তে আস্তে উঠতে চাইছে, যেখানে বাধা পাচ্ছে, সেখানে

কাঁপছে। এটা সাপের মত। বস্তুতপক্ষে এটা আত্মার শক্তি মুখ্য প্রাণশক্তি, যা নিরন্তর উপর দিকে ওঠার চেষ্টা করছে, অথবা সাধক তাকে ওঠানোর চেষ্টা করছে। সব কথাগুলোই সংস্কার সাপেক্ষে। সেরকম উন্নত ঈশ্বরকোটি, তাদের ব্যাপারটা অনেক সহজ। সাধারণ সাধকদের অনেক তপস্যা, অনেক খড়কুটো পোড়াতে হয়। আবার জিনিসটা ওঠা-নামাও করছে। বরং না জাগা ভালো, জাগলে এমন সমস্ত বাধা তাকে সামলাতে হয়, তাকে সমর্থ হতে হয়, নাহলে খুবই খারাপ অবস্থা। এমন হয়ত কিছু করে ফেলল, যাতে জীবনটা আরও গড়িয়ে গেল। কাজেই জাগা, না জাগা মায়ের ইচ্ছে, সমর্পণই সবচেয়ে বড় কথা।

☆ ওঠা-নামা করছে জীবন্ত বলে?

☆☆ জীবন্ত। বাধা পাচ্ছে, বাধা পাচ্ছে, আবার উঠছে। পুরো ব্যাপারটাই অত্যন্ত বিরল। অত্যন্ত বিরল বলতে ধারণাই হবে না। শত সাধুসন্তদের মধ্যেও যদি একজনের এই অভিজ্ঞতা হয়, সেটাও বিরাট ভাগ্য। আবার যার হয়েছে তার কাছে সহজ। এই সম্পর্কিত দর্শনাদি তো হয়। সবচেয়ে বড় কথা, জীবনটাই পাল্টে যায়। তার অস্তিত্বের গভীরে রূপান্তরের ভাবনা-অনুভব তাকে প্লাবিত করে।

দর্শন কি? যা দিব্য আর লৌকিকের মেশামেশি স্তর। সেই মহা ভাগ্যবান সাধক দিব্য সংস্কারেই দর্শন করছে। কিন্তু লৌকিক সংস্কারের মোড়কে তা দেখছে। কিন্তু যথার্থ দর্শনাদি যা মানুষের জীবনকে সুন্দর করে তোলে, সমর্থ করে তোলে, সে হচ্ছে অলৌকিক আর লৌকিকের মেশানো। কুণ্ডলিনী জাগরণের সময় বিচিত্র অনুভব সাধকের জীবনে আসে সাধকের সাধনা আর গুরুকৃপা মিশে। মনে কর একটা দর্শন হ'ল, দেখছে যেন শিবজী বসে আছেন পদ্মাসনে, সাদা জ্যোতির্ময় তনু, কখনো দেখছে সেটাই তার নিজের গুরুরূপ কখনো দেখছে শিব, তাকে বেষ্টন করে আছে জ্যোতির সাপ—মাথা ঢুলু ঢুলু, মাথা নড়ছে, শিবজী বা গুরুদেব তাকে আদর করছে—ওঠো, ওঠো না। এই কুণ্ডলিনী। যে শিব, স্বয়ম্ভু লিঙ্গ, তাকে দর্শন করছি, আধার শক্তি বা কুণ্ডলিনী শক্তি, তাকে আড়াই প্যাঁচ বলেছে। এই আড়াই প্যাঁচই দেখছে। মাথা ঢুলু ঢুলু, আধো ঘুম, আধো জাগরণ। সাধকের অতন্দ্র সাধনায় আর থাকতে পারছেন না। আর শিবজী তাকে বলছেন—ওঠো, ওঠো। এটা কি হল? উন্মুখ অবস্থা। সেই মুহূর্তে কুণ্ডলিনী জাগরণের তার শুরু। তার শরীর, মন, জীবনে সেই অবস্থা ছড়িয়ে গেছে, সেটাই একটা ছবি হয়ে এসেছে। এইজন্য বললাম, এ রূপ আর অরূপের মেশামেশি, তাকে সাপ বললেও কোন অসুবিধা নেই, সাপ না বললেও কোন অসুবিধা নেই। সে এক জ্যোতির রেখা, যা বারবার এগোতে চাইছে, সংহত হচ্ছে। এই ধরনের ব্যাপার। এর মধ্যেও তো অনেক খুঁটিনাটি আছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—সর্পবৎ, ভেকবৎ, কপিবৎ। যদি কারো হয়ে থাকে, সেই হওয়ার মুহূর্তেই তার গুরু মোটামুটি বুঝতে পেরে যান। যেমন একটা মানুষের ঠিকুজি কোষ্ঠি আছে, তেমনি কোন বিরল সাধকের জীবনে হচ্ছে, সেই মুহূর্তেই তার গুরুর কাছে তার ঠিকুজি-কোষ্ঠি পরিষ্কার-কতটা হতে পারে, না পারে, কোথায় সে পড়ে যাবে, কতটুকু এগিয়ে যাবে, কতখানি তার শক্তি। ঠাকুর বলতেন না, একজন দশজনকে হারিয়ে দেয়। তেমনি কোন শিষ্য, গুরু, পরম্পরায় অশেষ আনন্দ আর আশীর্বাদের কারণ হয়।

আশীর্বাদ

'জীবন সাধনার পথে' বইটার একটা ব্যক্তিগত ইতিহাস আছে। আমি তখন ১২ ক্লাসে পড়তাম। আমাার ক্লাসের এক বন্ধু আমাকে বলল, 'দেখ, কাছেই আমার জ্যাঠার বাড়ি'। সেখানে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাধুরা এসেছেন। আমার জ্যাঠা তাঁদের একটা বাড়ি দিয়েছেন, সেখানে তাঁরা কয়েক মাস থাকবেন, নিজেরা ভজন-সাধন-কীর্তন করবেন, আর সেবা কাজের জন্য ভিক্ষা সংগ্রহ করবেন। কলেজের ছেলেরাও যাচ্ছে সেখানে। দেখবি তাদের দলের যে প্রধান সাধু সে খুব ভালো, আর জ্ঞানী-গুণী মানুষ। অনেকে যায় ওঁনার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। তুই যাবি?' বললাম, চল। তার সঙ্গে আমি গেলাম। দেখলাম, যে সব কলেজের ছেলেরা বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চাইছে, আর সেই বৃদ্ধ মহারাজ তাদের সঙ্গে অনর্গল কথা বলছেন আর প্রত্যেকেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। যে-কোন বিষয়ের উপরেই বলছেন। সবাই বলল—হবে না! উনি প্রণবানন্দজীর অত্যন্ত স্নেহের, ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য প্রণবানন্দজীর খুব ঘনিষ্ঠ শিষ্য, খুব উন্নত মহাপুরুষ, ইত্যাদি। সবার সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেলে সবাই চলে গেল। আমিও উঠে যাচ্ছি—আমাকে বললেন, বাবা, তুমি বসো। ওনার পাশে বসতে বললেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার বললাম, আসি? তিনি বললেন,—'আসবা? আস'। তারপর থেকে যেদিনই যেতাম সবার সঙ্গে কথা বলতেন। কিন্তু আমার সঙ্গে কোন কথা বলতেন না, শুধু বলতেন—'একটু বসো'। আবার আসি বললে বলতেন—'আর একটু বসো'। কথাবার্তা নেই, ঐ বয়সে চুপচাপ বসে থাকা ওঁনার পাশে। চলে আসব বললে যেন খুব অনিচ্ছা সহকারে বলেন—'আসবা?' ভাবলাম, আর যাব না, শুধু বসিয়ে রাখেন। ওমা! দুদিন যেতে না যেতেই ভীষণ ইচ্ছে হ'ল আবার যাই। আবার সেরকম।

যে ছেলেটা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল জ্যাঠার বাড়িতে, সে ভাবল, আমি তো নিয়ে গেলাম, ও যদি এই দলে ভিড়ে যায় তাহলে জানাজানি হয়ে যাবে আর আমাকে অনেকে খুব গালমন্দ করবে। আমার বাবা-মাকে বলবে, তোমার ছেলে এসব করেছে, ফুসলেছে। এসব চিন্তা করে ভয় পেয়ে আমার মাকে বলল, 'দেখুন, সবাই যায় বলে আমি বলেছি। এখন এ নিয়মিত যায়, থাকে। আমি কিন্তু আর কিছু জানি না'। আমি যেই ফিরেছি, আমার উপর যাচ্ছেতাই করল—ক্লাস কর না, শুধু ঐখানে গিয়ে বসে থাকা! জানিস না আশ্রমের সাধুরা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে নিয়ে যায় আর ভিক্ষে করায়। আর ওখানে যাওয়া যাবে না। একদম না। তর্জন-গর্জন, কাকুতি-মিনতি, সবরকমই করল। বাবাকে বলল, তুমি কিছু বল। বাবা বললেন, আমি আর কি বলব? —মনটা খারাপ হয়ে গেল। কয়েকদিন যাইনি। তারপর শুনলাম চলে যাবেন। চলে যাবেন শুনে খুব কষ্ট হ'ল। মা বলেছিল—ওরা খেতে দেয় না, শাক ভাত-ডাল-ভাত খাইয়ে রেখে দেয়, ভিক্ষে চাওয়ায়। কথাটা খুব খারাপ লেগেছে। আমি গিয়ে একটা সাধুকে জিজ্ঞেস করলাম—আজ্ঞে, আপনারা কি খেয়ে থাকেন? বলল, আমরা ডাল-ভাত খেয়ে থাকি। আপনারা আর কিছু খান না? বলল, কেন? ডাল-ভাতই তো যথেষ্ট। মাথাটা ঘুরে গেল ঝাঁ করে। আবার জিজ্ঞেস করলাম—কখনও আর কিছু খান না? বলল, কখনও কোন সদাশয় ব্যক্তি পরমান্নের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। এসব কথা হল। তারপর দেখি

উনি পাথরের মূর্তির মত বসে আছেন, চুপচাপ। আস্তে আস্তে ঢুকলাম সেই ঘরে। তাকাচ্ছেন কিনা বুঝতে পারছি না। চোখ, মুখ থমথম করছে। ভাবলাম, এত দিনের এত পিরিতি, দুদিন যাইনি আর ভুলে গেলেন। খানিকক্ষণ পরে আমার দিকে তাকালেন। ঐ যে তাকালেন, একেবারে পাথরের মূর্তির মত, দৃষ্টিতে কোন পলক নেই, একেবারে স্থির। আমি দাঁড়িয়ে আছি, উনিও চুপচাপ তাকিয়ে আছেন। খানিকক্ষণ পরে 'জীবন সাধনার পথে' আর 'ব্রহ্মচর্য্য', এই বই দুটি দিলেন। বললেন, 'এই দুটি নিয়া যাও পড়বা। আস।' এই কথা বলে মাথাটা আবার নীচু করলেন। ঠিক ওঁনার সামনে থেকে পিছু হটতে পারছি না, এমন অবস্থা। মনটা কিরকম হয়ে গেল। খানিকটা পাশে গিয়ে তারপর পিছু হটলাম। তারপর শুনলাম চলে গেছেন।

তারপর বইগুলো পড়তাম, চেষ্টা করতাম। দেখলাম এই ভাবে চলা কিছুতেই যেন সম্ভব নয়, অসম্ভব। বইগুলো বাক্সে তুলে রাখলাম। রেলের বিরাট বাংলো তো, চারিদিকে অনেকটা জায়গা। আমার পছন্দসই জায়গা ছিল, যেখানে আঙুর গাছ ছিল, থোকা থোকা আঙুর হয়ে থাকত। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতাম। কিছুতেই যেন সম্ভব নয়, অসম্ভব। মনে মনে চিন্তা করতাম, আর ওঁনার মুখটা ভেসে উঠত। সাক্ষাৎ ভাবে দেখছি তা নয়, মনের মধ্যে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি অনেক কাল এরকম হয়েছে।

তারপর আরও কত বছর চলে গেছে। তখন দক্ষিণেশ্বরে মহামণ্ডলে থাকতাম। কখনো বালীগঞ্জে ওঁনাদের আশ্রমে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকতাম—যেখানে প্রণবানন্দজীর আসন, পাদুকা, ইত্যাদি আছে। কাউকে সেখানে বসতে দেয় না। কিন্তু আমাকে কোনদিন কেউ বারণ করেনি। অনেক্ষণ বসে থাকতাম। আর দুপুরে যখন খিদে পেত, একটা খিচুড়ির ব্যবস্থা ছিল, সেটা খেতাম সবার সঙ্গে বসে। যখন ঐ খিচুড়িটা খেতাম, মনে হোত কেউ যেন আমার পাশে বসে বলছেন—খাও। সেই খিচুড়ি খাওয়াটা আমার কাছে খুব একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। খবর নিতাম আত্মানন্দজীর। শুনতাম আজ মেদিনীপুরে গিয়েছেন, আজ ঘাটালে গিয়েছেন। তারপর কত বছর তীর্থে তীর্থে ঘুরেছি, মহামণ্ডলে থেকেছি। আর যাওয়া হয়না। অনেক বছর কেটে গেছে। তারপর একবার খুব একটা টান পেলাম। আর একবার যাই, দেখি দেখা পাই কিনা, বেঁচে আছেন কিনা। প্রণবানন্দজীর ঘরে গেলাম, প্রণাম করলাম। তারপরে ওখানকার সাধুদের জিজ্ঞেস করলে বললেন— তেতলায় চলে যান, সেখানে শুধু প্রণবানন্দজীর ঘনিষ্ঠ সাধুরাই থাকেন, বয়স্ক সাধুরাই থাকেন। বললাম, উনি আছেন? বলল, হ্যাঁ, আছেন। তেতলায় গিয়ে দেখি এক একজন বৃদ্ধ সাধু বোম ভোলা হয়ে বসে আছেন। এত ভালো লাগছে না! বিকেল হয়ে গেছে। ওঁনারা চুপচাপ বসে আছেন। কিন্তু কোথায় সেই মুখটা? সেই মুখটা তো দেখছি না। এমন ভাবে ওঁনারা বসে আছেন যে, কাউকে জিজ্ঞাসাও করতে পারছি না। একদম মস্ত্ হয়ে বসে আছেন সব। মনে পড়ে গেল, আচার্য প্রণবানন্দজীর বাণী—'সমাহিত মনই নির্জন গিরিগুহা'। একটা ঘরে ঢুকে দেখি উনি বসে আছেন। বিছানায় বসে ছিলেন। নিচে মাথা ঠুকে খুব প্রণাম করলাম। প্রাণটা ভরে যাচ্ছে। এই মানুষটা আমার কিশোর বয়সে, আলো হয়ে আমার জীবনে এসেছিল। খানিকক্ষণ পরে বললেন—'কে বাবা! কে বাবা! উঠ উঠ।' উঠে পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললাম—যখন আমি ১২ ক্লাসে পড়ি, তখন আমাকে ভালো বেসেছিলেন, করুণা করেছিলেন। আমাকে দুটো বই

দিয়েছিলেন। আপনার আশীর্বাদ, আপনার ভরসা না পেলে এই ভাবে চলতে পারতাম না। এরকম অনেক কথা, যা ইচ্ছে তাই বলছি। তিনি চুপ করে শুনলেন। তারপর যে-কথাটা বললেন, শুনে স্তম্ভিত, মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বললেন—'বাবা, তুমি অল্প বয়সের কথা বললে। সেই অল্প বয়সেই আমি আচার্য প্রণবানন্দজীর কাছে এসেছিলাম। তারপর ঐ একটা মুখকে ভালোবেসে দেশের সমস্ত মানুষকে ভালোবেসেছি, বিশেষত অল্পবয়সী ছেলেদের ভালোবেসেছি। আজ আমার সেইদিন এসেছে, যেদিন আবার সব মুখ আমার সেই প্রিয় আচার্যের মুখের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে!' —ঠিক তখনই সেই অস্ত সূর্যের গেরুয়া আলোটা ওঁনার মুখে পড়েছে। আবার আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে আলোটা। বললেন—'আবার সব মুখ সেই এক মুখে মিলিয়ে যাচ্ছে বাবা। যেখানে রূপ আর অরূপের মেশামেশি।' আস্তে আস্তে ঘরটা হালকা অন্ধকারে ছেয়ে গেল। সার্থক জীবন একজন মহাপুরুষের। বারবার প্রণাম করছি। তার কিছুদিন পরে শুনলাম উনি জ্যোতির্ময় শ্রীগুরু বিগ্রহে লীন হয়েছেন।

হিমালয়

অগণিত সাধকের পুঞ্জিভূত তপস্যার মূর্তি হিমালয়। যুগ যুগ ধরে তপস্যার স্থির মূর্তি হয়ে আছে হিমালয়। সবকিছুর একটা মূর্তি হয় তো। কামের মূর্তি, লোভের মূর্তি, আবার দুর্গা মূর্তি, শিবের মূর্তি—সেরকম তপস্যার যদি কোন মূর্তি গড়া হয়, সেই মূর্তি ভগবানই গড়েছেন—তার নাম হিমালয়। এটাই আমার মনে হয়। তপোমূর্তি হিমালয়।

কারণ স্তর

মহাপুরুষরা যখন আসেন, এই জগতের সূক্ষ্মতম স্তরকে কাজে লাগান। কেমন করে? যেমন প্লেন কাজে লাগাচ্ছে আকাশে বাতাসটাকে। যার কারণের মধ্যে দুটো থাকে,—একটা, যখন তিনি আসছেন তার মধ্যে নিজস্ব একটা তরঙ্গ থাকে। তাকে নিজের দিক থেকে বলা হয় আনন্দ তরঙ্গ, বাইরের দিক থেকে বলা যায় কল্যাণ তরঙ্গ।

একটা টর্চ দিনের বেলায় জ্বাল, অন্ধকারে জ্বাল—আলোটা বা আলোর প্রকাশটা সম্পর্কিত। মনে কর, অন্ধকারের মধ্যে একটা আলো জ্বাললে, একটা মাকড়সার জাল, কিন্তু তুমি দেখলে একটা আলোর জাল, তার মধ্যে একটা আলোর পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠিক কারণ স্তরটা এই। যখন কারণ শরীর দেখছ, তখন কারণ সত্তা, তখন কারণ জগতের কারণ স্তরটা প্রকাশ হচ্ছে। যখন তুমি সূক্ষ্ম স্তর দেখছ, তখন সূক্ষ্ম জগতের সূক্ষ্ম শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। হয়ত পারলৌকিক কিছু দেখলে। একটা লোক সদ্য মরল, তার হাতে লাঠি, চোখে চশমা থাকত—দেখতে পাবে সেও আছে। সে কি সেইগুলো নিয়ে ঘুরছে? সূক্ষ্ম জগতে সে সেই মানস জগত নিয়ে ঘুরছে।

যখন তুমি কারণ শরীর দেখছ, তখন কারণ জগতের কারণ স্তরেই কারণ শরীর দেখছ। তখন তুমিও কারণ শরীর অভিমানী। তখন তোমার কাছে এই স্থূল জগত নেই, সূক্ষ্ম জগত নেই, তখন তোমার কাছে কারণ জগত প্রকাশ পাচ্ছে। তুমি হয়ত দেখলে কারণ শরীরটা নেমে এসেছে, হয়ত কারোকে কোনরকম ভাবে ঊর্ধ্বতন চেতনার

সঞ্চার করলে—বলা-কওয়ার কিছু নেই তো। তার কারণ, কারণ স্তরে অতীন্দ্রিয় চেতনায় সমস্ত কিছু নিষ্পাদিত হয়। 'যতো বাচো নির্বতন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'-তৈত্তিরীয়পনিষৎ। দেশ-কাল অবাধিত শক্তি যেন করুণায় সীমিত হয়। টলটল করে। যেমন পারা, হাতে টলটল করে, সেইরকম হাল্কা জ্যোতির জগতে জ্যোতি বিন্দু বা শিখাসম কারণ শরীরধারী মহাপুরুষরা। কারণ শরীরের সঙ্গে কারণ সত্তার সংশ্লিষ্ট জিনিসটা তুমি দেখছ। যখন কারণ শরীর দেখছ, তখন তোমার কারণ সত্তা উদ্দীপ্ত হচ্ছে বলেই দেখছ। আরও যদি নিজের দিক দেখতে পার, তাহলে তোমার কারণ শরীর সংশ্লিষ্ট জিনিসগুলো দেখ। যেমন বলা যায়, কারণ স্তরে যতখানি জ্ঞান, ততখানি অধিকার সে লাভ করে। এইগুলো সবই অবস্থা সাপেক্ষ ব্যাপার। যখন আসছেন, তখনই করুণায় আসছেন তো, তাই সঞ্চার হয়। তেজ বা জ্যোতির সঞ্চারণ হয় সাধকের উর্ধ্বতম চেতনার বিন্দুগুলিতে। যখন তেজ বা জ্যোতির সঞ্চারণ হচ্ছে, সেই সঞ্চারণ আধার বিশেষে যতটুকু নিতে পারা যায় ততটুকু। আবার এটা বুঝতে হবে, ওঁনারা তো বদ্ধ নন, তাই করুণা বা লীলার প্রয়োজনে নিমেষেই সূক্ষ্ম বা স্থূল রূপে প্রকাশ হতে পারেন—তবে অবশ্যই তা দিব্য রূপে। স্থান-কালের কোন সীমা এই সমস্ত মহাপুরুষদের করুণা-প্রবাহকে ব্যহত করতে পারে না।

অবাধিত সাধনা

চেতন যে আত্মা, তার ভেতরের দিকের আস্বাদন আনন্দ। বাইরের দিকে তারই এষণা সাধনা হয়ে প্রকাশ পায়। অনন্তের যে ব্যাকুলতা নিজেকে প্রকাশ করার, তাই হচ্ছে তপস্যা। তীব্র সাধনার মধ্যে দিয়ে শরীর, মনের বাধা যত কমতে থাকে আস্তে আস্তে, ততই চিদানন্দ শরীর মন, প্রাণে ব্যাপ্ত হয়। কিন্তু সাধনার যথেষ্ট অগ্রগতি ছাড়া তা সম্ভব নয়। সেইজন্যই বলা হয়—সময় ক'রে বসো। প্রথম অবস্থায় সময় বেঁধে বসা। কিন্তু যখনই জগত-সংসারের বোধটা আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসে, তখনই দেখা যায় সাধন-ভজনটা সবসময় চলছে, কোন বিচ্ছেদ নেই। তবু জীবনজোড়া সাধনার কেন্দ্রগত শক্তি গভীরতর আর অক্ষুণ্ন রাখতে বসতেই হবে। তুমি জিজ্ঞেস করেছ অব্যাহত করা যায় কিনা। তা, সরাসরি তেমন করা যায় না। কিন্তু নিয়মিত সাধনার মধ্যে দিয়ে যখন হবে, তখন দেখবে পুরো অস্তিত্বটাকেই আপ্লুত করছে, দিব্য করছে। সাধনা করছ, এই করার তলে তলে হওয়া শুরু হয়। যখন অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ভালো লাগছে না, তখনই বুঝতে হবে করার দিক থেকে হওয়ার দিকে যাচ্ছ। কেউ বলছে ঈশ্বর প্রসঙ্গ ছাড়া ভালো লাগছে না। কিন্তু কেউ যদি তাকে একটু রসিয়ে কিছু বলল, বলবে বেশ। এ নয়। নেহাত দরকারি বিষয় ছাড়া আর কোন বিষয় ভালো লাগছে না, আর দরকারি বিষয়টাও কমে আসছে। এটা বাইরের দিকের কথা। যখন হওয়ার দিকে যাচ্ছে, তখন মাঝেমাঝেই সর্বাত্মক হয়। সেই মাঝে মাঝে জিনিসটা চিরন্তন করার চেষ্টা। যখন জিরো রেজিস্ট্যান্স আসবে, তখন একটা বল গড়িয়ে দাও, অনন্তকাল ধরে ঘুরছে। কে ঘুরছে, কাকে ঘোরাচ্ছে। বাধাশূন্য অবস্থা। যখন শরীর, মনের প্রাণের বাধা শূন্য হয়ে যাচ্ছে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তার আত্মা স্বমহিমায় জ্বলছে, সেটা অব্যাহত। করার নয়, হওয়ার। গঙ্গায় যখন জোয়ার আসে প্রথমে, তখন মাঝ নদীতেই আসে। দু পাড়ে

তখন স্থির জল, কিন্তু মাঝখানে দেখ কচুরিপানা চলছে। তার আগে তার অগভীরতা নিয়ে দুপাশের জল যাবে কি যাবে না করছে। কিন্তু যখন গাঁক গাঁক করে জোয়ার এল, তখন হু-হু করে চলছে সর্বব্যাপ্ত হয়ে। তেমনি আমার শরীর মনের প্রাণের আকুলতা। বনে যখন আগুন জ্বলা শুরু হয়, তখন একটু-আধটু ফুলকির মধ্যে দিয়ে এখানে-ওখানে ধিকি ধিকি! পরে দেখা যায় বড় বড় গাছপালা সবই জ্বলছে। কি হয়েছে? দাবানল জ্বলছে। ছোট্ট আগুনটা দাবানল হয়ে গেছে। সেখানে কোন বাধাবন্ধ নেই। এমনি হওয়া, তখন সেটা দাবানল।

সাথী

একসময় আমি গঙ্গার নির্জন চরে বহু সময় ঘুরে বেড়াতাম। সঙ্গে আমার এক স্থানীয় বন্ধু থাকত। এদিকে ওদিকে সাদা-কালো ছবি আঁকা ভাটিং পাখীগুলো ঘুরে বেড়াত তাদের চঞ্চলতায়। সেই চরে ঘুরে বেড়ানোর সময় আমার বন্ধু একদিন বলল—এইবার জোয়ার এল বলে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি করে বুঝিস? বলল—যখন মাঝের জল উজিয়ে যাবে, তীরের জলগুলো স্থির, তখন বুঝবি জোয়ার আসবে। আর, যখন উল্টোটা হয়, যখন মাঝের জল সাগরের দিকে সরে যাবে, তীরের জল স্থির, তখনই বুঝবি ভাটার টান আসছে, একটু পরে সব জলকেই সে টেনে নিয়ে যাবে। আমার মনে তখন একটা ভারী সুন্দর কথা এল—এমনি করেই মানুষ মানুষের সাথী হয়, কানে কানে সাগরের কথা বলে উদ্দীপ্ত করে। জল জলের সাথী যেমন হয়, ঠিক তেমনি করেই মানুষ মানুষের সাথী হয়ে বলে—চল, চল। চরৈবেতি। চলার মধ্যে সেই পরম মধু পায়। থামলে চলবে না। এমনি করে সাগরের কথা বলে। জল জলের সঙ্গে মিশেই সাগরে টেনে নিয়ে যায়। আর মনে এই সুখ বোধ, এই সংকল্প, এই ইচ্ছা সুদূরপ্রসারী হল।

প্রণাম

প্রণাম শ্রদ্ধার অনুষ্ঠান। ব্যাপারটা একটাই— যে করছে বা যাকে করছে, শুচি-শুদ্ধ শ্রদ্ধার জিনিস। দুটো মিলিয়েই একটা অখণ্ড অনুষ্ঠান। একজন প্রণাম করছে আর একজন প্রণাম নিচ্ছে। সেই ভাবটাই মনে জাগিয়ে দেওয়া যে প্রণাম করছে তার দিক, যথাসম্ভব নম্র শ্রদ্ধার ভাব, অপর পক্ষের সামর্থের প্রশ্ন। যাকে-তাকে প্রণাম করলে দিব্য অনুষ্ঠানের অমর্যাদা। তাকে সামাজিক নিয়ম মাত্রে পর্যবসিত করা। তাতে ক্ষতি উভয় পক্ষের।

প্রণাম যদি ঠিক ঠিক হয়, আর যাকে প্রণাম করছ তিনি যদি সামর্থি হন, প্রণামের ক্ষণেই বুঝতে পারে প্রণামটা ঠিক ঠিক হয়েছে। উভয় পক্ষই বুঝতে পারে প্রণামটা ঠিক ঠিক হ'ল। তার প্রভাবটা ছড়িয়ে পড়ে বা বলা যায় সঞ্চারী হয়। প্রণাম তো একটা সাধন। এই অনুভব যত বাড়বে, ঘরে থেকে প্রণাম করলেই সেই একই। তবে, তখন সে অন্তরে আরও বেড়ে গেছে ধরে নিতে হবে, সেই প্রণামের সাধনে সে আরও এগিয়ে গেছে। এইসব সত্য কথা। আমরা তো দেব-বিগ্রহকে বা শ্রীগুরু বিগ্রহকে প্রণাম করি, মুসলমানরা তো বিগ্রহে প্রণাম করে না, কিন্তু তারা মাথা নত করে এবাদত বা প্রণাম করে। নমাজের এক একটা সূরা পাঠকদের আর মাথাটা নোয়ায়। ওরা জানে

প্রণামের অর্থ কত ব্যাপক আর কত গভীর। এই একাগ্র সমর্পণের সাধনা তাই যখন-তখন, যেমন-তেমন করে কখনই করা উচিত নয়। যেমন যেমন অহং ক্ষইবে, তেমন তেমন প্রণাম হবে। যতখানি প্রাণের বোধে প্রতিষ্ঠিত হবে, ততখানি প্রণামের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবে। তার আগে যা আছে, যেটুকু পাচ্ছ তাই নিয়েই করবে। সেই একটি প্রণামের জন্যই জীবন জোড়া প্রণামের আয়োজন-প্রয়োজন।

সমর্পণ

* সমর্পণ কী?

** উচ্চতর শক্তির অধীনতা।

* যে শক্তি সম্বন্ধে জানা নেই, তার আবার অধীনতা কী?

** আমার চেয়ে উচ্চতর শক্তি আছে, সেটা আবার জানার কি আছে?

* তার অধীনতা বলতে?

** সেই মহত্তর, উচ্চতর শক্তি, তাঁর কাছে আমার আত্মশক্তি যেন সবসময় নির্ভর হয়ে থাকে। উচ্চতর শক্তির কাছে আমার আত্মশক্তি যেন প্রত্যাশী হয়ে থাকে পরিপূরণের জন্য। এটা একটা অন্তরের ভাবনা তো।

* সমর্পণ আর আত্মসমর্পণের মধ্যে পার্থক্য আছে? এই কথাটা তো আত্মসমর্পণের মতই মনে হল। সমর্পণ হচ্ছে—যেমন আমার সমস্ত সম্পদ আমি সমর্পণ করলাম। এটা অবিডিয়েন্স নয়, অধীনতা তাও নয়। কোন বিশ্বাসে কারো হাতে দিলাম।

** আমি মাত্র আধ্যাত্মিক দিক দিয়েই বলছি। আপনি যেগুলো বললেন সেইগুলো বিভিন্ন দিক।

* সমর্পণ বললে স্বাধীন ইচ্ছা থাকে কি—যেমন আমি তপস্যা করছি?

** উচ্চতর শক্তি সবসময় আকর্ষণ করছে, প্রেরণা দিচ্ছে, তপস্যার জন্য, তার মধ্যে তো বিরোধ নেই। উচ্চতর শক্তি সবসময় আশা করছে যে ছোট্ট শক্তিটা যেন বৃহত্তর, মহত্তর শক্তিতে একীভূত হয়। নদী কি বলবে—আমার কি স্বাধীন ইচ্ছে নেই, আমাকে কি সমুদ্রে যেতেই হবে?—সমুদ্রে যাওয়াটাই তার সফলতা। তার অস্তিত্বের মূল কথাই—সে সাগরে যাবে। নদী কি বলবে—সাগরে যাব না, আমার স্বাধীনতা আছে, আমি পাহাড়ে যাব? তার অন্তর্নিহিত শক্তিই তাকে সাগরে নিয়ে যাবে! তেমনি, উন্নত সাধকের অন্তরের উত্তাল আকুলতা নিরন্তর মহত্তর বোধে, অখণ্ড বোধে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে। শক্তি যখন বলছ, তখন এটাই।

* তাহলে তো সমর্পণ হয়েই আছে ছোট-খাটো শক্তির?

** সেটা সচেতন ভাবে নয়। যখন সাধক বলছ, তখন সচেতন ভাবে, জাগ্রত ভাবে হচ্ছে সত্তার মধ্যে। তুমি যখন বলছ সমর্পণ হয়েই আছে, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সমর্পণ হয়ে আছে অব্যক্তভাবে। যখন সাধক বলছ, তখন তা তীব্রভাবে, সচেতনভাবে, গভীর ভাবে সক্রিয়, ফলবতি হয়ে আছে। এই আমার দৃষ্টিভঙ্গির কথা বললাম। ব্যক্তি বড় একটা থাকে না, আবার থাকে।

* সাধনা করছি, আর সাধনা হচ্ছে। যখন হচ্ছে তখন সাধনা কে করছে?

** সে বুঝতে পারছে হচ্ছে। করছে, কোথায় যাচ্ছে। তার মধ্যে গভীর বোধগুলো জেগে উঠেছে। কিসের অভীপ্সা জেগে উঠছে, তখন হচ্ছে বলছ? তার মধ্যে একটা

মূলগত সুর তো আছেই, নাহলে বুঝছে কি করে?

* আংশিক সমর্পণ হয়?

** আংশিক নয়, অস্ফুট। সাধক যত উন্নত হচ্ছে স্ফুটতর হচ্ছে। যা অস্ফুট তা স্ফুট হচ্ছে, স্ফুট যা, তা স্ফুটতর হচ্ছে, যা অব্যক্ত তা ব্যক্ত হচ্ছে, যা এলোমেলো তা সংগঠিত হচ্ছে।

* অস্ফুট ধীরে ধীরে স্ফুট হচ্ছে?

** নিশ্চয়, নিশ্চয়। না হলে হওয়া কিসের?

* প্রথমে সে বসল, খানিকক্ষণ চেষ্টা করল, তারপর স্বতঃস্ফূর্তভাবে হচ্ছে। যখন সে বসল, সে তো স্বাধীনভাবে চেষ্টা করছে, তারপর স্বতঃস্ফূর্তভাবে হচ্ছে। আবার কখনো হয়ত স্বাভাবিকভাবেই বসেছে, সেটা কি অস্ফুটভাবে না স্ফুটভাবে?

** সেটা সে নিজেই বুঝবে। সে যতখানি উদ্দীপ্ত হবে, ততখানি বলবে—হ্যাঁ। যে উদ্দীপ্ত নয়, সে গয়ংগচ্ছ দিন কাটাচ্ছে, বলছে সমর্পণ হয়ে গেছে। এরকম একটা নির্বোধ ব্যাপার তো নয়।

* এই সমর্পণ মানে তো সারেন্ডার?

** আমি যে সমর্পণের কথা বললাম, সেই সমর্পণের মানে যদি সারেন্ডার হয়, তাহলে সারেন্ডার।

* সারেন্ডার যদি পূর্ণ হয়, তাহলে তো হয়েই গেল।

** হতে হতেই পূর্ণ হয়। ক্রমবাচী।

'একটি চাওয়া ভিতর হতে ফুটবে তোমার ভোর-আলোতে
প্রাণের স্রোতে—
অন্তরে সেই গভীর আশা বয়ে বেড়াই'।

কেমন লিখেছেন। যদি জন্মাতে হয় তাহলে যেন বাংলাতে জন্মাই। এত সব জিনিস ছড়িয়ে আছে এখানে—সোনাদানা, হীরে-মুক্তো।